কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-বালিকাদের জন্য অনুমোদিত

# প্রবেশিকা
# গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি

প্রাথমিক বিজ্ঞান পরিচয়, স্বাস্থ্যবিধি সিরিজ, প্রবেশিকা স্বাস্থ্যবিধি
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা


ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

এম্. এস্-সি., এম্-বি, ডি-টি-এম্, ডি-পি-এইচ্.


প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ


দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্

৪।৩বি বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪৪

প্রকাশক

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

৪।২বি, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

১১৭৫।৪৪

# উৎসর্গ

পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ স্বর্গীয় স্যার আশুতোষের কৃতী পুত্র
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রবর্তক
ডাক্তার **শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
এম. এ ; বি. এল ; বার-এট-ল, ডি. লিট্, এম. এল. এ
মহাশয়ের করকমলে অশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ
"গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি" অর্পিত হইল।

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

# প্রবেশিকা

# গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## বসত-বাটী

( The house )

বাংলা দেশে শহর ও পল্লীগ্রাম—এই উভয় স্থানেই আমরা বাস করিয়া থাকি। শহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের সংখ্যাই অধিক। যে স্থানেই আমরা বাস করি না কেন, বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর হইলে, আমাদের ব্যারাম-পীড়ার অবধি থাকে না। যে বাড়ীতে একজন না একজনের অসুখ প্রায়ই লাগিয়া আছে দেখা যায়, তাহা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

বাসস্থান ও বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বাসগৃহাদির ভাল-মন্দের উপর স্বাস্থ্য যথেষ্ট নির্ভর করে। সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপও বসত-বাটীর স্থাননির্বাচন, অবস্থান ও বাসগৃহের নির্মাণ-কৌশলাদির ভাল-মন্দের জন্যও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, বসত-বাটীর অবস্থান ও বাসগৃহের নির্মাণাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা করা কর্তব্য।

বসত-বাটীর অবস্থানাদি বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ক্রমশঃ বলিতেছি।

## (ক) বসত-বাটীর অবস্থান

বাসগৃহ নির্মাণকালে জমির ভাল-মন্দের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বাড়ীর মধ্যবর্তী জমি আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে থাকিলে অথবা বাড়ীর মধ্যে নানা আবর্জনা জমিতে দিলে, সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সুবিধা পায়। সেইজন্য বাড়ীর ভিতর ও বহির্ভাগ সর্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হয়; বাড়ীতে যাহাতে সর্বদা রৌদ্র লাগে এবং হাওয়া বাতাস খেলে, তাহারও ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক হয়। বসত-বাটীর প্ল্যানটি বেশ ভাল হওয়া উচিত। বসত-বাটী স্বাস্থ্যকর ও সুখকর করিবার কয়েকটি উপায়,—

### স্থান-নির্বাচন

(১) চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য।

(২) কঙ্করবহুল, বালুকাবহুল কিংবা প্রস্তরবহুল ভূমি দেখিয়া ঘর করা উচিত; কারণ, ঐ প্রকার জমিতে বৃষ্টির জল পড়িলে সহজে সে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং জমিও শুষ্ক থাকে।

(৩) এঁটেল মাটি গৃহ-নির্মাণের পক্ষে উত্তম নহে; কারণ, ঐ শ্রেণীর মাটির মধ্য দিয়া সহজে জল বাহির হয় না; সেই জন্য জমি আর্দ্র থাকে। নিম্নভূমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা।

(৪) জলা-ভূমি বা যে ভূমিতে গ্রামের বা শহরের আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হয়, তাহার নিকট বসত-বাটী করা বিধেয় নহে।

(৫) কলকারখানা, ভাগাড়, কসাইখানা, শ্মশান, গোরস্থান, আস্তাবল প্রভৃতি হইতে বাসভূমি দূরে থাকা উচিত। ঐ সকল স্থানের নিকটে গৃহ নির্মাণ করিলে সে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হয়।

(৬) আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে জমির উত্তর দিক্ ঘেঁসিয়া গৃহ নির্মাণ করার, দক্ষিণ দিকে খোলা জায়গা রাখার, পূর্ব দিকে পুষ্করিণী কাটার এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ কিংবা অন্য কোন উচ্চ বৃক্ষাদি রোপণ করিবার বিধান আছে। এই নিয়ম স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত বায়ুই স্বাস্থ্যকর। সেই জন্য দক্ষিণ খোলা রাখা প্রয়োজন। উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু অপকারী বলিয়া উত্তর দিক্ ঘেঁসিয়া বাড়ী নির্মাণ করা উচিত। পূর্বে পুষ্করিণী রাখিলে গৃহ সর্বদা শীতল থাকে। পশ্চিমে উচ্চ বৃক্ষ থাকিলে দিবসে প্রখর সূর্যের তাপে গৃহ সেরূপ গরম হইতে পারে না এবং প্রবল ঝটিকার বেগ হইতেও তেমনি রক্ষা পাওয়া যায়।

(৭) নদীর চর ভরাট হইয়া যে নূতন জমি প্রস্তুত হয়, তাহা সচরাচর বালুকা-প্রধান হইলেও তাহার উপর বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে; কারণ ঐ জমি হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া দূষিত বায়ু উঠিতে থাকে। পুকুর বা ডোবা ভরাট স্থানেও গৃহ নির্মাণ করিতে নাই। সেখানেও ভরাট স্থান দিয়া দূষিত গ্যাস উঠে।

(৮) ধান্যক্ষেত্রের সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করিতে নাই। গৃহের অতি সন্নিকটে ইক্ষু, পাট প্রভৃতির চাষ ম্যালেরিয়ার কারণ হইয়া থাকে; জলাপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যেও গৃহ নির্মাণ করিতে নাই।

(৯) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া তবে গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য।

(১০) গৃহ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যে, গৃহের মধ্যে প্রচুর আলো ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে।

(১১) বাড়ীর জল নিকাশের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। সমস্ত বাড়ী ঘুরাইয়া দেওয়ালের ভিৎ হইতে যতদূর সম্ভব মাটি এমনভাবে

ঢালু করিয়া দিতে হয়, যাহাতে বৃষ্টি বা অন্য প্রকারে পতিত জল আপনা-আপনিই প্রবাহিত হইয়া দূরে চলিয়া যাইতে পারে। প্রাঙ্গণের অন্তর্গত সমস্ত স্থান পাকা করিয়া দিলে, জল বসার মোটেই ভয় থাকে না। অর্থ-সঙ্গতি থাকিলে বাড়ীর চারি দিক বেষ্টন করিয়া একটি পাকা নর্দমা নির্মাণ করা উচিত এবং ঐ নর্দমা সর্বদা পরিষ্কৃত রাখার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(১২) গো-শালা, অশ্বশালা প্রভৃতি বাসগৃহ হইতে দূরে পৃথক্‌ভাবে নির্মাণ করা বিধেয়; নচেৎ, ঐ সকল স্থানের দুর্গন্ধ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহখানিকে অস্বাস্থ্যকর করিতে পারে।

(১৩) পায়খানা বাসগৃহ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে হওয়া ভাল; তবে কলিকাতার মত শহরে, যেখানে পায়খানা গৃহ-সংলগ্ন না করিয়া পারা যায় না, সেখানে পায়খানা যাহাতে সর্বদা ধুইয়া দেওয়া হয়, তাহার বন্দোবস্ত রাখা উচিত।

(১৪) বাড়ীর পরস্পর-সন্নিহিত ঘরগুলির (contiguous rooms) ভিতরে যাহাতে যথেষ্ট স্থান (space) থাকে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; নতুবা, ঘরগুলি যথেষ্ট সূর্যালোক পায় না ও ঘরের ভিতরে তেমন হাওয়া খেলে না। ফলে, এরূপ স্থানে বাস করা অস্বাস্থ্যকর হয়। বাড়ীর আবর্জনা ও ময়লা স্বাস্থ্যবিহিত ব্যবস্থামত অপসারিত করা (disposal of refuse and filth) গৃহস্বামীর সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই আবর্জনা ও ময়লাকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি:—ঘর-ঝাড়া জঞ্জাল, রান্না-ঘরের তরিতরকারির খোসা, মৎস্যের আঁইশ, চুল্লীর ছাই, ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রী, বাগানের বৃক্ষ-পত্রাদি, আস্তাবল বা গো-শালার জঞ্জাল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত শুষ্ক পদার্থ; আর, রান্না-ঘরের অপরিষ্কৃত

আদর্শ বসত-বাটীর নক্‌সা
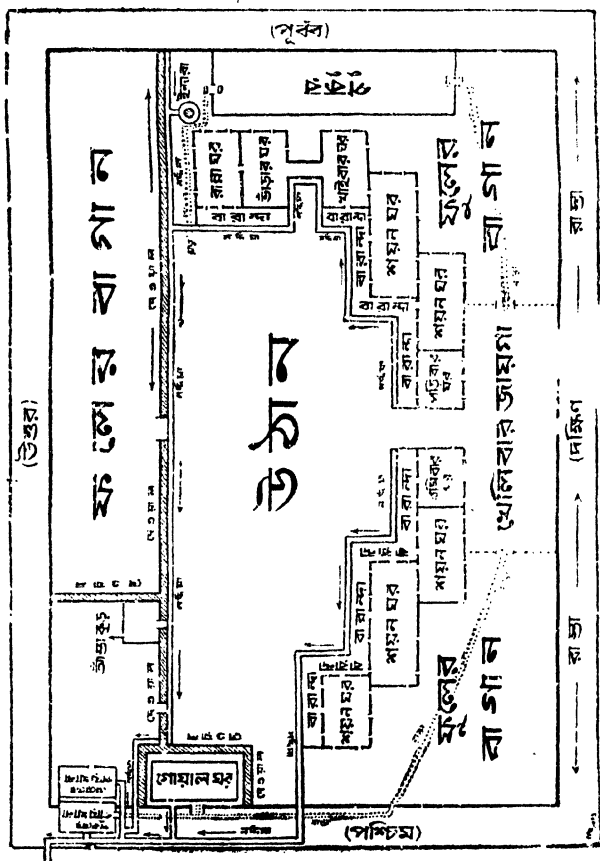
জল, স্নানের জল, মানুষের মলমূত্র প্রভৃতি তরল পদার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

**আবর্জনাদি দূর করা।**—শুষ্ক আবর্জনাদি যাহা গৃহাদি ঝাড় দিয়া বাহির হয় এবং রান্না-ঘরের জঞ্জাল ও তরিতরকারির খোসা প্রভৃতি ও বাগানের বৃক্ষাদির পত্র—সমস্ত দূরে একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। আস্তাবল বা গো-শালা হইতে বহিষ্কৃত তৃণাদি ও আবর্জনা প্রভৃতি এইভাবে দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত। ঐ সকল দগ্ধ করিয়া যে ছাই হইবে, তাহা ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। চুল্লীর ছাই গো-শালায় বা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। গরু ও অশ্ব প্রভৃতির পুরীষ বাটীর সন্নিহিত ক্ষেত্রে, একহস্ত পরিমিত গভীর নালা কাটিয়া, ঐ নালায় ফেলিয়া তাহার উপর মাটি-চাপা দিতে হয়। অথবা "কম্পোষ্ট সার" রূপেও পরিণত করা যায়।

**পল্লীর পর্ণকুটীর।**—আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে কাঁচা বাড়ীর সংখ্যাই অধিক; মধ্যে মধ্যে পাকাবাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীতে বা শহর অঞ্চলে বস্তিতে মাটির ভিৎ প্রস্তত করিয়া তাহার উপর, নির্দিষ্ট স্থান অন্তর বাঁশের বা কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল খুঁটির চারিধারে বেড়া এবং উপরে চাল বা চালা দেওয়া হইয়া থাকে। চালার উপরিভাগে কেহ খড়, কেহ বিচালি, কেহ গোলপাতা, কেহ মাটির খোলা, কেহ টিন, কেহ বা অ্যাস্‌বেস্টাস্‌ বিছাইয়া দেন। কেহ ইট দিয়া, কেহ কেহ কাঠ দিয়া—যাহার যেরূপ অবস্থা, তিনি সেই ভাবেই অবস্থার উপযোগী বেড়া দিয়া লন ও বাসের ব্যবস্থা করেন। স্থল-বিশেষে মাটির দেওয়ালেও বেড়া হয়।

এই প্রকারের গৃহ নির্মাণকালে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিম্নভূমিতে বাড়ী করিতে নাই। ঘরের দাওয়া ও মেঝে

মাটি হইতে যথেষ্ট উঁচু হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক গৃহে বায়ু-চলাচলের জন্য অন্তত দুইটি করিয়া রুজুভাবে জানালা থাকা উচিত। ফলত, স্বাস্থ্যকর পাকাগৃহ নির্মাণ করিতে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, পল্লীর কাঁচা বাড়ীর নির্মাণকালেও ঐ একই নিয়ম অবলম্বন করা উচিত ; নচেৎ গৃহ অস্বাস্থ্যকর হয়।

**পল্লীগৃহের অন্যান্য ব্যবস্থা**।—ক্ষুদ্র নগরীর ও পল্লীগ্রামের গৃহস্থমাত্রেরই বাটীতে গৃহ-সংলগ্ন এক একটি আঁস্তাকুড় থাকে। হাতমুখ ধোয়া, রাত্রে বা দিবাভাগে মল-মূত্রত্যাগ, কখন বা শিশুদিগের মলত্যাগ প্রভৃতি ঐ সকল স্থানে করান হয়। এই প্রকার আঁস্তাকুড় তুলিয়া দেওয়া উচিত। আঁস্তাকুড় রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইলে গৃহের পশ্চিম প্রান্তে যেস্থানে অপরাহ্নে সূর্যের প্রখর কিরণ পতিত হয়, সেই প্রান্তভাগে এবং সংলগ্ন বারান্দার নিম্নের জমির কিছুদূর পর্যন্ত ইষ্টক ও সিমেণ্ট (cement) দ্বারা পাকা করিয়া লইতে হয়। নিম্নের পাকা করা জমির চতুর্দিকে কিছু দূর পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া, মৃত্তিকা কতকটা উঠাইয়া দিয়া, কতকটা বালি ও কয়লা প্রোথিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে আঁস্তাকুড় নির্মাণ করিলে, তাহার উপর পরিত্যক্ত মূত্র হইতে অধিক দুর্গন্ধ বাহির হয় না। কয়লার মধ্য দিয়া চোঁয়াইবার দরুণ উহার দুর্গন্ধ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। রাত্রি ভিন্ন দিবাভাগে আঁস্তাকুড় ব্যবহার করা উচিত নয়।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে মেথরের দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিবার বা ময়লাপূর্ণ আবর্জনাদি দূর করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে পায়খানা বাসস্থান হইতে বহু দূরে থাকা বিধেয়। রান্না-ঘরের অপরিষ্কৃত জল, স্নানের ময়লা জল প্রভৃতি আবর্জনা দূরীকরণের জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে প্রশস্ত নর্দমা থাকা উচিত। এই সকল ময়লা জল চলিবার নর্দমা

সিমেণ্ট দ্বারা উত্তমরূপে পাকা করিয়া প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ অন্তত একবার তাহা পরিষ্কার করিতে হয়। নর্দমায় ময়লা জমিতে দিলে সেই ময়লা হইতে নানা রোগের জীবাণুর সৃষ্টি হইতে পারে ; ফলে, রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

## চতুষ্পার্শ্বস্থ বাসস্থান

চারিদিকের স্থান স্বাস্থ্যকর না হইলে, সেখানে বসত-বাটী নির্মাণ করিতে নাই। নানাপ্রকার কল-কারখানা, ভাগাড়, কসাইখানা, শ্মশান, গোরস্থান, আস্তাবল, মল-মূত্র প্রোথিত করিবার স্থান প্রভৃতির নিকটে বসত-বাটী নির্মাণ করিবে না। ঐ সমস্ত স্থানের দূষিত বায়ু নিয়তই আমাদের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করে।

জলাভূমি, বিল, এঁদো ডোবা, পচা পুকুর প্রভৃতির ধারে বাড়ী করিলে উহা খুবই অস্বাস্থ্যকর হয়। পাট, শণ, ধান প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রের নিকটেও বাড়ী করিতে নাই ; কারণ, ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বাষ্প উঠিয়া বায়ুকে দূষিত করে।

বাড়ীতে যাহাতে সূর্যালোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য বাড়ীর পূর্ব ও দক্ষিণ দিক্ ফাঁকা রাখার নিতান্ত প্রয়োজন। এই দুই দিকে বড় বড় বাগান কিংবা অন্যবিধ প্রতিবন্ধক থাকিলে বাড়িতে রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না।

বসত-বাটীর দক্ষিণে প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান থাকিলে প্রচুর নির্মল বায়ু পাওয়া যায়। অনেকেই বাড়ীর দক্ষিণে ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গা ও ফুলবাগান রাখেন। বাগানের ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমস্ত বাড়ীখানি আমোদিত হয়। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও পরম হিতকর। পূর্ব দিকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড় পুকুর রাখার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত ;

তাহা হইলে বাড়ীতে সূর্যালোক ও বায়ু-প্রবেশের বিশেষ সুবিধাই হয়। বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে উত্তরে দুই চারিটা ভাল ফলের গাছ থাকিলে ক্ষতি নাই। বাড়ীতে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ ও নিমগাছ থাকিলে বায়ুর অনেক দোষ নষ্ট হয়।

## বসত-বাটীর বিভিন্ন ঘর

আমাদের বাসের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে কতকগুলি ঘর থাকে ; উহার প্রত্যেকখানি ঘর পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্যের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। সেই ঘরগুলিকে আমরা শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করি।

বসত-বাটীর ভিতরে আঙ্গিনা বা উঠান আছে। উঠানের পূর্ব দিকের ঘর কয়েকখানিকে রান্না-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর ও ভোজন-ঘররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাড়ীর দক্ষিণের ঘরগুলিকে সাধারণত শয়ন-ঘররূপে ব্যবহার করাই ভাল। দক্ষিণ দিকে লোকজনের বসিবার ঘরও থাকিলে ভাল হয়। একখানি ভাল শয়নঘর আঁতুড়-ঘররূপে পৃথক্‌ রাখা মন্দ নয়। পশ্চিম দিকে ঘর থাকিলে সেই ঘরগুলি পূর্বদ্বারী হয়। প্রয়োজন হইলে সেইগুলিও শয়ন-ঘররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শয়ন-ঘর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে নির্মিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, এদেশে অধিকাংশ সময়ই দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এজন্য দক্ষিণ দিকের ঘরই বাসের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব দিকের ঘরও মন্দ নয় ; কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকের ঘরগুলি তত স্বাস্থ্যকর নয়। সাধারণত যে ঘরগুলির পূর্ব দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুই তিনটি করিয়া বড় বড় জানালা থাকে, সেই ঘরগুলি

অনেকটা স্বাস্থ্যকর হয়; কারণ, শয়নঘরে বায়ু ও সূর্যালোকের বিশেষ প্রয়োজন।

রান্না-ঘর বাড়ীর পূর্ব দিকে শয়ন-ঘর হইতে দূরে নির্মাণ করিতে হয়। উহার নিকটেই ভাঁড়ার-ঘর ও খাইবার ঘর থাকার দরকার। শয়ন-ঘরের ন্যায় রান্না-ঘরেও প্রচুর আলোক ও বাতাসের প্রয়োজন। উহার পূর্ব গায়ে দুই তিনটি করিয়া বড় বড় জানালা রাখিলে আলোক ও বাতাস-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। রান্না-ঘর হইতে ধূম-নির্গমের এরূপ ব্যবস্থা রাখিবে যে, উহা যেন কখন বাড়ীর অন্য কোন ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে। রান্না-ঘরের নিকটে মলমূত্র-ত্যাগ করিবে না কিংবা আবর্জনাদি জমিতে দিবে না।

**গোয়াল-ঘর**—বাড়ীর পশ্চিমে শয়ন-ঘর ও রান্না-ঘর হইতে অনেকটা দূরে গো-মহিষাদি পশুর বাসের জন্য গো-শালা বা গোয়াল-ঘর নির্মাণ করিতে হয়। গোয়াল-ঘরের যেখানে সেখানে গোবর, গোমূত্র, ঘাস, বিচালি প্রভৃতি পড়িয়া থাকে; ইহাতে বায়ু দূষিত হয়। এজন্য গোয়াল-ঘর ও বাসগৃহের মধ্যে প্রাচীর কিংবা অন্য কোন ব্যবধান থাকিলে ভাল হয়। গোয়াল-ঘর উচ্চ ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। গোয়াল-ঘরে যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগে সেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

## বায়ু ও সূর্যালোক

বাসস্থানে যাহাতে সর্বদা প্রচুর নির্মল বায়ু ও সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে, সেদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ নির্মাণ করিবে। বাড়ীর বিভিন্ন ঘরগুলি এরূপভাবে নির্মিত হওয়া দরকার যে, সমস্ত ঘরেই অবাধে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে। আমাদের দেশে

সাধারণত দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সেইজন্য বসত-বাটীর দক্ষিণ দিক্ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন। বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা না থাকিলে, বাসস্থান কখনই স্বাস্থ্যকর ও সুখকর হইতে পারে না।

**স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সূর্যালোকের আবশ্যকতা।**—জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জন্য সূর্যালোকের বিশেষ প্রয়োজন। সূর্য হইতে আমরা আলো ও উত্তাপ প্রাপ্ত হই। জীবনধারণের জন্য এতদুভয়ের যে কত প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বায়ুমণ্ডলে বিবিধ জাতীয় অসংখ্য অগণিত রোগ জীবাণু ভাসমান থাকে; প্রখর রৌদ্রে সেই সকল জীবাণুর ধ্বংস হয়; তাহাতে বায়ু বিশোধিত হইয়া থাকে। জীবজন্তুর গলিত দেহ, মল-মূত্র, পচনশীল উদ্ভিদ্ প্রভৃতি হইতে সর্বদা এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস উঠিয়া বায়ুকে দূষিত করিতেছে। সূর্য-কিরণে সেই দূষিত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

যাহারা অন্ধকার স্থানে বাস করে এবং সূর্যের মুখ অল্পই দেখিতে পায়, তাহাদের দেহ কখনও সুস্থ থাকে না। উপযুক্ত পরিমাণ আলোক ও তাপের অভাবে তাহারা নানারূপ পীড়ায় কষ্ট পায়; এমন কি, শেষে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মারা যায়। সুতরাং, যেখানে সূর্যের আলোক প্রবেশ করে না, সেখানে কখনও বাস করিতে নাই। যে ঘরে প্রতিদিন প্রচুর সূর্যালোক ( রৌদ্র ) প্রবেশ করে, সে ঘরে রোগের জীবাণু সতেজ থাকিতে পারে না। রৌদ্রালোক প্রবেশ না করিলে ঘর অস্বাস্থ্যকর হয়। আলোকহীন গৃহে বাস করিলে শরীর স্বভাবত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে; পরিবারের কাহাকেও সে প্রকার ঘরে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। যে গৃহে সর্বদা আলোক ও বাতাস চলাচল করে, বাসের পক্ষে সেই গৃহই শ্রেষ্ঠ ও হিতকর।

'সান্‌বাথ' অর্থাৎ 'রৌদ্র-স্নান' সকলের পক্ষেই উপকারী। পাশ্চাত্য-দেশে এ প্রথা প্রচলিত; শীতকালে আমরা কতক সময় রৌদ্রে বসিয়া থাকি। কেবল শরীরের পক্ষে নহে, শয্যা ও পরিচ্ছদ সম্পর্কেও রৌদ্র-স্নান উপকারী। আমাদের জামা, কাপড়, বিছানা, বালিশ প্রভৃতি ময়লায় ও গায়ের ঘামে দূষিত হয়। রৌদ্রে ভালরূপে শুকাইয়া লইলে উহার দোষ নষ্ট হয়। তখন পুনরায় ব্যবহার করিলে কোনও অপকার হয় না; এবং ছারপোকার উপদ্রবও কম থাকে। লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়, রৌদ্রদগ্ধ বিছানায় শুইলে অথবা রৌদ্রদগ্ধ জামা, কাপড় পরিলে, শরীরে আপনা-আপনিই কেমন একটা স্বস্তি আসে।

যে সকল স্থানে সারাদিন রৌদ্র থাকে, সেইরূপ জায়গায় আঁস্তাকুড় ও পায়খানা করিতে হয়। পায়খানা, আঁস্তাকুড়, এঁদো ডোবা ও পচা পুকুর হইতে সর্বদা এক প্রকার দূষিত গ্যাস উঠে। প্রচুর রৌদ্র লাগিলে সেই বিষাক্ত গ্যাস কতক পরিমাণে নষ্ট হয়।

আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই সূর্যরশ্মির প্রয়োজন। তাই, সকালে ও বৈকালে কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকা ভাল। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে অসুখ হইতে পারে; সেইজন্য যাহার যতটা সহ্য হয়, ততটা রৌদ্র লাগানই উচিত। আমাদের দেশে নবজাত শিশুর গায়ে প্রচুর সরিষার তৈল মাখাইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর গায়ে যাহাতে অতিরিক্ত রৌদ্র না লাগে এবং মাথা রৌদ্রে না থাকে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আজকাল সূর্য-রশ্মির দ্বারা কোনও কোনও ব্যাধির চিকিৎসা হইতেছে। বাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় সূর্য-রশ্মির

সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অনেক ব্যাধি ইহাতে আরোগ্যও হইতেছে। সূর্য-রশ্মিতে সাতটি মৌলিক বর্ণ আছে; বেগুনে, নীল, ধূসর, সবুজ, পীত, কমলালেবুর রং ও লোহিত বর্ণ। সাধারণত সহজ দৃষ্টিতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু 'স্পেক্‌ট্রস্কোপ' (Spectroscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট সূর্য-রশ্মির এই সাতটি রং এক সঙ্গে মিশাইলে সূর্য-রশ্মির শ্বেতবর্ণ পাইতে পারি। সেই সাতটি বর্ণের মধ্যে, বেগুনে রংটির বাহিরের অংশ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উহারই ইংরেজী নাম—'আলট্রা-ভায়ওলেট রেজ' (Ultra-violet rays)। সূর্য-রশ্মির এই অদৃশ্য বর্ণের দ্বারা চিকিৎসকগণ অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছেন।

সূর্য প্রতিনিয়ত তাহার রশ্মির কতকাংশ পরিত্যাগ করিতেছে। সেই পরিত্যক্ত রশ্মির কতকাংশ মনুষ্য ও পশুপক্ষী, কতকাংশ তরু-গুল্ম-লতাদি এবং কতকাংশ জল ও মাটি গ্রহণ করে। সূর্য-রশ্মি মানবদেহে প্রবেশ করিয়া মানুষের অশেষ উপকার করে। সূর্যের কিরণ গায়ের চামড়ায় পড়িয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয় ও পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে।

## (খ) বায়ু ও বায়ু-সঞ্চালন

প্রতি মুহূর্তে আমাদের বাতাসের প্রয়োজন। বাতাস ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না। আমরা নিয়ত বায়ুমণ্ডলে ডুবিয়া রহিয়াছি। উপরে, নীচে, চতুষ্পার্শ্বে—বাতাস সর্বত্র বর্তমান। আমরা বাতাস দেখিতে পাই না, অনুভব করিতে পারি মাত্র। ত্বকের সহিত স্পর্শ হইলে আমরা বাতাসের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। আবার, ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় এবং জলের তরঙ্গে বাতাসের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি।

বাতাস কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। ইহা সতত চঞ্চল, ইতস্তত সঞ্চরণশীল, স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট এবং সম্প্রসারণশীল। বায়ুর চাপ চারিদিকে সমভাবে পড়ে। তাপের দ্বারা বায়ুকে সম্প্রসারিত করা যায়। আবার, ঠাণ্ডায় উহা সংকুচিত হয়। বিভিন্ন পরিমাণ তাপে বাতাসের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বাতাস হাল্‌কা। বায়ুমান অর্থাৎ ব্যারোমিটার ( Barometer ) নামক যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের চাপ পরিমাপ করা যাইতে পারে। উত্তাপে চাপের পরিবর্তন ঘটে।

**বায়ুর উপাদান**—জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ুসর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আমরা বিনা আহারে তিন সপ্তাহ বা বিনা জলে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু বিনা বায়ুতে এক মুহূর্তও প্রাণরক্ষা করিতে পারি না। বায়ু পৃথিবীর উপরিভাগে ৪৫ হইতে ৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা আকাশে যে মেঘ দেখিতে পাই, উহা উর্ধ্বে আড়াই হাজার ফুট হইতে সাতাইশ হাজার ফুটের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান থাকে এবং বায়ুবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত হয়।

বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। বাতাসের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান-সমূহ বর্তমান আছে ; যথা—

(১) অক্সিজেন গ্যাস ( অম্লজান—Oxygen )—২০·৯৬ ভাগ ( অর্থাৎ মোটামুটি এক-পঞ্চমাংশ )।

(২) নাইট্রোজেন গ্যাস ( যবক্ষারজান—Nitrogen)—৭৯ ভাগ।

(৩) কার্বন ডায়ক্সাইড্ গ্যাস ( অঙ্গারাম্লজান—Carbon Dioxide)—·০৪ ভাগ।

এতদ্ব্যতীত, জলীয় বাষ্প, এমোনিয়া, আর্গন্, হিলিয়ম্, নিওন, ক্রীপটন্, জিনন্, মার্স গ্যাস্-প্রভৃতিও অল্পাধিক পরিমাণে বায়ুতে বর্তমান আছে। সকল প্রকার গ্যাসের মধ্যে অম্লজান (Oxygen)

আমাদের জীবনধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অম্লজান দ্বারা দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস অম্লজান দ্বারাই হইয়া থাকে। যবক্ষার জান কোন কার্যে লাগে না; উহা কেবল মিশ্রণকারী পদার্থ ও অম্লজানের শক্তি-বিনাশক।

**অম্লজানের ক্রিয়া।**—অম্লজান ( Oxygen ) কতকগুলি উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাপ্রকার মিশ্রপদার্থ উৎপন্ন করে। উদজানের ( Hydrogen ) সহিত রাসায়নিক সংযোগে জল, লৌহের সহিত সংযোগে লৌহের মরিচা, কার্বন সংযোগে বিষাক্ত অঙ্গারাম্লজান ( Carbonic Acid Gas ) গ্যাস উৎপন্ন হয়। অম্লজান-সাহায্যে আমাদিগের ভুক্ত পদার্থ শরীরের পেশীতে ও জৈব পদার্থে পরিণত হয় এবং শরীরের জৈব পদার্থের কার্বন, অম্লজান-সাহায্যে দগ্ধ হইয়া, (ক) তাপ, (খ) শক্তি, (গ) জলীয় বাষ্প এবং (ঘ) অঙ্গারাম্লজান গ্যাস উৎপন্ন করিয়া প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। জীবিতের শরীরে সর্বদা অম্লজান-সাহায্যে জৈব-পদার্থের দহনহেতু শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সেইজন্য জীবিত প্রাণীর শরীর গরম থাকে, আর মৃতদেহে অম্লজান সাহায্যে দহন-ক্রিয়া হয় না বলিয়া মৃতদেহ শীতল হইয়া যায়।

**বায়ুস্থিত অঙ্গারাম্লজান ও অম্লজান গ্যাসের সহজ পরীক্ষা।**—রাসায়নিক পরীক্ষায় সহজে বায়ুস্থিত অঙ্গারাম্লজান গ্যাস ও অম্লজান গ্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিস্কৃত চূনের জল বায়ুর সহিত ঝাঁকিয়া রাখিয়া দিলে ঘোলাটে হইয়া যায়; কারণ, বায়ুস্থিত অঙ্গারাম্লজান গ্যাসই চূনের সহিত মিশিয়া চক বা খড়িতে পরিণত হয়।

ক্ষারগুণবিশিষ্ট পাইরোগ্যালল নামক রাসায়নিক দ্রব্য হাওয়াতে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিলে, বায়ুস্থিত অম্লজান গ্যাস তাহার সহিত মিশিয়া বাদামী বর্ণ ধারণ করে। উল্লিখিত পরীক্ষা দ্বারা বায়ুতে অঙ্গারাম্লজান ও অম্লজান গ্যাসের অবস্থিতি অতি সহজেই প্রমাণ করিতে পারা যায়।

**বায়ু-সঞ্চালনের মূলকথা**।—বায়ু-সঞ্চালন ( Ventilation ) দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার এক প্রধান উপায়। কোন স্থানের দূষিত বায়ু বহিষ্কৃত করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করাকে বায়ু-সঞ্চালন ( Ventilation ) কহে। দূষিত বায়ুর সহিত বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ক্রমাগত মিশ্রিত হইয়া বায়ু-সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু পরিত্যাগ করি, তাহার ১০০ ভাগে ৪ ভাগ কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ( $CO_2$ ) মিশ্রিত থাকে। প্রশ্বাস-গ্রহণের পক্ষে এরূপ বায়ু অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে শতকরা ·০৪ ভাগ কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস থাকে। প্রশ্বাস-গ্রহণের পক্ষে এই বায়ু সর্বাপেক্ষা উপযোগী। তবে শতকরা ·০৬ ভাগ পর্যন্ত কার্বনিক অ্যাসিড প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, আমরা যদি কোন উপায়ে গৃহমধ্যস্থ দূষিত বায়ুর সহিত বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু এরূপ পরিমাণে মিশাইতে সমর্থ হই যে উহাতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ শতকরা ·০৬ ভাগের অধিক না হয়, তাহা হইলে ঐ বায়ুতে আমরা নির্বিঘ্নে প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি। বায়ু-সংমিশ্রণে ( Diffusion of air gases ) আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে ১০ হাজার ভাগে মাত্র ৪ ভাগ কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস থাকে। কিন্তু নিশ্বাস-পরিত্যক্ত ঐ

পরিমাণ বায়ুতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ অন্তত ৪০০ গুণ। সুতরাং, বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রতি নিশ্বাসে আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে অন্তত ১০০ গুণ অধিক কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস যোগ করিয়া দিতেছি। প্রত্যেক মানুষ প্রতি মিনিটে গড়ে ১৮ বার, সুতরাং প্রতি ঘণ্টায় ১ হাজার ৮০ বার এবং প্রতি দিনে প্রায় ২৬ হাজার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি নিশ্বাসে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা ১০০ ভাগ অধিক কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করিলে অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তুর নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুমণ্ডল প্রতিনিয়ত কি পরিমাণে দূষিত হইতেছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। বায়ু যদি চঞ্চল না হইত এবং বায়ু-সঞ্চালন না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসে পূর্ণ হইয়া জনমানবশূন্য হইত।

লঘু ও গুরু ভারযুক্ত দুইটি বাষ্প একত্র থাকিলে পরস্পর মিলিত হয়। বায়বীয় পদার্থের ইহাই সাধারণ ধর্ম। বায়বীয় পদার্থের এই সাধারণ ধর্মকে বাষ্প সংমিশ্রণ বলে। গৃহমধ্যস্থ বায়ু নানাপ্রকার দূষিত পদার্থের সংমিশ্রণে মুক্ত স্থানের বায়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারী হয়। বাহিরের বায়ু তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া, বিকৃত অংশ বাহির করিয়া লয়।

বাড়ীর বা গৃহের অভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে আনাকে আভ্যন্তরীণ বায়ু-সঞ্চালন ( Internal Ventilation ) বলে। আর, বাড়ীর চতুর্দিকের, অর্থাৎ, বাহিরের বাতাস পরিশুদ্ধ করার জন্য বায়ু-সঞ্চালনকে বহিঃপ্রদেশস্থ বায়ু-সঞ্চালন ( External Ventilation ) বলে। যখন নৈসর্গিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন হয়, তখন তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ু-সঞ্চালন (Natural

Ventilation ), আর যখন কৃত্রিম উপায়ে কল-যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহা সম্পন্ন হয়, তখন তাহা কৃত্রিম বায়ু-সঞ্চালন (Mechanical Ventilation) নামে অভিহিত হয়। ঘরের মধ্যে বায়ু-চলাচলের জন্য গৃহের দরজা-জানালাই প্রধান অবলম্বন। কাজেই তাহা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এই প্রকার বায়ু-সঞ্চালনকে 'Window Ventilation' অর্থাৎ দরজা-জানালাদির মধ্য দিয়া বায়ু-চলাচল বলে।

বাহিরের বায়ু বিশুদ্ধ ও নির্দোষ হইলে উপযুক্ত জানালা বা উপযুক্ত বায়ুপথ থাকিলে গৃহমধ্যস্থ বায়ুও স্বভাবত বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং বাহিরের বায়ুর দোষগুণের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নগর ও শহর অঞ্চলে পল্লীর মত উন্মুক্ত স্থানের অভাব। সেইজন্য বায়ু-চলাচলের উদ্দেশ্যে রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঘর-বাড়ীর উচ্চতা হ্রাস এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রাখার আবশ্যক হয়। তাহা ছাড়া, যাহাতে দূষিত পদার্থ বাতাসে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য জল দিয়া রাস্তার ধূলি নিবারণ, রাস্তার আবর্জনা যত সত্বর সম্ভব দূর করিবার ব্যবস্থা, ড্রেন ও পায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কৃত রাখা, প্রচুর খোলা জায়গার ব্যবস্থা রাখা এবং শহরের বাহিরে দূষিত সামগ্রীর ব্যবসায়ের স্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন।

**নৈসর্গিক বায়ু-সঞ্চালন** (Natural Ventilation)।—নৈসর্গিক যে সকল উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন হইতে পারে তাহা এই—১। সূর্যের কিরণ দ্বারা, ২। গাছ-পালা দ্বারা, ৩। বৃষ্টির দ্বারা, ৪। ঝড়ের দ্বারা, ৫। বায়ু আগম-নির্গমের পথের দ্বারা এবং ৬। বাষ্প-সংমিশ্রণের দ্বারা।

(১) সূর্য-কিরণে রোগ-জীবাণু নষ্ট হয়; উত্তাপে বাতাস শুষ্ক ও দুর্গন্ধহীন হয়। সূর্যের তাপে পৃথিবী-সংলগ্ন বাতাস গরম

ও হাল্কা হইয়া পড়ে। বাতাস হাল্কা হইলেই উপরে উঠিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকের বিশুদ্ধ বাতাস আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে।

(২) সূর্যের কিরণে গাছ-পালা দিবাভাগে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস গ্রহণ করে। বৃক্ষদেহে ঐ গ্যাস দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার একটি অম্লজান (Oxygen), অপরটি কার্বন (Carbon)। কার্বন গাছ-পালার দেহের পুষ্টি সাধন করে। অক্সিজেন দ্বারা বাতাস বিশোধিত হয়। তাহা ছাড়া, যেখানে গাছপালা বেশী, সেখানে বৃষ্টিও বেশী হয়।

(৩) বায়ুমধ্যে নানা প্রকারের দূষিত পদার্থ ভাসমান থাকে। মুষলধারে বৃষ্টি হইলে সেই সকল দূষিত সামগ্রী, উদ্ভিজ্জ ও জৈব রেণু, ধূম প্রভৃতি বৃষ্টি-বিধৌত হইয়া মাটিতে পড়ে। তাহাতে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। বৃষ্টির সহিত বজ্রপাত হইলে বায়ুতে ওজোনের (Ozone—$O_3$) পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ওজোন-বহুল বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

(৪) বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বায়ুর দূষিত অংশ বিতাড়িত হয়। গৃহমধ্যে দূষিত বায়ু থাকিলে তাহা অধিক পরিমাণ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়; ফলে, তাহার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং বাত্যাপ্রবাহে তাড়িত হইয়া গৃহমধ্যস্থ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

বায়ু-সংমিশ্রণ ছাড়া ঝড়ের সময় গৃহমধ্যে সজোরে বাতাস প্রবেশ করিয়া, গৃহমধ্যস্থ খারাপ বাতাসকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া লয়। গৃহে ও বাহিরে বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে ঝড়বাত্যা বিশেষ কার্যকরী। ঝড়ের সময় সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ বায়ু প্রবেশ করে, এবং আবদ্ধ দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেয়। বায়ুপ্রবাহ এক দিক্ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার নাম 'পারফ্লেশন'

( Perflation )। তবে এই পারফ্লেশন সকল সময় বায়ু-সঞ্চালনের সহায়তা করে না; কারণ বায়ু-প্রবাহ সময় সময় একেবারে বন্ধ হইতে পারে। 'পারফ্লেশন' ছাড়া আর এক প্রকারের বায়ু-প্রবাহ বায়ু-চলাচলের সাহায্য করিতে পারে। ফাঁপা নলের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইবার সময় নলমধ্যস্থ বায়ুর কতক অংশ বায়ুপ্রবাহ শোষণ করিয়া লয়; ইহাকে 'অ্যাস্পিরেশন' ( Aspiration ) বলে। গৃহমধ্যে বায়ু বা ধূম-নির্গমের চিম্‌নি ( Chimney ) থাকিলে 'অ্যাস্পিরেশন' দ্বারা বায়ু শোষণ বা আকর্ষণের ফলে গৃহের দূষিত বায়ু ক্রমাগত বাহির হইয়া যায়।

(৫) বায়ুর আগম-নির্গমের পথের উপরও বায়ু-সঞ্চালন নির্ভর করে। আগম পথে বায়ু প্রবেশ করে, আর নির্গম পথে বায়ু বাহির হইয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দরজা জানালা প্রভৃতির দ্বারাই প্রধানত বায়ু-সঞ্চালন হয়। বিশুদ্ধ বাতাস আগমের জন্য দরজা-জানালা সর্বদা উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া চিমনির দ্বারা বায়ু-চলাচলের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যেখানে দরজা-জানালা বায়ু-চলাচলের প্রধান অবলম্বন, সেখানে দরজা-জানালা রুজু রুজু বসাইতে হয়। ঘরের দেওয়ালে বাতাস যাতায়াতের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখাও প্রয়োজন।

(৬) বায়বীয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম এই যে, বিভিন্ন প্রকারের বায়বীয় পদার্থ একত্রিত হইলে, সকল পদার্থের সমস্ত উপাদান সমভাবে মিশ্রিত না হওয়া পর্যন্ত বায়ুরাশি ইতস্তত সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইহাকেই বলে—সংমিশ্রণ ধর্ম (Law of Diffusion)। বায়বীয় পদার্থের এই ধর্ম আছে বলিয়াই, ঘরের বাতাস গরম হইলেই বাহিরে যায়, আর বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করে। যতক্ষণ

না ঘরের ও বাহিরের বাতাসের উপাদানসমূহ সমান হয়, ততক্ষণ এই সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে।

**কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন।**—পূর্বোল্লিখিত স্বাভাবিক উপায় ব্যতীত কৃত্রিম ( Artificial বা Mechanical ) উপায়েও বায়ু-সঞ্চালন করা যায়। কৃত্রিম পদ্ধতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা— ১। ঘরের দূষিত বায়ু টানিয়া বাহির করিয়া, বিশুদ্ধ বায়ুদ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য বায়ুশূন্য করণ বা 'ভ্যাকুয়াম্' পদ্ধতি ( Vacuum System ), ২। দূষিত বায়ুতে তাড়িত করিবার জন্য 'প্লেনম্' পদ্ধতি ( Plenum System ), এবং ৩। এক সঙ্গে এতদুভয় পদ্ধতির সমাবেশ।

(১) **ভ্যাকুয়াম্ পদ্ধতি** ( Vacuum System )।—দুইটি উপায়ে গৃহ দূষিত-বায়ুশূন্য হইতে পারে। (ক) বৈদ্যুতিক পাখা চালাইলে ঘরের দূষিত বায়ু বিদূরিত হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু তাহার স্থান পূরণ করে; (খ) চিমনির সাহায্যে বায়ু-সঞ্চালন হয়; গৃহের উনানে অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিয়া তদুপরি একটি চিমনি বসাইলে অথবা ছাদের অব্যবহিত নীচে দেওয়ালের গায়ে ঘুল্‌ঘুলি থাকিলে, গৃহের বায়ু সেই চিমনি ও ঘুল্‌ঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যায়। উত্তাপে বায়ু-পরিমাণের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং ঘনত্ব কমিয়া যায়। তখন সেই পাতলা বাতাস উপরে উঠে এবং বাহিরের বাতাস তাহার স্থান অধিকার করে।

(২) **বায়ু-বিতাড়ন পদ্ধতি** ( Plenum System )।—এই পদ্ধতি অনুসারে পাখার দ্বারা অথবা বাষ্পীয় জেট ( Steam jet ) দ্বারা কিংবা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে গৃহের বায়ু বাহির করিয়া দেওয়া যায়।

(ক) এই পদ্ধতিতে গৃহের দূষিত বায়ু বিতাড়িত করিতে হইলে আট বা ততোধিক ব্লেড়যুক্ত পাখার প্রয়োজন। বায়ু নির্গমের পথও খুব

প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। (খ) 'ষ্টীম জেট' দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দূষিত বায়ু বাহির করা যায়। (গ) পাম্পের সাহায্যে বায়ু টানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সুবৃহৎ ও সুপ্রশস্ত হল-গৃহের বায়ু-সঞ্চালন জন্য 'ভ্যাকুয়াম্' ও 'প্লেনম্' উভয় পদ্ধতিই প্রযুক্ত হয়। লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা গৃহে ও কলিকাতার ট্রপিকেল স্কুলের 'কুল রুম' ( Cool Room ) বা ঠাণ্ডা ঘরে বায়ু-চলাচলের জন্য উভয় পদ্ধতি একযোগে কার্য করিতেছে। অবিরাম বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহের জন্যই বায়ু-সঞ্চালনের কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। বায়ু-সঞ্চালনের নৈসর্গিক উপায়সমূহ মানুষের আয়ত্তাধীন নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না ; কেন-না, বায়ুমণ্ডলের অবস্থার উপর তাহাদের কার্য নির্ভর করে। কিন্তু, কৃত্রিম উপায়সমূহ ব্যয়সাধ্য হইলেও মানুষের আয়ত্তাধীন। মানুষ তাহাদিগকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

**শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর পরিবর্তন।**—আমরা নিশ্বাস গ্রহণের সময় যে বায়ু টানিয়া লই তাহার অম্লজান ( Oxygen ) অংশের কতকটা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তকে বিশুদ্ধ করে। ঐ বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের মধ্যে সঞ্চালিত হইলে আমাদের জীবনরক্ষা হয়। আমাদের রক্তের সহিত অনেক দূষিত সামগ্রী নির্গত হয়। পরিত্যক্ত বায়ুর মধ্যে অঙ্গারাম্ল ও জলীয় বাষ্প অনেক বেশী থাকে। অঙ্গারাম্লজান গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ⅘ ঘনফুট পরিমাণ আমাদের নিশ্বাসের সহিত নির্গত হয়। নিশ্বাসের দ্বারা পরিত্যক্ত বায়ুর নিম্নলিখিত অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে ; যথা—

(১) উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নাসিকার নিকট হাত দিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় ;

(২) উহাতে অনেক জলীয় বাষ্প থাকে। ২৪ ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ ছটাক জল শরীরের ভিতর হইতে বাষ্পাকারে বহির্গত হয়। শারীরিক পরিশ্রম হেতু ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে;

(৩) উহাতে অঙ্গারাম্লজান গ্যাসের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি হয়।

**বায়ু-মধ্যস্থ দূষিত পদার্থ**।—(১) প্রাণিগণের চর্ম ও লোম প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত রেণু, ব্যাধিগ্রস্ত জীবদেহ হইতে পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুরূপে বায়ুতে ভাসমান নানাপ্রকার ব্যাধিজীবাণু, বৃক্ষাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমুদ্ভূত রেণু, ব্যবহৃত বস্ত্রাদির রেণু, কয়লা, নানাপ্রকার ধাতুপদার্থ এবং অন্যান্য বহু পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকাসকল ধূলিরূপে বায়ুকে দূষিত করে। ধূম বায়ুমণ্ডলের ভাসমান অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া মাত্র; উহা বায়ুকে বিশেষভাবে দূষিত করে। সকল প্রকার ধূলিকণাই অনেক সময় নানাবিধ রোগের জীবাণুতে পরিপূর্ণ থাকে।

(২) জীবের শ্বাস ক্রিয়ায় ও দহন ক্রিয়ায় বা জীবদেহের পচন ক্রিয়ায় সৃষ্ট কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে।

(৩) আবদ্ধ স্থানে ময়লা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইলে কার্বন্ মনক্সাইড ( Carbon Monoxide ) নামক একপ্রকার ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাষ্প তথায় সৃষ্ট হয়।

(৪) যে জলাভূমিতে উদ্ভিদ বা জীবাদি পচে, তথায় এবং কয়লার খনিতে 'মার্স গ্যাস' ( Marsh Gas ) নামক এক প্রকার খারাপ বাষ্প উত্থিত হয়। উহা অত্যন্ত দহনশীল পদার্থ; সামান্য কারণেই ঐ গ্যাস ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাকে আমরা আলেয়া বলি।

(৫) জীবের মল-মূত্র পচিয়া এমোনিয়া ( Ammonia ) নামক এক প্রকার উগ্রগন্ধযুক্ত বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত হয়।

(৬) পাথুরে কয়লা পোড়াইলে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবের দেহ বা মল পচিলে 'হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড' ( Hydrogen Sulphide ) নামক গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার গন্ধ ঠিক পচা ডিমের গন্ধের মত।

(৭) এতদ্ব্যতীত, অপরিষ্কার পচা ড্রেন বা নালা, পাট পচাইবার ও ধুইবার স্থান, মৎস্যের বাজার, পশুপক্ষী বিক্রয়ের বাজার, চামড়ার বাজার, শামূক পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিবার স্থান, কসাইখানা, শহরের ময়লা গাড়ীতে আবর্জনা বোঝাই করিবার জায়গা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে নানাবিধ উগ্রগন্ধযুক্ত গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে।

**জনবহুল স্থানের বায়ুর অবস্থা**।—কোন বহুজনাকীর্ণ বায়ুপ্রবাহ-রহিত ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে, সাধারণ বক্তৃতাস্থলে, সভাগৃহে ও থিয়েটারে বহুলোক-সমাগম হইলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির দ্বারা বায়ু দূষিত হয়; তৈলের আলো বা বাতি জ্বালাইলে কিছুক্ষণের মধ্যে তথাকার বায়ুতে অম্লজান গ্যাস হ্রাস পায় এবং অঙ্গারাম্লজান গ্যাস ঘনীভূত হইয়া বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। এরূপ স্থানে কিছুক্ষণ থাকিলে সুস্থ ব্যক্তিরও মাথাধরা, মাথাভার-বোধ, নিদ্রালুতা, আলস্য ও মনের অশান্তি, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্ষেত্রবিশেষে গা-বমি-বমি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বায়ুর উত্তাপ-বৃদ্ধির জন্যও ক্লেশের আধিক্য হয়। সকল রকম পীড়াই এরূপ দূষিত স্থানে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

**যক্ষ্মা প্রভৃতি বায়ু-বাহিত ব্যাধির সহিত নির্মল বায়ুর সম্বন্ধ**।—ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর যক্ষ্মারোগ-বৃদ্ধির একটি কারণ দূষিত বায়ু। আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক কারণে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া নূতন নূতন পাটকল, চটকল, চাউলের কল

প্রভৃতি নানাপ্রকার কলকারখানা হইতে উদ্গীর্ণ ধূম শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুকে নিয়ত দূষিত করিতেছে। শহরের বায়ু শত শত রোগীর ফুস্ফুস হইতে যক্ষ্মার জীবাণু লইয়া ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া দিতেছে। দরিদ্রদিগের শহরতলী ও নিকটবর্তী পল্লীকুটীরশ্রেণী এমনভাবে দূষিত-বায়ুপূর্ণ যে, ক্রমশ যক্ষ্মা রোগ তাহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত, কলিকাতার মত বৃহৎ নগরীতে যে সকল হর্ম্যশ্রেণী দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেও এমন কক্ষ আছে, যাহার বায়ু অত্যন্ত দূষিত ; কারণ, সে স্থানের বায়ু, সঞ্চালনের অভাবে রুদ্ধ থাকিয়া, রোগের আকর হইয়া আছে। বায়ু বিশুদ্ধ থাকিলে কোন পীড়া জন্মে না। দূষিত বায়ু রোগ-উৎপাদনের একটি প্রধান কারণ। সহজেই অনুমান করা যায় যে, একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি ৬,৬৮,০০০ বর্গফুট দূষিত বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত শরীরের জন্য গ্রহণ করেন, তবে কোন না কোন রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবেই। দূষিত বায়ুর সহিত যে পীড়া শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহাকে বায়ুবাহিত পীড়া ( Air borne Diseases ) বলে।

বায়ু নিম্নলিখিত তিন প্রকারে শরীরে ব্যাধি সংক্রামিত করিতে পারে। প্রথমত, পীড়ার জীবাণু বায়ুর সহিত সাক্ষাৎভাবে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে পারে ; যেমন,—যক্ষ্মা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলযন্ত্র ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য বায়ুবাহিত দূষিত পদার্থ শ্বাসনালীর দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া ব্যাধি সংক্রামিত করে। কলের ধূম, তামা, সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতির গুঁড়া, তামাক, কয়লা, পশুর লোম প্রভৃতি হইতে নিক্ষিপ্ত ময়লা দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাধি সংক্রামিত হয়। তৃতীয়ত,

অস্বাস্থ্যকর ক্ষার ও অ্যাসিডের কারখানার গ্যাস, আর্সেনিক ও এমোনিয়া প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিয়া ব্যাধি জন্মায়।

**বায়ুশোধনের সহজ উপায়।**—যে সকল উপায়ে বায়ু পরিশুদ্ধ হইতে পারে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে ; যথা—

১। উদ্ভিদ্ সূর্যকিরণ সাহায্যে 'কার্বনিক অ্যাসিড্' হইতে কার্বন গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এতদ্ব্যতীত 'এমোনিয়া গ্যাস' বৃষ্টির জলে দ্রব হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে বায়ু শোধিত হইয়া থাকে।

২। বায়ুর ভাসমান দূষিত পদার্থ বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হইলে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

৩। ভেন্টিলেশন অর্থাৎ বায়ু-চলাচল।—বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলেই বায়ু-চলাচল ক্রিয়া সাধিত হয়। অর্থাৎ, অন্য স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে কতকটা শোধন করে।

(ক) ডিফিউশন (সংমিশ্রণ)।—দুইটি গ্যাস একত্রে রাখিলে তাহারা পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। গ্যাসের এই ক্রিয়াকে সংমিশ্রণ ক্রিয়া কহে। কোন কোন গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলেও উক্ত গৃহমধ্যস্থ বায়ু প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হয় এবং বাহিরের বায়ু-সংমিশ্রণ ক্রিয়ার দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। এই ক্রিয়ার দ্বারাই গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ু কিয়ৎপরিমাণে শোধিত হয়। চূণকাম করা গৃহ হইলেও উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের ফুস্‌ফুস ও ত্বক্ হইতে যে জান্তব পদার্থ নির্গত হয় তাহা উক্ত ক্রিয়ার দ্বারা শোধিত হইতে পারে না।

(খ) উত্তাপের তারতম্যানুসারে বায়ু শোধিত হয়। গৃহের বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা উত্তপ্ত হইলে ঊর্ধ্বে ধাবিত হয় এবং বাহিরের

শীতল বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করে। এইজন্য ছাদের নিকট বায়ু-নির্গমের জন্য ছোট ছোট গোলাকার পথ রাখা হয়।

(গ) ঝড়ের দ্বারা বায়ু পরিশোধিত হয়।

(ঘ) অক্সিজেন ক্রিয়ার দ্বারা বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। অগ্নি লাগিলেও বায়ু শোধিত হইয়া থাকে।

(চ) রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। যে সকল পদার্থের দুর্গন্ধনাশক ও দুর্গন্ধহারক গুণ আছে, সেই সকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য তিন ভাগে বিভক্ত—কঠিন, জলীয় ও বাষ্পীয়।

**প্রথম**—কঠিন ; যথা—চার্কোল্, শুষ্ক মাটি, চূণ, সাজিমাটি, আলকাত্রা ও হীরাকষ প্রভৃতি।

**দ্বিতীয়**—জলীয় ; যথা—ফ্লুইড্, ক্লোরাইড্ অভ্ জিঙ্ক, তাপিন তৈল, ফর্মালিন, আইজল, লাইসল ও পারক্লোরাইড্ লোশন্।

**তৃতীয়**—বাষ্পীয় ; যথা—ওজোন্, ক্লোরিন্ এবং সাল্ফিউরিয়স্ অ্যাসিড ইত্যাদি।

অঙ্গার-চূর্ণ, শুষ্ক মাটি ও ছাই প্রভৃতি দ্বারা দূষিত পদার্থ উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিলে, বিষজনিত রোগ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

গন্ধক পোড়াইলে সাল্ফিউরিয়স্ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। যে গৃহে ছোঁয়াচে ব্যাধিগ্রস্ত রোগী থাকে, সেই গৃহ পরিশোধিত করিবার জন্য ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। গৃহ পরিশোধিত করিতে হইলে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে গন্ধক পোড়াইতে হয়। পরে চারি পাঁচ ঘণ্টা অতীত হইলে দরজা ও জানালাসমূহ খুলিয়া দেওয়া উচিত।

**প্রত্যেকের কত বায়ুর প্রয়োজন।**—পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির জন্য ঘণ্টায় তিন হাজার ঘনফুট

বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যক। গ্যাসের আলো জ্বালিলে ঘণ্টায় ছয় ঘনফুট অঙ্গারাম্ল (কার্বনিক অ্যাসিড) গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহাকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য দশ হাজার ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। দীপালোকে ঘণ্টায় অর্ধ ঘন-ফুট অঙ্গারাম্লজান গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই জন্য গৃহে প্রদীপ জলিলে কেবল দাহজনিত দূষিত পদার্থকে শোধন করিবার জন্য নয় শত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে জান্তব পদার্থ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। এই নিমিত্ত হাসপাতালে আরও অধিক বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ঘণ্টায় তিন হাজার ফুট এবং পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে চারি অথবা সাড়ে চারি হাজার ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ু প্রয়োজন হয়।

**প্রত্যেকের কত স্থান প্রয়োজন।**—কোন স্থানের বায়ু-চলাচলের বিষয় স্থির করিতে হইলে কেবল ঘনস্থানের ঘন পরিমাণ না ধরিয়া বাসস্থান এবং মেঝের জায়গা অথবা মধ্যবর্তী স্থানের হিসাব ধরিয়া স্থান নির্ধারণ করা উচিত। কোন গৃহ যদি অল্প-পরিসর হয় অর্থাৎ মেঝেতে জায়গা কম থাকে এবং গৃহের উচ্চতা বেশী হয়, তাহা হইলে সেই গৃহের ঘনস্থানের অপর একটি অধিক প্রশস্ত ও কম উচ্চ গৃহের ঘনস্থান অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত গৃহ-কক্ষ হইতে যে উত্তমরূপে বায়ু-পরিচালন হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত অত্যধিক উচ্চ গৃহে বায়ু-পরিচালনার জন্য ঘনস্থান হিসাব করিতে হইলে, তাহার উচ্চতা ১২ ফুটের অধিক গণনা করা উচিত নহে; কারণ, ১২ ফুটের অধিক উচ্চ গৃহে ভালরূপে বায়ু-সঞ্চালন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিলাতের ছাত্রাবাসে ৩০ বর্গফুট এবং ২৪০ ঘনফুট স্থান এবং জেলে ৮০০

ঘনফুট স্থান দেওয়া হয়। প্রত্যেক দেশীয় সৈন্যকে ৬২ বর্গফুট এবং দেশীয় কয়েদীকে ৩৬ বর্গফুট স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত ছাত্রাবাসে একজন ছাত্রের জন্য ৬০ বর্গফুট পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট আছে। অনেক সময় লোকের ওজন অনুসারে স্থান পরিমিত হইয়া থাকে। এক পাউণ্ড ওজনের মানুষের জন্য দুই বর্গফুট জায়গা দেওয়া হয়।

## (গ) জল

জল আমাদের জীবনস্বরূপ। মানুষের শরীরে স্বীয় ওজনের ২/৩ ভাগ জল আছে। রক্তের শতকরা ৮০ ভাগ জল, মস্তিষ্কের শতকরা ৮০ ভাগ জল, কঠিন হাড়েও শতকরা ১০ ভাগ জল আছে। আমরা যাহা আহার করি, তাহাতেও অনেকখানি জলীয় অংশ থাকে। সুতরাং, বেশ বুঝা যাইতেছে, জীবনধারণের জন্য জল কত প্রয়োজনীয়।

**জলের আবশ্যকতা।**—জীবনধারণের পক্ষে জলের অশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য জল পান করি। জল দেহের রক্ত তরল রাখে। পাচক রস ও দেহের যাবতীয় জলীয় অংশ জল হইতে সংগৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, জল শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠনে সহায়তা করে। শরীর বিধৌত করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। শরীরের দূষিত পদার্থসমূহ জলের সাহায্যে প্রস্রাব ও ঘর্মরূপে বাহির হইয়া যায়। জলে অবগাহন করিয়া আমরা দেহের ময়লা ধৌত করি। কাপড়, জামা, তৈজসপত্র ও গৃহাদি ধৌত করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। এতদ্ভিন্ন, রাস্তা, ঘাট, নর্দমা প্রভৃতি ধৌত করিবার জন্য, গো-মহিষাদি জীবজন্তুর ও বৃক্ষলতাদির

জীবনধারণের জন্য, রন্ধনের উদ্দেশ্যে, শৌচক্রিয়া, অগ্নি-নির্বাণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যাদির সুবিধা, কৃষি কার্যের জন্য, গাড়ী ও আস্তাবলাদি ধৌত করিবার জন্য জলের একান্ত প্রয়োজন হয়।

**গঠন ও প্রকৃতি।**—দুই ভাগ উদজান ( Hydrogen ) এবং এক ভাগ অম্লজান ( Oxygen ) গ্যাস—এই দুইটির রাসায়নিক সংযোগে জল ($H_2O$) উৎপন্ন হয়। জলের তিনটি রূপ—( ১ ) বাষ্পীয়, ( ২ ) তরল ও ( ৩ ) কঠিন। বাষ্প, কুয়াসা, শিশির, মেঘ, বরফ, শিলাবৃষ্টি ও তুষার প্রভৃতি জলের বিবিধ রূপান্তর মাত্র।

জল শীতল, স্বচ্ছ, তরল ও অনমনীয়। জল স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন। ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপে ( 100° Centigrade ) অথবা ২১২° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপে ( 212° F ) জল ফুটিতে থাকে। কিন্তু 0° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বা ৩২° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপে জল জমিয়া বরফ হয়। উত্তপ্ত হইলেও জলের আয়তন-বৃদ্ধি হয়, আবার ঠাণ্ডা হইলেও জলের আয়তন বাড়ে। ৪° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপে জল সর্বাপেক্ষা বেশী ঘন হয়।

**'খর' ও 'মৃদু' জল** ( Hard & Soft Water ), **'খর' জলকে 'মৃদু' করিবার উপায় এবং সাবানের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া।**—জলের মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ হেতু অনেক সময় দেখা যায়, সাবান গুলিলে কতকগুলি জলে ফেনা হয় না। সেই জলকে 'খর' জল ( Hard Water ) বলে। আর যে জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা উঠে, তাহাকে 'মৃদু' ( Soft Water ) জল বলে। প্রথমোক্ত জলে ক্যাল্‌সিয়ম ( Calcium ) ও ম্যাগ্‌নেসিয়ম্‌ ( Magnesium ) ধাতুর Carbonate ও Bi-carbonate—এই দুইটি যৌগিক সংমিশ্রণ না থাকিলে, উক্ত জল

ফুটাইলেও তাহাতে ফেনা হয় না। ইহাকে স্থায়ী খরতা ( Permanent Hardness ) বলে। পরন্তু, Carbonate ও Bi-carbonate মিশ্রণে যে কাঠিন্য ( Hardness ) জন্মে, জল ফুটাইলে তাহা দূরীভূত হয় এবং তাহা হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস নির্গত হইয়া যায়। ফুটাইবার পর সেই জলে সাবান গুলিলে বেশ ফেনা হয়। ইহাকেই অস্থায়ী খরতা ( Temporary Hardness ) বলে।

স্বাভাবিক জলে যদি স্থায়ী খরতা ( Permanent Hardness ) থাকে, তাহা হইলে তাহা নিরাকরণের জন্য তাহার সহিত চূণের জল বা সোডা মিশান প্রয়োজন।

**খর জলের প্রকৃতি।**—(ক) খর জল ( Hard Water ) দিয়া রান্না করিলে খাদ্য-দ্রব্য ভাল সিদ্ধ হয় না; কারণ, রন্ধনকালে উহার ভিতর জল যাইতে পারে না।

(খ) সাবান গুলিলে বিস্তর সাবান নষ্ট হয়। সাবানে ফেনাও হয় না, কাপড়ও ভাল পরিষ্কার হয় না।

**মৃদু জলের প্রকৃতি।**—(ক) বায়ু হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস টানিয়া লইয়া মৃদু জল ( Soft Water ) খর জলে ( Hard Water ) পরিণত হইতে পারে।

(খ) সেই হেতু মৃদু জল ( Soft Water ) যদি সীসার নল, তামার নল কিংবা দস্তার নলের মধ্য দিয়া যায়, অথবা উক্ত তিন ধাতুর নির্মিত ট্যাঙ্কে সংগৃহীত থাকে, তাহা হইলে উক্ত তিন ধাতুর সংমিশ্রণে জল দূষিত হইতে পারে।

**জনপ্রতি দৈনিক কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন।**—প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনিক কত জলের প্রয়োজন হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

দেশের জল-বায়ু ও ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপর ব্যবহার্য জলের পরিমাণ নির্ভর করে। পানীয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার ব্যবহারের জন্য প্রতি লোকের সাধারণত গড়ে ৪ মণ (৩০ গ্যালন; প্রতি গ্যালন প্রায় ৫ সের) জলের প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মকালে উক্ত পরিমাণ বাড়িয়া ৫ মণে (৪০ গ্যালনে) দাঁড়ায়। সুস্থ দেহের পক্ষে এই পরিমাণ জল হইলেই চলে; কিন্তু রুগ্নদেহে আরও একটু বেশী জলের আবশ্যক হয়। এক এক রোগীর জন্য গড়ে দৈনিক প্রায় ৬ মণ (৫০ গ্যালন) জলের আবশ্যক হয়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোড়ার জন্য প্রত্যহ ১৫ গ্যালন এবং গরুর জন্য ১২ গ্যালন জল লাগে। তবে, ঋতু হিসাবে আবার পরিমাণের ইতরবিশেষ ঘটে।

নিশ্বাস, ঘর্ম, মূত্র ও বিষ্ঠার সহিত শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন সের জল বাহির হইয়া যায়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য আমাদের তৃষ্ণা বা পিপাসা হয়। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম অধিক হয়; তাই তৃষ্ণাও বেশী লাগে। বহুমূত্র রোগীর দেহ হইতে প্রস্রাবের সহিত অধিক জল নির্গত হয়। সেইজন্য তাঁহাদের পিপাসাও অধিক।

**স্বাস্থ্যের সহিত সম্বন্ধ।**—পিপাসা-নিবারণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির গড়ে ⁄২॥ সের হইতে ⁄৩ সের জলের আবশ্যক হয়। পরিশ্রম, বয়স ও ঋতু বিশেষে তৃষ্ণার তারতম্য ঘটে। জলের অভাবে পরিপাক ক্রিয়ার ও পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে; মাংসপেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলী নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শরীর শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়। জলের অভাবে রক্ত গাঢ় হওয়ায়, শরীরের দূষিত অংশ বাহির হইতে পারে না। ঘর্ম, প্রস্রাব ও মলের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং শীঘ্রই শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দূষিত জল পান

করিলেও নানা বিপত্তি ঘটে। দূষিত জলের সহিত নানা রোগ-জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। জলের সহিত তাহা শরীরে প্রবেশ করিয়া নানা উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি করে। সুতরাং, বেশ বুঝা যাইতেছে, স্বাস্থ্যের পক্ষে জল কত প্রয়োজনীয় এবং বিশুদ্ধ জল কত উপকারী।

**জল সরবরাহ**—মূলে সমুদ্রই সংসারের যাবতীয় জল সরবরাহের প্রধান, আদি ও অফুরন্ত উৎস। গ্রীষ্মমণ্ডলে অহর্নিশ সূর্যের উত্তাপে জল সমুদ্র হইতে অদৃশ্য বাষ্পাকারে শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমুদ্রের উপরিভাগস্থ প্রতি বর্গ মাইল স্থান হইতে প্রায় ৭০০ গ্যালন বা ৩,৫০০ সের জল প্রতি মিনিটে বাষ্পাকারে শূন্যে উত্থিত হইতেছে। সমুদ্রোপরি প্রবাহমান বায়ুর সহিত সেই বাষ্প মিশ্রিত হওয়ায় বাতাস আর্দ্র হইতেছে, আর ঠাণ্ডা বাতাসে জমাট বাঁধিয়া মেঘের সৃষ্টি করিতেছে। পরে সেই মেঘই বিগলিত হইয়া বৃষ্টি, বরফ, শিশির, কুয়াসা ও তুষাররূপে পৃথিবীতে পৌছিতেছে। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, বায়ুমধ্যস্থ ঘনীভূত জলই আমাদের স্বাভাবিক জল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র।

**প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় এবং কৃত্রিম উপায়ে**—এই দুইভাবে আমরা জল প্রাপ্ত হই। বৃষ্টির জল, ভূ-গর্ভস্থ জল, হ্রদের জল ও ঝরণার জল—প্রাকৃতিক জলের পর্যায়ভুক্ত। পর্বতগাত্র-সংলগ্ন বরফ-গলা জল, বৃষ্টির জল বা উৎসের জল নদীরূপে প্রবাহিত হয়। নদী ভিন্ন আমরা আরও নানা স্থান হইতে জল প্রাপ্ত হই; যথা—উৎস বা ঝরণা, গভীর কূপ, অগভীর কূপ, পুষ্করিণী, পর্বতগাত্র, হ্রদ, নলকূপ প্রভৃতি। এইরূপ নানা স্থান হইতে আমাদের জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

**বৃষ্টির জল** ( Rain water )—বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। কিন্তু প্রথম পশ্‌লা বৃষ্টি বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণা ও দূষিত বাষ্পাদি, জৈব পদার্থ ও জীবাণু প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয়। তার পর যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা পরিষ্কার পাত্রে ধরিয়া রাখিলে বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানীয় জল পাওয়া যায়।

বৃষ্টির জলের কতকাংশ বাষ্পাকারে উঠিয়া যায়; কতকাংশ নদী, খাল, বিল, হ্রদ ও পুষ্করিণীর জল সরবরাহ করে; কতক সমুদ্রে চলিয়া যায়, আর কতকাংশ মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। বৃষ্টির জলের যে অংশ মাটিতে প্রবেশ করে, তাহার পরিমাণ একেবারে অল্প নহে। এই জল হইতেই প্রস্রবণ, দীর্ঘিকা, কূপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভূগর্ভে বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকার স্তর রহিয়াছে। সেই সকল স্তরের কোনটির মধ্য দিয়া জল সহজে চোয়াইয়া যাইতে পারে, আবার কোন স্তর এত কঠিন যে, তাহার মধ্যে মোটেই জল প্রবেশ করিতে পারে না। শেষোক্ত অশোষক স্তরে যে জল সঞ্চিত থাকে, কূপ প্রভৃতি হইতে আমরা সেই জল প্রাপ্ত হই। মৃত্তিকার উপরিভাগস্থ দূষিত পদার্থ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া প্রথম শোষক স্তরের উপরিস্থ জলের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে প্রথম শোষক বা রসবাহী স্তরের অনেক দূর পর্যন্ত জল দূষিত অবস্থায় থাকে।

**সমতল ভূমির জল** ( Surface Water )—উচ্চ ভূমির ( Upland Water ) বা পর্বতগাত্র-বিধৌত জল লোকালয়ের মধ্য দিয়া না আসায় কতকটা বিশুদ্ধ থাকে। ধাতব পদার্থ, লবণ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান থাকে বলিয়া পর্বতগাত্র-বিধৌত জল অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু। পুকুর, খাল, বিল, ডোবা প্রভৃতির জল নিম্ন সমতলভূমির ( Lowland

Surface Water ) জল। জৈব ও উদ্ভিজ্জ মল দ্বারা এই সকল জল দূষিত হইতে পারে।

**ভূ-গর্ভস্থ জল** ( Ground Water )—ঝরণা ও কূপ হইতে আমরা এই জল প্রাপ্ত হই। জমির প্রকৃতি অনুসারে কূপ গভীর ও অগভীর হইয়া থাকে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় গভীর কূপ দেখা যায়। গভীর কূপগুলির জল স্বভাবত বিশুদ্ধ; কেন-না, তাহারা প্রথম রসবাহী স্তর ছাড়াইয়া যায়। গভীর ঝরণার ( Deep Springs ) জল সুস্বাদু ও খর। ঝরণার নানা প্রকারভেদ আছে; যথা,—উষ্ণজলের ঝরণা, মেন স্প্রীং ( Main Spring ), ল্যাণ্ড স্প্রীং, ইণ্টারমিটেণ্ট স্প্রীং প্রভৃতি।

**পুষ্করিণী**—পুষ্করিণীর জল দুই প্রকারে সরবরাহ হয়। প্রথমত, মাটির মধ্য দিয়া চোয়ান জল আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়ে; দ্বিতীয়ত, পুষ্করিণীতে বৃষ্টির জল পতিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ হইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া পুষ্করিণীতে পড়ে।

**নদীর জল**—প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন নদীর জল অতি স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে। বহু প্রস্রবণ মিলিত হইলে নদীর সৃষ্টি হয়। পর্বতগাত্র বাহিয়া জলপ্রবাহ নদীতে মিশিলেই নদীর জল কর্দমাক্ত ও ঘোলা হইয়া উঠে। যতই জনপদের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হয়, ততই নদীর জলের সহিত নানা প্রকারের আবর্জনা আসিয়া মিশিতে থাকে।

**বাংলা দেশে জল সরবরাহ**—বঙ্গদেশ নদীবহুল। প্রধানত নদী হইতেই বাংলার অধিকাংশ স্থানে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। নদী ভিন্ন বাংলার বহু স্থানে দীঘি বা পুষ্করিণী, ইঁদারা, কূপ প্রভৃতি খনন করিয়াও জল সরবরাহ করা হয়।

পূর্ব বঙ্গ নদীবহুল; সেখানকার অধিবাসিগণ সাধারণত নদীর জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাসস্থান হইতে নদী একটু দূরে হইলে সেখানকার অনেকে পুষ্করিণী, খাল ও কূপ প্রভৃতির জল দ্বারা জলের অভাব মোচন করেন। বর্ষাকালে বঙ্গদেশ, প্রধানত পূর্ব বঙ্গ, জলে ভাসিয়া যায়। সেই বর্ষার জলে খাল, বিল ও পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাতে জলকষ্ট দূর হয়।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গের ন্যায় নদীবহুল নহে। খাল, বিল, পুষ্করিণীর সংখ্যাও কম। সেইজন্য পশ্চিম বঙ্গে প্রায়ই জলকষ্ট লাগিয়া আছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া-তো দূরের কথা, অনেক গ্রামে জল একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। যে সকল গ্রামের সন্নিকটে নদী নাই, সেই সকল স্থানে জলের জন্য অনেক সময় বহু দূর পর্যন্ত যাইতে হয়। অনেক পল্লীতে কূপের জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল কূপ প্রায়ই অগভীর ও কাঁচা; ইহাদের জলও প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর।

নলকূপ

বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনেক গভীর কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জল বেশ ভাল। নদীতীরস্থ গ্রামসমূহে জলের অনেক সুবিধা থাকিলেও গ্রীষ্মকালে নদী শুকাইয়া গেলে, জলকষ্ট উপস্থিত হয়। অধুনা নলকূপের দ্বারা অনেক স্থানে নিরাপদ জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে।

**জল দূষিত হইবার কারণ**—অনেকে নদী, খাল, পুকুর বা দীঘির জলের কিঞ্চিৎ উপরিভাগেই মলত্যাগ করিয়া থাকেন। এই মল

জলের সহিত মিশিয়া জলাশয়ে পতিত হইয়া জলকে দূষিত করে। জোয়ারের বা বৃষ্টির জল বাড়িলেও ঐ সকল মল জলে ভাসিয়া যায়। কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর পাড়েই পায়খানা দেখা যায়।

কখন কখন শিশুদিগের গাত্র-সংলগ্ন মল পুষ্করিণীতে ধৌত করা হয়। সেই মল জলে মিশিয়া জল দূষিত করে। ছোট ছোট শিশু বিছানায় মলত্যাগ করিয়া থাকে। সেই বিছানা পুষ্করিণীতে ধৌত করা হয়। এই প্রকারেও জল দূষিত হইয়া থাকে।

স্নানাদি কালে অনেকে পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ উপরে, জলের এক পার্শ্বে প্রস্রাব করিয়া থাকেন। এই মূত্র গড়াইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। কেহ কেহ জলের মধ্যেই প্রস্রাব করিয়া জল দূষিত করেন। জলে নামিয়া স্নান করিলে, শরীরের ঘর্ম ও ময়লা এবং কাপড়ের ময়লা জলের সহিত মিশিয়া জলকে দূষিত করে। পূঁযযুক্ত কাপড়, পিকদানি, কফযুক্ত কাপড়, গোবরছড়ার হাঁড়ি ও ন্যাতা এবং ময়লা হাত-পা ধোয়ার জন্য জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয়।

নদীতে মৃত জীবজন্তু ও মনুষ্যদেহ ফেলিলে জল দূষিত হয়। পাট ও শণ পচাইবার ফলে আজকাল বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র জল খারাপ হইতেছে। পাট-পচার জন্য জল দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও সেই জলে ম্যালেরিয়াবাহী 'এনোফেলিস' নামক মশক-শাবক জন্মে। এইভাবে সেই জল ম্যালেরিয়া পরিব্যাপ্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

যে সকল কারণে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইতে পারে, সেই সকল কারণে কূপ-জলও দূষিত হইয়া থাকে। অগভীর কূপের মধ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ ময়লা ইত্যাদি আসিয়া মিশ্রিত হয় ও জলকে দূষিত করে।

**জলমধ্যস্থ দূষিত পদার্থ**।—পর্বতে তুষারপাতে বরফ সঞ্চিত হয়। সেই বরফ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে গলিত হয়

পুকুরের জল দূষিত হইতেছে

এবং ঝরণার আকারে নদী ও নালা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। জলস্রোত যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই সেই স্থানে কোন কিছু দূষিত পদার্থ থাকিলে, তাহাও জলের সহিত মিশিয়া জল দূষিত করে। যে মৃত্তিকাতে পুষ্করিণী বা কূপ খনন করা হয়, তাহাতে যদি অপকারী ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত থাকে বা গলিত জীবদেহ বা উদ্ভিদাদি নিহিত

এক ফোঁটা দূষিত জলে জীবাণুর সংখ্যা

থাকে, তাহা হইলে উহাদের সংমিশ্রণে পুষ্করিণী ও কূপের জল দূষিত হয়। অভ্র, গন্ধক ও লবণময় স্থান হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হয়, তাহাদের জল ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। গলগণ্ড রোগ এই প্রকার দূষিত জল পানের ফলেই হইয়া থাকে।

জলের মধ্যে যে সকল গাছ জন্মে, তাহা পচিয়া যে জল দূষিত হয়, সেই জল পান করিলে পেটের অসুখ ( Diarrhœa ) ও আমাশয় ( Dysentery ) হইতে পারে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ সল্‌ফেট্ বা ক্লোরিন থাকিলে বেদনা ( Irritation ) হইয়া পেটের অসুখ হইতে পারে। জলে দস্তা ( Zinc ) থাকিলে সেই জল পান করায় কোষ্ঠবদ্ধতা ( Constipation ) হইতে পারে। জলে লৌহ ( Iron ) থাকিলে অজীর্ণরোগ ( Dyspepsia ) হইয়া থাকে।

কূপের ধারে যদি বাসনাদি মাজা হয় ও তৎসংক্রান্ত আবর্জনা প্রভৃতি প্রায়ই জমা হয়, কিংবা ব্যবহৃত ময়লা জল বাহির হইবার জন্য নর্দমা না থাকে কিংবা ঐ নর্দমা প্রায়ই ময়লায় আবদ্ধ থাকে, অথবা অতি নিকটে পায়খানা ও তৎসংলগ্ন ময়লা জলের গর্ত বা গো-শালা থাকে, তাহা হইলে নানাপ্রকার চোয়ানি জল মাটিতে বসিয়া তাহা নিয়ত কূপে পতিত হয় এবং জল দূষিত করে।

সুতরাং, কূয়ার চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত, জমিতে কোন আবর্জনা জমিতে দিবে না। এ সম্বন্ধে জনৈক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন,—"যে কূয়াটি যত গভীর, কূয়ার সেই গভীরতার পরিমাপের অর্ধেক ব্যাস ধরিয়া, একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে ঐ বৃত্তের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত জমি পড়ে, ততদূর হইতে জল আসিয়া কূয়ার মধ্যে পতিত হয়।" কিন্তু জলের চোয়ানি যে কত দূর হইতে আসিতে পারে, তাহার স্থিরতা নাই। তবে, পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সাধারণত ২০০ বা ২২৫ হাত দূরে ময়লা, নর্দমা প্রভৃতি থাকিলে তাহার চোঁয়ানি আর কূয়ায় আসিতে পারে না।

**সংরক্ষিত পুষ্করিণী** ( Reserved Tank )—গ্রামের ভিতর কোন কোন পুষ্করিণীকে সংরক্ষিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়; নতুবা, অশিক্ষিত মেয়ে ও পুরুষেরা নানাভাবে পুকুরের জল পানের অযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে।

পুষ্করিণীর মধ্যে ফিতার ন্যায় পত্রবিশিষ্ট 'চিনে শেওলা' নামক এক প্রকার শেওলা জন্মাইতে পারিলে জল খুব বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ থাকে। ঐ শেওলাগুলি অত্যধিক বাড়িয়া গেলে মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেওয়া উচিত। পুষ্করিণীর জলে সর্বদা রৌদ্র লাগিলে জল ভাল থাকে।

## গৃহে জলবিশোধনের উপায়

(১) **জল সিদ্ধ করিয়া লওয়া** ( Boiling )—অন্তত পনর মিনিট কাল জল ভালরূপ ফুটাইয়া সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে জলে দ্রবীভূত খড়িমাটির অংশ পাত্রের তলায় পড়ে এবং জলবাহিত ব্যাধির জীবাণু ও কৃমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জল গরম করার দোষ এই যে, উহা অতি বিস্বাদ হইয়া যায়। সেইজন্য সিদ্ধ করা জল ঠাণ্ডা করিয়া কোন পাত্রে ঢালিয়া যদি কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে রাখা যায় এবং তলায় ছিদ্রযুক্ত কলসী হইতে পরিষ্কার বায়ুর মধ্য দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সেই পাত্রে পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ জল স্বাদযুক্ত হইতে পারে।

উদ্যানে গাছে জল দিবার জন্য যে ঝাঁঝরি ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ঝাঁঝরির মধ্য দিয়া একটি পাত্রান্তরে ফেলিলেও জলের বিস্বাদভাব দূর হইতে পারে এবং দুই তিন বার ঐ প্রকার করিলে জল বেশ স্বাদযুক্ত হয়। সহজ ও সস্তা অথচ নিশ্চিতরূপে জল বিশুদ্ধ করিবার পদ্ধতি ইহার অপেক্ষা অন্য কিছু নাই।

(২) **ফিটকিরির ( Alum ) দ্বারা জল বিশোধন করা**—কর্দমাক্ত ঘোলা জল পরিষ্কার করিতে হইলে জলের মলিনতার অনুপাতে

মণকরা দুই আনা হইতে সিকি ভরি পরিমাণ ফিট্‌কিরি লইয়া, উহা স্বতন্ত্র পাত্রে ঢালিয়া জলে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

জল ফুটাইয়া বিশুদ্ধ করা হইতেছে

অথবা চতুর্দিকে বড় বড় ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশের চোঙ্গা লইয়া উহাতে একটি হাতল সংলগ্ন করত কলসীর জলে ফিট্‌কিরি ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) **জল ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা** ( Filtration )—সচ্ছিদ্র অথচ জমাট বস্তুর উপর কিঞ্চিৎ জল দিলে উহাতে সেই জলের সমস্ত ভাসমান রেণুবৎ পদার্থ আটকাইয়া যায়, কেবলমাত্র জলটুকু পরিষ্কার হইয়া আসে। এইরূপে জল পরিষ্কার করিয়া লওয়ার নাম—ফিল্টার

করা। দ্রবীভূত পদার্থ ফিল্টারের দ্বারা দূরীভূত হয় না। জলে চিনি বা লবণ গুলিয়া ফিল্টার করিলে, জলে তাহা থাকিয়া যায়।

জল পরিষ্কারের' জন্য গৃহস্থের বাড়ীতে নিম্নলিখিত উপায়ে ছাঁকন ( ফিল্টার—Filter ) প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

**ঘড়ার ফিল্টার**—একটি বাঁশের বা কাঠের ফ্রেম ( Frame ) প্রস্তুত করিয়া, উহাতে উপর্যুপরি তিনটি কলসী সজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক কলসীর তলদেশে এক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ছিদ্রগুলি খড়, সূতা বা ন্যাকড়ার টুক্‌রা দিয়া এমনভাবে বন্ধ করিতে হয় যে, ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে। সর্বনিম্নে একটি ভাল কলসী থাকে। বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা তাহার মুখ ঢাকিয়া দিতে হয়। মধ্যের দুইটি কলসীর উপরের কলসীতে ভাল কাঠ-কয়লা ও তাহার নিম্নের কলসীতে ভাল বালি দেওয়া হয়। কয়লা বেশ করিয়া জলে ভিজাইয়া, ধুইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া দেওয়া উচিত। বালিগুলি লাল রঙের ( যেমন কলিকাতার বাজারের মগরার বালি ) হইলে ভাল হয়। উপরের কলসীতে জল আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিতে হয়। জল কর্দমাক্ত হইলে উহা কতক সময় পাত্রে করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত। কর্দমগুলি জলের তলায় পড়িয়া গেলে, উপরকার পরিষ্কার জল ধীরে ধীরে ফিল্টারের উপরের কলসীতে দিতে হয়। ফিট্‌কিরি বা নির্মলি ফলের দ্বারাও কর্দমাক্ত জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উপরের কলসীর জল তলদেশস্থ ছিদ্র দিয়া তন্নিম্নস্থ কয়লার এবং তৎপরবর্তী বালির কলসী দিয়া চোঁয়াইয়া পরিষ্কৃত হইয়া সর্বনিম্নস্থ কলসীতে জমা হয়। এইভাবে চোঁয়াইবার সময় জল বায়ুর মধ্য দিয়া অক্সিজেন-সংস্পর্শে অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুপেয় হয়। মধ্যে মধ্যে বালি ও কয়লা বদলাইতে হয়।

প্রথম প্রথম ফিল্টারে চারি পাঁচ দিন জল দিয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং সে জল ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতে পরিশেষে ঐ ফিল্টারের জল ভাল হইতে থাকে। প্রথম চারি পাঁচ দিন জল ঠিক ভাল হয় না। ফিল্টার করিতে করিতে যখন বালির উপর একটা আঠার মত স্বচ্ছ ও পাতলা স্তর (পর্দা) পড়িয়া যায়, তখন জল অতিসুন্দর বিশুদ্ধ হয়। ফিল্টার ব্যবহারকালে এই স্তর কখনও হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই স্তরটি জলের মধ্যস্থিত জীবাণু-রোধক শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং, ফিল্টারের এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত জীবাণু-রোধক স্তরটির স্থায়িত্ব জলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জল যত বেশী অবিশুদ্ধ হয়, জীবাণু-রোধক স্তরের স্থায়িত্ব তত কম হইয়া থাকে। জল অস্বাভাবিকরূপে অবিশুদ্ধ হইলে জীবাণু-রোধক স্তর আট সপ্তাহের অধিক কাল কার্যক্ষম থাকে না। সুতরাং, তখন এই স্তর চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর নিম্নস্থিত বালি প্রখর রৌদ্রে বেশ করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুকাইয়া ও দোষ-বর্জিত করিয়া আবার কলসীর মধ্যে পাতিয়া দিতে হয়।

অনেকে তিনটি কলসীর পরিবর্তে একটি বড় মাটির বা কাঠের টব, বালি ও কয়লা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তাহার তলদেশে ছিদ্র করিয়া লন। ইহা দ্বারাও গার্হস্থ্য ফিল্টারের কার্য হয়। তবে, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবকালে এই ধরণের ফিল্টারের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ, রোগ-জীবাণু জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ছাঁকনির মধ্য দিয়া সেই জীবাণুর কিয়দংশ জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে। যে জল ছাঁকা যায়, তাহার মধ্যে রোগ-জীবাণু থাকিলে, ব্যাধি সংক্রমিত হয়। বার্কফেল্ড (Berkefeld) এবং পাস্তর চেম্বারল্যাণ্ড (Pasteur

Chamberland ) নামক দুই প্রকার ফিল্টার-বোতল এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ফিল্টারের মধ্য দিয়া যে জল পড়ে, সে জল বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। কিন্তু এ সকল ফিল্টার কিছু ব্যয়সাধ্য এবং প্রতি মাসেই পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

ছাঁকন মাত্রকেই মাসে মাসে পরিষ্কার করিতে হয়। ছাঁকনের মধ্যে অধিক ময়লা জমিলে সে ছাঁকনের দ্বারা জল মোটেই পরিষ্কৃত হয় না। বালি ও কাঁকরের ফিল্টার পরিষ্কার করা কঠিন নহে। বালি ও কাঁকর পোড়াইলে পুনরায় ব্যবহারের যোগ্য হয়।

জল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইলে, জলের মধ্যে ভাসমান কঠিন পদার্থ এবং দ্রবীভূত দূষিত সামগ্রী কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়া যায়। কয়লা, বালি, স্পঞ্জের ন্যায় সচ্ছিদ্র লৌহ ( Spongy Iron ), কয়লা ও জমাট বালি (Silicated Iron), চুম্বক-ধর্মাক্রান্ত লৌহ (Magnetic Iron) প্রভৃতি নানা সামগ্রী ছাঁকনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ গৃহস্থের গৃহে, রেলওয়ে ষ্টেসনে এবং মফঃস্বলের হাসপাতালে বালি ও কয়লাপূর্ণ মৃৎকলসীর ছাঁকনে জল ছাঁকা হইয়া থাকে। এই প্রকারের ছাঁকুনিতে জল হইতে রোগ-জীবাণু একেবারে দূর হয় না। সুতরাং, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবকালে এই প্রকারের ফিল্টারের উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না।

## রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশোধন।—

(১) **পার্মাংগানেট্ অভ্ পটাশ** ( Permanganate of Potash ) **দ্বারা জল বিশুদ্ধ করা**—পার্মাংগানেট্ অভ্ পটাশ এক

প্রকার গুঁড়াবৎ ডাক্তারি পদার্থ। এক প্রকার খনিজ পদার্থ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। কূপের জল দূষিত হইলে পার্মাংগানেট্ অভ্ পটাশ দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করা যায়। সাধারণত প্রত্যেক কূপে আধ ছটাক বা কিছু বেশী পরিমাণ লাগিতে পারে। একটি পাত্রে ইহা গুলিয়া কূপের জলে তাহা ঢালিয়া দিতে হয়। কূপে ঢালিবার সময় বেশ সতর্ক হওয়া উচিত—এই মিকৃশ্চার যেন কূপের গা বাহিয়া না পড়ে; কারণ, তাহাতে ঔষধের শক্তি কমিয়া যায়। পাত্রের তলায় যদি কিছু অদ্রবীভূত রহিয়া যায়, তাহাও পুনরায় গুলিয়া জলে ঢালিয়া দিতে হয়। এইরূপে সমস্ত পার্মাংগানেট্ অভ্ পটাশ নিঃশেষ হইলে জল একটু ওলট-পালট করিয়া দিতে হইবে। এমনভাবে ওলট-পালট করিতে হইবে, যেন নীচের কাদা উপরে না উঠে।

পাকা পুঁই শাকের বীজগুলি যেমন বেগুনে রঙের হয়, জলে গুলিলে পার্মাংগানেট্ অভ্ পটাশের রংও ঠিক সেইরূপ হয়। জল বিশোধনার্থ এই দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইলে, জল বেশ একটু বেগুনে রং হয়; খুব গাঢ় রং হইবার প্রয়োজন নাই। পার্মাংগানেট্ গুলিয়া দেওয়ার পর জল যদি হরিদ্রাভ হয়, তাহা হইলে উহা আরও দিতে হইবে।

(২) **পারক্লোরাইড অভ্ আয়রন** ( Perchloride of Iron ) জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়। পাঁচ সের জলে ২½ গ্রেন পরিমাণ পারক্লোরাইড দেওয়া উচিত।

(৩) **ক্লোরিন** ( Chlorine ) প্রয়োগে জল পরিষ্কার করা যায় —শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এই প্রথায় পানীয় জল বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক সময়ে ইংলণ্ডের লিংকন পল্লীর জলের কলে টাইফয়েডের জীবাণু অধিক মাত্রায় দেখা দেয়। হাউস্টন ( Houston )

নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই উপলক্ষে ক্লোরিন দ্বারা রোগ-জীবাণু নাশের ব্যবস্থা করেন। তারপর ক্লোরাইড অভ্ লাইম ( Chloride of Lime ) জলে দিয়া এবং ফিল্টারের মধ্যে ক্লোরাইড অভ্ লাইম ব্যবহার করিয়া, আমেরিকায় জল বিশুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হয়। জল পরিষ্কারের জন্য ক্লোরিনযুক্ত যে কয়টি সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা এই,—(১) হাইপোক্লোরাইট বা ব্লিচিং পাউডার আকারে। স্বাভাবিক তাপে চূণের সহিত ক্লোরিন মিশাইলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত হয়। (২) বাষ্পাকারে এবং (৩) ক্লোরামিন ( Chloramine ) রূপে। ক্লোরামিনের যথেষ্ট রোগ-জীবাণু নাশের ক্ষমতা আছে। অ্যামোনিয়া ও ক্লোরিনযুক্ত চূণের রাসায়নিক সংযোগে ক্লোরামিন প্রস্তুত হয়। কতটুকু জলে কি পরিমাণ ক্লোরিনের প্রয়োজন, জলের তাপ, জল-মধ্যস্থ দূষিত পদার্থের পরিমাণ, মিশ্রণপ্রণালী এবং জলের দূষিত অবস্থা দেখিয়া তাহা স্থির করিতে হয়।

ক্লোরিন দ্বারা জল বিশুদ্ধ করিতে ব্যয় খুব কম পড়ে। তাহা ছাড়া, ক্লোরিন দ্বারা পরিষ্কৃত জল সহসা দূষিত হয় না। তবে, কোন অবস্থাতেই ক্লোরিনের দ্বারা জল পরিষ্কার বিধিকে মুখ্য উপায়ের মধ্যে গণ্য করা উচিত নহে; কারণ, জলের রং এবং ঘোলাটে ভাব ক্লোরিনের দ্বারা দূর হয় না। ফিল্টার ( Filter ) বা ছাঁকন দ্বারা জল পরিষ্কার করিয়া লইবার পর তাহাতে ক্লোরিন সংযোগ করা উচিত। সম্ভবপর হইলে ছাঁকনের সঙ্গেও ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্লোরিনে জলের স্বাদ নষ্ট করে এবং বেশী পরিমাণ ক্লোরিন ব্যবহার করিলে জলে ক্লোরিনের গন্ধ হয়।

**কলিকাতার কলের জল**—কলিকাতা শহরে আমরা কলের যে জল পান করি, তাহা শহর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী ভাগীরথী-তীরস্থ পলতা নামক স্থানে বিশুদ্ধ হইবার পর কলিকাতায় আনিয়া টালার উচ্চ ট্যাঙ্কে পূর্ণ করা হয়। ভাগীরথীর জল দুই তিন দিন পলতায় ধরিয়া রাখা হয়। তার পর সেই জল বালি ও কাঁকরপূর্ণ ছাঁকনের ( Filter ) দ্বারা ছাঁকা হইয়া থাকে। ছাঁকনের মধ্যে জলপ্রবাহ প্রবেশ করিলে ভাসমান পদার্থসমূহ বালি ও কাঁকরে আটকাইয়া যায় এবং দূষিত জৈব পদার্থসমূহও কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হয়। সময় সময় 'ফিল্টার' বা ছাঁকনের সঙ্গে ক্লোরিনযুক্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পলতার ছাঁকনে জল পরিষ্কৃত করিবার জন্য ফিট্‌কিরি ( Alum ) ও শেওলা প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪) **চোলাইকরণ** ( Distillation )—জল চোলাই করিলে দুই একটি বায়বীয় পদার্থ ব্যতীত জলের আর সমস্ত দূষিত সামগ্রী দূরীভূত হয়। জল পরিষ্কার করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জল ফুরাইয়া গেলে জাহাজের নাবিকগণ এই উপায়ে সমুদ্রজল বিশুদ্ধ করিয়া লন। এডেন বন্দর হইতে জাহাজে যে জল সরবরাহ করা হয়, তাহা এই চোলাই করা জল। জল চোলাই করিলে জৈব, জান্তব, ক্ষার, লবণ ও রোগোৎপাদক জীবাণু—জলে যাহা কিছু বর্তমান থাকে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। তবে, চোলাই জলে বায়ুর অবিদ্যমানতা হেতু উহা কিঞ্চিৎ বিস্বাদ হয়। কিন্তু কয়েক বার জল 'ঢালা-উপুড়' করিলে সে বিস্বাদ দূর হইয়া থাকে।

**জল-সংগ্রহ ও জল-সঞ্চয়**—শহরে জল সরবরাহ করা একটি গুরুতর সমস্যা। যে সকল শহরে ব্যাপকভাবে জল ছাঁকিবার

ব্যবস্থা আছে, সেখানে নদী বা স্রোতস্বতী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ জলাধারে ( Reservoir ) অথবা ট্যাঙ্কে রাখিয়া দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যের কোনও জলাশয় হইতে যাহাতে জল না লওয়া হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। স্বল্প গভীর কূপ বা পুষ্করিণী হইতেও শহরের জল-সরবরাহের জন্য জল লইতে নাই ; কারণ, সে জলে দূষিত পদার্থ থাকে। অগভীর কূপের জলও নিরাপদ নহে।

ঝরণা, গভীর কূপ, পর্বতগাত্রস্থ জল, হ্রদ ও নদীর জল শহরে জল-সরবরাহের জন্য লওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় অবস্থার বিষয়ও এই সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হয়। শহরের জন্য যে জল সংগৃহীত হইবে, তাহাতে কোন দূষিত পদার্থ না থাকে, তাহা দেখা কর্তব্য। পরন্তু, সে জল কোমল ( Soft ) হওয়া আবশ্যক। শহর হইতে দূরে, দূষিত পদার্থহীন স্থানে সারি সারি গভীর কূপ খনন করিয়া, তাহা হইতে পাম্প দ্বারা জল-সরবরাহ করা যাইতে পারে। শহরে জল-সরবরাহের জন্য এইরূপ নানা ভাবে জল-সংগ্রহ করা হয়।

**জল-সংগ্রহ** ( Storage )—জল ছাঁকিয়া কুঁজা, কলসী বা অন্য কোন পাত্রে রাখিতে হয়। জলাধারের মুখ কখনও খুলিয়া রাখিতে নাই ; মুখ খুলিয়া রাখিলে জলের মধ্যে ধূলা, ময়লা, মাছি বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ পড়িতে পারে। জল পান করিবার সময় জল ঢালিয়া লওয়া ভিন্ন জলের মধ্যে কখনও পান-পাত্র ডুবাইতে নাই। জলাধার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক।

উচ্চ ভূমিতে চারিদিকে বাঁধ বাঁধিয়া জল রক্ষা করা হয়। বড় বড় শহরকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক অঞ্চলে জল-সরবরাহের জন্য 'রিজার্ভার' ( Reservoir ) নির্মাণ করিয়া তাহা হইতে জল-

সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল রিজার্ভারে যে জল ধরা হয়, লোহার নলের ( Pipe ) সাহায্যে সেই জল শহরের সর্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে। কলিকাতা শহরে ঐরূপ নলের সাহায্যে জল-সরবরাহ হইয়া থাকে।

**ব্যাধির বাহকরূপে দূষিত জল**—সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল দুর্লভ। তবে, রাসায়নিক পরীক্ষায় যে জল বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই জলই পান করা বিধেয়। দূষিত জল নানা ব্যাধির বাহক। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময়, রক্তাতিসার প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্র-সংক্রান্ত ব্যাধি সচরাচর জলের দোষেই উৎপন্ন হয়। সময় সময় জলের দোষে কৃমি ও অমিবা প্রভৃতি পরাঙ্গপুষ্ট প্রাণী ( parasites ) দেহের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। মানবদেহে যতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার অধিকাংশের জীবাণু জলের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং, জল যাহাতে দূষিত না হয়, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

জলের অভাবেও নানা বিপদ্ ঘটে। পল্লী অঞ্চলে প্রায়ই জলকষ্টের কথা শুনা যায়। জলকষ্টের সময় জলের ভালমন্দ বিচার থাকে না, জল হইলেই হইল। সেইজন্য পল্লীতে জলকষ্ট উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহামারীও অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয়। কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি তখন সংক্রামক হইয়া উঠে। জলের অভাবে দূষিতজল-পানের জন্যই এ সকল ঘটিয়া থাকে। জলকষ্ট হইলে ফসল শুকাইয়া নষ্ট হয়, খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ হয়; এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য মোটেই মিলে না। তখন অন্য স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হইলেও স্থানীয় ময়লা, ঘোলা ও অপরিষ্কৃত জলই পান করিতে হয়। ফলে, নানা সংক্রামক ব্যাধিতে প্রতিবৎসর বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গৃহে জল-বিশোধনের সহজ উপায় সম্বন্ধে সকল কথাই বলা হইয়াছে। তবে, আমাদের এই বাংলা দেশে দরিদ্র সাধারণের পক্ষে জল-বিশোধনের সহজ উপায় এই যে, সংগৃহীত জল ৩।৪ ঘণ্টা কোন পাত্রে স্থিরভাবে রাখিয়া থিতাইয়া লইয়া অন্য একটি পাত্রে সাবধানতার সহিত উপরের জল ঢালিয়া লইবে এবং উহা অন্তত পনের মিনিটকাল ভালরূপে ফুটাইয়া লইবে। পরে ঐ ফুটান জলে একটু ফিট্‌কিরি দিলে, সেই জলের নীচে তলানি জমিবে। এই অবস্থায় উপরের জল একটি পরিষ্কৃত পাত্রে ঢালিয়া উহার মুখে পরিষ্কার সাদা ন্যাকড়া দিয়া কিছুকাল মুক্ত বাতাসে রাখিয়া দিবে। জল সিদ্ধ করিলে উহার স্বাদ অন্যরূপ হয়। সুতরাং, স্বাদ ঠিক করিবার জন্য সেই জল অন্য একটি পরিষ্কৃত মাটির কলসীতে কয়েকবার ঢালা-উপুড় করিয়া, উহাতে সামান্য কর্পূর দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে। তাহা হইলেই সেই জল উত্তম পানীয়-রূপে পরিণত হইবে। এই প্রক্রিয়াটিই জল-বিশোধনের পক্ষে সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়।

## (ঘ) গৃহ-সজ্জা ইত্যাদি

**গৃহের আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামাদি**—আমরা বাড়ীর বিভিন্ন ঘরে বিবিধ আসবাব ও সরঞ্জাম ব্যবহার করি। ইহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আর কতকগুলি গৃহ-সজ্জা হিসাবে সংরক্ষিত হয়। অনেকের বাড়ীতে সাধারণত বাহিরের বসিবার ঘর, ছেলেদের পড়িবার ঘর, শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর, আঁতুড়-ঘর বা রোগীর ঘর থাকে। ইহাদের প্রত্যেক ঘরেই প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জামাদি ব্যতীত অতিরিক্ত আসবাবাদি রক্ষা করা উচিত নহে।

আমরা বাহিরের ঘরে সাধারণত চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, কাচের আলমারি প্রভৃতি এবং দেওয়ালে বিবিধ ছবি ব্যবহার করিয়া থাকি। (যাহাতে সর্বদা সোজাভাবে বসিতে পারা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া) চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে সুসজ্জিত অবস্থায় রাখা উচিত। বাহিরের ঘরেই ধূলা, বালি প্রভৃতি বেশী প্রবেশ করে। ছবি, কার্পেট, পর্দা বা অযথা আসবাবপত্রের বাহুল্য থাকিলে ঘরে ধূলা ময়লা বেশী জমে। এতদ্ব্যতীত, ঘরের কোণে এবং ছবি, আলমারি প্রভৃতির পশ্চাতে কালি, ঝুল, মাকড়সার জাল প্রভৃতিতে আটকান ধূলা ইত্যাদি জমিয়া ঘরটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এজন্য নিয়মিতভাবে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া আসবাবাদি সর্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হয়।

**পড়িবার ঘর**—ছেলে-মেয়েদের পড়িবার ঘরে তাহারা যাহাতে সর্বদা সোজাভাবে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে এই হেতু বসিবার জন্য চেয়ার বা টুল ও তাহার সম্মুখে উপযুক্ত পরিমাণ উঁচু টেবিল বা কোলের দিকে ঢালু ডেস্ক রাখা প্রয়োজন। পুস্তকাদি রাখিবার জন্য কাচের আলমারি রাখিতে হয়। শিক্ষাপ্রদ চার্ট, ছবি, ম্যাপ ইত্যাদি দেওয়ালে রাখিতে পারা যায়; তবে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অযথা অতিরিক্ত আসবাব না রাখা হয় এবং গৃহমধ্যস্থ যাবতীয় আসবাবপত্র সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকে।

**শয়ন-ঘর**—শয়ন-ঘরে অতিরিক্ত আসবাবপত্র রাখিলে ভালরূপ বায়ু-সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে। অবশ্য-ব্যবহার্য খাট, চৌকি, তক্তাপোষ এবং নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে ছোট টেবিল, টুল ব্যতীত অযথা অতিরিক্ত আসবাব কদাচ রাখিতে নাই। দেওয়ালে ২।৪ খানা ছবি রাখাও চলে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় ঘরের মেঝে মুছিয়া

পরিষ্কার করিবে। আসবাবপত্র ঝাড়িয়া পরিষ্কার রাখিবে। দেওয়ালের ছবি, ঘড়ি ইত্যাদির আশ-পাশ ও পশ্চাতে কালি-ঝুল ধূলা-বালি আটকাইলে তাহার সহিত ব্যাধির জীবাণু সংস্পৃষ্ট থাকিতে পারে; এজন্য ঝাড়ন দিয়া উহা সাবধানতার সহিত ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে।

**রান্না-ঘর**—রন্ধনকার্যে ব্যবহার্য তৈজসাদি ব্যতীত অন্য কোন আসবাব রাখিতে নাই। তবে, প্রয়োজন-বোধে ছোট টুল বসিবার জন্য রাখা চলে। রন্ধনের পর তৈজসাদি উচ্চে বাঁশের মাচা বা তাকে রাখিয়া দিবে। জালযুক্ত আলমারি রাখিবে। কোন দ্রব্য মাটিতে কদাচ রাখিবে না।

রান্না-ঘরে ধোঁয়ার উপদ্রব নিবারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ধোঁয়ার জন্যই রান্না-ঘরের ভিতরের ছাদ, দেওয়াল এবং আসবাব-পত্র ও তৈজসাদি কালি-ঝুলে মলিন হয়, খাদ্যদ্রব্যেও ঐ কালি-ঝুল পড়িতে পারে। এমন কি বাটীর অপরাপর গৃহাদিও অল্পবিস্তর ঐ ধোঁয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গৃহমধ্যস্থ আসবাবপত্র, কাপড়-জামা প্রভৃতিও ধোঁয়ায় কালিময় হইয়া থাকে। বাড়ীর মেয়েদিগকে রান্না-ঘরেই সাধারণত অধিক সময় কাটাইতে হয়। সুতরাং, সেখানে অতিরিক্ত ধোঁয়া হইলে, তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। বর্ত্তমানে শহরে সাধারণত কয়লার দ্বারাই রন্ধন-কার্য চলিতেছে। যে বাড়ীতে মাত্র একটি পরিবার বাস করে, সেখানে রান্না-ঘরের অবস্থান ও প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি বিশেষরূপ যত্ন লইলে এই ধোঁয়া নিবারণ করা অনেকটা সম্ভবপর হইতে পারে। বাড়ীর অপর ঘরগুলি হইতে দূরে রান্না-ঘরের ব্যবস্থা করিতে হয়। রান্না-ঘরের ছাদের সঙ্গে চারিদিকে ঘুরাইয়া একহাত প্রস্থ জাল বা ঝাঁঝরি দিয়া দিলে কিংবা ছাদের উপরে

ঘুলঘুলি বা চিমনি তৈয়ার করিয়া দিলে, ধোঁয়া সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে। কলিকাতা মহানগরীতে এই ধোঁয়ার সমস্যা বড়ই
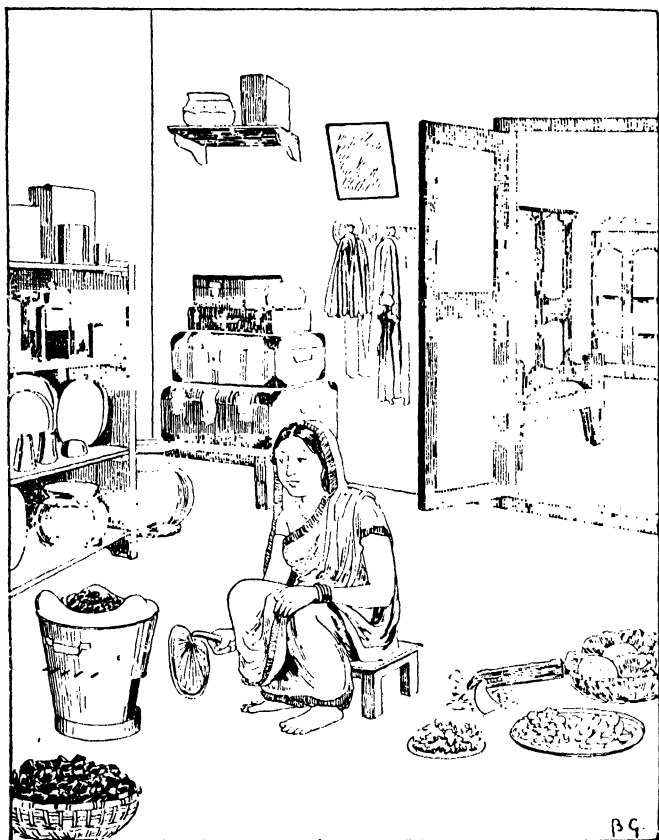
গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে উদ্ভাবিত "ধূম-নিবারণ উপায়"

কলিকাতা করপোরেশন ও বঙ্গীয় সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছে এবং সর্বত্র ধূম-নিবারণকল্পে ইহার প্রচার কার্য চলিতেছে।

এই প্রথাতে কোক-কয়লাই জ্বালানিরূপে উনানে ব্যবহার করা চলে; তবে, কেরোসিন তেল, ঘুঁটে, ন্যাকড়া, কাঁচা কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে উনান জ্বালাইবার প্রচলিত প্রথার পরিবর্তে কাঠ-কয়লার দ্বারা উনান জ্বালান হইয়া থাকে এবং ইহাতে ধোঁয়ার উপদ্রব কিছুমাত্র হয় না।

কোক-কয়লায় রান্না করিতে হইলে ধূম-নিবারণের জন্য কাঠ-কয়লা দিয়া উনান জ্বালানই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এক ছটাক পরিমাণ কাঠ-কয়লা উনানের মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া, একখানিতে আগুন ধরাইয়া তিন চারি মিনিট পাখা দিয়া হাওয়া দিলে কয়লা জ্বলিয়া উঠিবে। তখন তাহার উপর আস্তে আস্তে কয়লা বা কোক দিলে দশ মিনিটের মধ্যেই উনান জ্বলিবে, অথচ ধোঁয়া হইবে না।

এই প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় যে সমস্ত গৃহে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তথায় ধোঁয়ার উপদ্রব নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে ঘরে কালি জমে না; জামা-কাপড়, ঘর-দরজা, আসবাবাদি কালিময় হয় না।

সপ্তাহে অন্তত একদিন রান্না-ঘরের ঝুল ঝাড়িয়া ফেলা উচিত। রান্না-ঘরে থালা, বাসন-পত্র প্রভৃতি রাখিবার জন্য আলমারি বা তাকের ব্যবস্থা করা ভাল। ব্যবহারান্তে থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিয়া, ভালভাবে মুছিয়া আলমারিতে বা তাকের উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়। রান্না-ঘরের মেঝে ধুইয়া মুছিয়া দিতে হয়।

**ভাণ্ডার-গৃহ বা ভাঁড়ার-ঘর**—আমাদের প্রয়োজনীয় চাউল, ডাল, ঘৃত, মসলা, আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আমরা ভাঁড়ার-ঘরে রাখিয়া

থাকি। ভাঁড়ার-ঘরে যাহাতে ভালরূপ আলো বাতাস খেলিতে পারে এজন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তৈজসাদি সুসজ্জিতভাবে রাখিতে হয়। বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন পাত্রে রাখিবে। পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। কোন দ্রব্য কদাপি মাটিতে রাখিবে না।

**রোগীর ঘর**—রোগীর ঘরে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আসবাব ব্যতীত কখনও অতিরিক্ত কোন দ্রব্য বা আসবাবাদি রাখিতে নাই। রোগীর কাপড়-চোপড়, খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধাদি রাখিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিনটি আলমারি রাখিবে। রোগীর ঘরে পর্দা, কার্পেট, ছবি প্রভৃতি রাখিতে নাই। শুশ্রূষাকারীদের বসিবার জন্য টুল বা চেয়ার রাখা চলিতে পারে।

**গৃহের আসবাবপত্র, তৈজসাদি এবং সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মেরামতাদি**—গৃহে ব্যবহার্য আসবাবপত্রের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। কোনও আসবাব ভাঙ্গিলে বা নষ্ট হইলে অবিলম্বে উহার মেরামতের ব্যবস্থা করিবে। প্রত্যেক ঘরে আসবাবপত্র প্রত্যহই ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিবে। নিত্য-প্রয়োজনীয় এবং নিত্য-ব্যবহার্য আসবাব, সরঞ্জামাদি ব্যতীত অতিরিক্ত আসবাবাদি কোন একটি নির্দিষ্ট গুদাম ঘরে রাখিয়া দিবে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে বার্নিশ দিয়া লইবে। তাহাতে ঐগুলি অধিক টেকসই হইবে, অধিক দিন স্থায়ী হইবে। আলমারি বা দেরাজ প্রভৃতির মধ্যস্থ পুস্তকাদি মধ্যে মধ্যে ঝাড়িয়া রৌদ্র ও বাতাসে দিবে এবং পুনরায় যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবে। ইহাতে উই, ইন্দুর ও অন্যবিধ পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। আসবাবপত্র সময়ে মেরামত করিলে অল্প ব্যয়েই মেরামত করা চলিবে।

**গৃহের রোগ-জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ অপসারণ**—প্রত্যহ ঘরের আসবাব, সরঞ্জাম ও দরজা-জানালা প্রভৃতির ধূলা মুছিয়া পরিষ্কার করিবে। ঘর, দালান প্রভৃতির মেঝে নিকাইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিবে। ঘরের মেঝেতে ধূলা বেশী থাকিলে প্রথমে জল ছিটাইয়া মুছিয়া দিবে এবং পাকা-ঘরে ফিনাইল-জলে মেঝে মুছিয়া ধুইয়া দিবে। শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর প্রভৃতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঝাঁটা, ঝাড়ন, ন্যাতা প্রভৃতি রাখা একান্ত কর্তব্য। ঝাঁটা, ঝাড়ন, ন্যাতা প্রভৃতি প্রত্যহ ভাল জলে ধুইবে। ঝাড়ন, ন্যাতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে সোডাজলে পৃথক্ ভাবে ফুটাইয়া লইবে।

ঘরে ব্যবহৃত পাপোষ, সতরঞ্চি ঘরের বাহিরে লইয়া প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া ঝাড়িয়া লইবে। সপ্তাহে অন্তত একদিন ঘরের ঝুল, কালি, মাকড়সার জাল ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবে। সকল ঘরের সমস্ত জিনিস সরাইয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া দিবে। ইহাতে মশা, মাকড়সা প্রভৃতির উপদ্রব কমিবে। মধ্যে মধ্যে ঘরে চূণকাম করাইয়া লইবে। ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে বা সিঁড়িতে কখনও থুথু, গয়েরাদি ফেলিবে না।

পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদ প্রত্যহ উন্মুক্ত বাতাসে ও প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া ঝাড়িয়া লইবে। প্রখর রৌদ্র এবং উন্মুক্ত বায়ু রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে; নিত্য-ব্যবহার্য জামা-কাপড় খোলা বাতাসে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। শীতকালে শাল, আলোয়ান, পশমী-রেশমী-বস্ত্রাদি সমস্তই মধ্যে মধ্যে, সম্ভব হইলে প্রত্যহ, কিছুক্ষণ রৌদ্রে দিয়া ব্রাশ ( Brush ) দ্বারা ঝাড়িয়া রাখিবে। লেপ, তোষক, বালিশ প্রভৃতি শয্যাভরণ রীতিমত রৌদ্রে দেওয়া প্রয়োজন। মাদুর, সতরঞ্চি, খাট, চৌকি, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয্যাদ্রব্য মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া

রৌদ্রে দিবে; ইহাতে ধূলা, ময়লা, রোগ-জীবাণু, ছারপোকা প্রভৃতি বিনষ্ট হইবে।

## (৬) জল-নিঃসরণ-পথ ও আবর্জনা প্রভৃতি

**শুষ্ক আবর্জনা**—বসত-বাটীর ঘরগুলি, উঠান ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার করিলে ধূলা, বালি, কাগজের টুকরা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ঘরের ঝুল, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ডিমের খোলা, খড়-কুটা, পাতা প্রভৃতি দূষিত পদার্থ প্রতিদিনই বাহির হয়। আবার, ঘরধোয়া জল, কাপড়কাচা জল, বাসনমাজা জল, স্নানের জল, ভাতের ফেন, ব্যঞ্জনের ঝোল, মূত্রাদি দূষিত পদার্থও অপরিষ্কার জলরূপে নিয়ত নির্গত হইয়া থাকে। পায়খানার মল-মূত্র, গো-শালার গোবর, গো-মূত্র, খইল-মাখান বিচালি, পাখীর বিষ্ঠা প্রভৃতি আরও কতকগুলি দূষিত পদার্থ বসত-বাটীর নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দূষিত পদার্থকেই আবর্জনা বলে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত আবর্জনা দূর করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অনেকে শুষ্ক আবর্জনা বাড়ীর পার্শ্বে জমা করিয়া রাখে এবং জলের সহিত মিশ্রিত তরল আবর্জনাও নিকটবর্তী কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে দেয়। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা দূরের কথা, বরং ভয়ানক স্বাস্থ্যহানিই ঘটিয়া থাকে। আবর্জনা পচিয়া বিষম দুর্গন্ধ উঠিয়া বায়ু দূষিত করে এবং উহাতে মাছি বসিয়া উহার বিষ তাহার পা ও মুখ দিয়া চারিদিকে ছড়ায়। এমন কি, আমাদের খাদ্যের সহিত ঐ বিষ মিশ্রিত হয়। এই কারণে আমরা অবিলম্বে ওলাউঠা, বসন্ত, আন্ত্রিক-জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাই। অতএব, আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস

করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই। আবর্জনাগুলি বাসস্থান হইতে বহুদূরে রৌদ্রে শুকাইয়া প্রতিদিনই পোড়াইয়া ফেলিলে উহার দোষ নষ্ট হয়। বর্ষাকালে আগুনে পোড়ান অসুবিধা হইলে, দূরবর্ত্তী কোন শুষ্ক স্থানে গর্ত্ত করিয়া আবর্জনা পুঁতিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিবে। যে স্থান নীচু এবং যেখানে সহজেই জল জমে, তথায় উহা পুঁতিবে না। গোবরাদি ক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে; সেজন্য উহা দূরে কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্তরূপে পুঁতিয়া রাখিলেও ক্ষতি নাই।

দূষিত জলের সহিত যে সকল আবর্জনা নির্গত হয়, তাহা নর্দমা বা নালা দিয়া খাল কিংবা নদীতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। সেরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইলে, লোকালয় হইতে দূরে গর্ত্ত মধ্যে উহা সঞ্চিত করিয়া মধ্যে মধ্যে মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হয়।

**শহরে ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা**—বাড়ীর ময়লা যখন নর্দমার শেষ সীমায় যাইয়া জমা হয়, তখন সে ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্দ্ধারণ করা এক গুরুতর সমস্যা। নিম্নে কয়েকটি পন্থার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে :—

(১) ময়লাগুলি স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। তবে, যে নদীর তীরে নগর-নগরী বা পল্লী অবস্থিত এবং যে স্থানের সাধারণ পানীয় জল উক্ত নদী হইতে সংগৃহীত হয়, সে ক্ষেত্রে এই পন্থা কখনই অবলম্বন করিবে না।

(২) ময়লাগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলিতে পারে। কলিকাতার ন্যায় সুবৃহৎ নগরীর ময়লা ও আবর্জনা যদি বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে জোয়ারের সময় সেই ময়লা হুগলী নদীতে আসিয়া, এমন কি হুগলী শহর পর্যন্ত, গঙ্গার জল কলুষিত করিতে পারে।

বোম্বাই শহরে জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল শহরের নিকটবর্তী হয় না। এ প্রকার পন্থা ঐ শহরের সম্পর্কেই সম্ভব হইতে পারে।

(৩) শুষ্ক ও তরল পদার্থে পরিণত করিয়া; যথা—(ক) একস্থানে স্থিতি দ্বারা, এবং (খ) নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত করিয়া দিয়া।

(৪) নানা প্রকারের ছিদ্র-সমন্বিত অথবা বালিমাটিযুক্ত স্থানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইয়া জৈব পদার্থ এবং অপকারী কীটাণু ছাঁকিয়া ফেলিয়া ময়লাদি অপসৃত করা যায়।

(৫) যে জমিতে ব্যাপকভাবে কৃষি হইতে পারে না, সেই জমিতে ময়লা নিক্ষেপ করা এবং তদুপরি কৃষিকার্য সম্পাদন করা ( Broad Irrigation System )। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে স্থান অপ্রতুল নহে, সেখানে এই পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

(৬) বায়বীয় ( aerobic ) ও অবায়বীয় ( anaerobic ) কীটাণু কার্যকরী করিয়া ( biological treatment ) নিরাপদে জলীয় পদার্থে পরিণত করিয়া জলের সহিত সাররূপে জমিতে ব্যবহার করা বা বিশোধক দ্রব্য মিশাইয়া নদী বা সাগরের জলে প্রক্ষেপ করা।

**পল্লীতে ও শহরে জল-নিঃসরণ-পথ কিরূপে দোষমুক্ত ও পরিষ্কৃত রাখা যায়—**বৃষ্টির পরে কোন কোন বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে ও উঠানে জল জমিয়া থাকে; হাত-পা ধোয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা প্রভৃতি কার্যের পরেও কতকটা জল বাড়ীর নানাস্থানে আটকাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? প্রথমত, বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব ও উঠান ঢালু ও উঁচু না হইলে জল জমিয়া থাকে; দ্বিতীয়ত, বাড়ী হইতে জল-নির্গমের কোন পথ না থাকিলে, সঞ্চিত জল সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সেই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মাটি

খুঁড়িয়া নালা কাটিতে হয়। উহাকে চলতি কথায় নর্দমা এবং ইংরাজীতে 'ড্রেন্' বলা হয়।

আমাদের দেশে কাঁচা ও পাকা দুই রকম নর্দমাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত পল্লীগ্রামে কাঁচা এবং শহরে পাকা নর্দমা। কাঁচা নর্দমার ভিতর দিয়া জল চোয়াইয়া মাটিতে বসিয়া যায়। সেই দূষিত জল নিকটের কোন জলাশয়ে পড়িয়া উহার জলও দূষিত করিতে পারে; অনেক সময় দুই পাড় ভাঙ্গিয়া নর্দমার ভিতরে মাটি পড়িয়া জল-চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়; তখন আবার উহা পরিষ্কার করাও কষ্টসাধ্য। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতির সাহায্যে পাকা গাঁথুনি করিয়া যে নর্দমা প্রস্তুত করা হয়, তাহাই পাকা নর্দমা। এই কারণে উহার ভিতর দিয়া মাটিতে জল বসে না, সহজে উহার পাড়ও ভাঙ্গে না এবং উহা পরিষ্কার করিতেও অসুবিধা হয় না। পাকা নর্দমাই ভাল। কলিকাতার মত খুব বড় বড় শহরে মাটির ভিতর দিয়া বড় বড় পাকা নর্দমা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার সহিত প্রত্যেক বাড়ীর শাখা-নর্দমাগুলির সংযোগ আছে (Flush system)। সেইজন্য বাড়ীর ময়লা জলাদি শীঘ্রই রাস্তার বড় নর্দমায় যাইয়া পড়ে এবং ক্রমে শহরের বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপ ব্যবস্থা শহরবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে পরম হিতকর। অনাবৃত বা খোলা নর্দমা অপেক্ষা এইরূপ্ আবৃত বা ঢাকা নর্দমাই ভাল।

নর্দমা প্রস্তুত করিবার সময়ে উহা মুখের দিকে ক্রমে এরূপ গড়ানে বা ঢালু করিতে হইবে যে, উহাতে জল পড়িবামাত্রই বাহির হইয়া যাইতে পারে। নর্দমার মুখ খাল কিংবা নদীতে যাইয়া মিশিলেই ভাল হয়; তবে, এরূপ সম্ভব না হইলে, উহা লোকালয় হইতে দূরে কোন বিল পর্যন্ত ক্রমশ ঢালু করিয়া লইয়া যাইতে হয়। পুকুর কিংবা কূপের নিকট দিয়া নর্দমা তৈয়ার করিতে নাই; কারণ,

নর্দমার জল মাটির ভিতর দিয়া চোয়াইয়া, সেই পুকুর কিংবা কূপের জলের সহিত মিশিতে পারে। এই নিমিত্ত ঐ সকল জলাশয়ের জল পানের অযোগ্য হয়। রান্না-ঘর, গোয়াল-ঘর, পায়খানা ও আঁস্তাকুড়ের সহিত নর্দমার যোগ রাখা উচিত।

কাঁচা নর্দমায় ঘাস, আগাছা প্রভৃতি জন্মিতে দিবে না, কিংবা কোনরূপ জঞ্জাল ফেলিবে না। মধ্যে মধ্যে নর্দমার তলানি বা পচা মাটি তুলিয়া ফেলিলে, জল-চলাচলের পথ বেশ পরিষ্কার থাকে এবং নর্দমার দুর্গন্ধও কতকটা কম হয়। নর্দমার জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে কিংবা পচিলে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়; তাহাতে মশা জন্মে এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যারাম দেখা দেয়। মধ্যে মধ্যে নর্দমায় চূণ, ফিনাইল প্রভৃতি দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে মশার উপদ্রব কমে।

পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীতে নর্দমা না থাকায় ময়লা জলাদি গড়াইয়া গিয়া পানীয় জলের পুকুরেই পড়ে। ইহা বড়ই কদর্য ও অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক বাড়ীতে নর্দমা রাখা উচিত।

**পল্লীতে মল-অপসারণের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা**—জীবজন্তু ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ মল-মূত্ররূপে ত্যাগ করিয়া থাকে। সেই মল-মূত্রের সংস্পর্শে বাসস্থান যতটা দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হয়, ততটা আর কিছুতেই হয় না। মল-মূত্র অতীব দুর্গন্ধময় ও অনিষ্টকর পদার্থ। এজন্য পরিত্যক্ত মল-মূত্র স্পর্শ করিলে লোকে স্নান করিয়া শুচি হয়। ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রশংসনীয় রীতি। মল-মূত্রত্যাগ ও দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কি প্রকার ব্যবস্থা করা সঙ্গত, তাহাই প্রথম বলিতেছি।

আমরা সাধারণত পায়খানায় মলত্যাগ করি এবং আমাদের মূত্রত্যাগেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। পল্লীগ্রামে কেহ কেহ

পায়খানার পরিবর্তে বাগান অথবা মাঠে মলত্যাগ করে। তাহারা জানে না যে, পরিত্যক্ত মল-মূত্র হইতে কলেরা, টাইফয়েড্, হুক্ওয়ার্ম প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। অতএব, ঐরূপভাবে মলত্যাগ করা যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পায়খানায় মলত্যাগ করাই সঙ্গত।

**পায়খানা**—সাধারণত বসত-বাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর ও পানীয় জলের কূপ কিংবা পুকুর হইতে ৪০।৫০ হাত দূরে পায়খানা নির্মাণ করিতে হয়। তথায় শিশু ও বিশেষ অসুস্থ লোক ব্যতীত বাড়ীর অপর সকলেরই মলত্যাগ করা উচিত। পায়খানা যত দূরে হয়, ততই ভাল।

শহরে পাকা পায়খানার ব্যবস্থা আছে। পাকা পায়খানাতে একটি পাত্র থাকে, তাহার মধ্যে মলত্যাগ করিতে হয়। পায়খানায় বসিবার স্থানের সম্মুখ দিয়া মূত্রত্যাগ ও শৌচের জন্য একটি ছোট নালা থাকে। সুতরাং, মূত্র কিংবা শৌচের জল সেই পাত্রের মধ্যে না পড়িয়া উক্ত নালা দিয়া বাড়ীর প্রধান নর্দমায় গিয়া পড়ে। প্রতিদিন পায়খানার মল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা থাকে। দুর্গন্ধ-নিবারণের জন্য মধ্যে মধ্যে পায়খানার ভিতরে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয় এবং ফিনাইল দিয়া প্রতিদিন ধোয়া হয়; এ ব্যবস্থা ভালই।

পল্লীগ্রামে পাকা পায়খানা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ বাড়ীতেই কাঁচা পায়খানা। মাটিতে দেড় কিংবা দুই হাত পরিমাণ গভীর ও অল্পপরিসর একটি গর্ত খুঁড়িতে হয়; তাহার একটু উপরে কাঠ অথবা বাঁশ দিয়া বসিবার স্থান তৈয়ারী করা হয়। পায়খানার চারিদিক বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে পায়খানার মধ্যে বৃষ্টির জল না পড়ে, সেইজন্য উহার উপরে ছোট চালা বাঁধিয়া

দেওয়া হয়। সেই চালার মধ্যে বসিয়া গর্তের ভিতরে মলত্যাগ করিবে। মলের দুর্গন্ধ-নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যেক বার মলত্যাগের পরই উহার উপরে ছাই অথবা শুকনা মাটি ছড়াইয়া দিবে। মলত্যাগ ও শৌচকার্যের জন্য পায়খানার গর্তের পাশ দিয়াই ছোট নালা রাখিবে, তাহা হইলে মূত্র ও জল সেই মলের সহিত মিশিয়া ক্রমশ পচিবে না এবং দুর্গন্ধ বাড়াইতে পারিবে না। পায়খানার মল-মূত্রাদি বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাহাতে কখন কোনরূপে কূপ বা পুকুরের জলের সহিত মিশিতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। একটি পায়খানা মলে ভরাট হইয়া গেলে, তাহা মাটি দিয়া ভালরূপে চাপা দিবে এবং অন্য স্থানে তদনুরূপ আর একটি পায়খানা তৈয়ার করিবে।
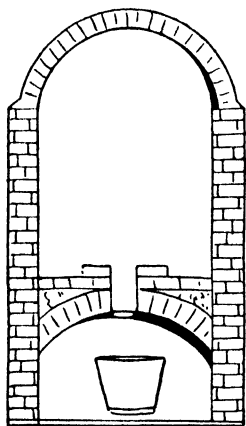
খাটা পায়খানা

মল-বিশোধক পায়খানা আজকাল নলকূপের মতই জনপ্রিয় হইতেছে। প্রতি গ্রামে মল-শোধক পায়খানার প্রচলন আইনত হওয়া দরকার। প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ম-কর্তাদের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী খুব সোজা এবং বৈজ্ঞানিক রীতির উপর ইহার কার্যকারিতা নির্ভর করে। মল ও জল একটি বায়ুহীন অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেখানে পর্যাপ্ত জল থাকার বন্দোবস্ত আছে। জলের উপরিভাগের একফুট নিম্নদেশে সাইফোন নল ( Syphon tube ) পাশাপাশি দুইটি বায়ুহীন জলপূর্ণ প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত আছে। ইহাতে প্রথম

প্রকোষ্ঠের ভাসমান মল দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, অথচ দ্রবণীয় অংশ জলের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় উহাকে গন্ধ-বর্জিত এবং অনেকটা নির্দোষ অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে বা ড্রেনের জলের সহিত মিশাইয়া খাল বা নদীতেও উহা বহাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে চূণ বা ব্লিচিং পাউডার মিশাইয়াও থাকেন।
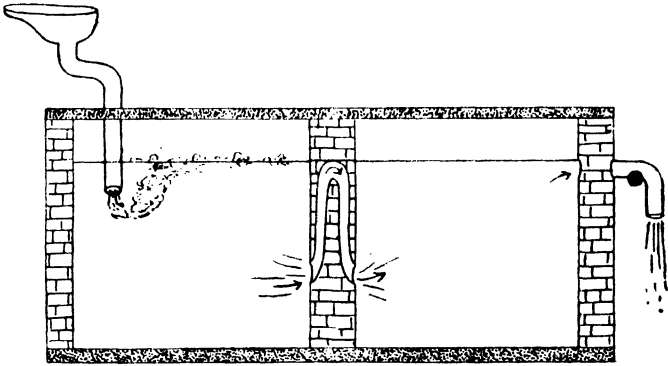
মল-বিশোধক পায়খানা

ইহাতে বিশোধন কার্য সম্পূর্ণ হয় ও জলীয় পদার্থ নিরাপদ্‌ভাবে জলাশয়েও মিশিতে পারে।

অনেকে দুইটির-স্থানে তিন বা চারিটি পর্যন্ত প্রকোষ্ঠও প্রস্তুত করিয়া মলশোধক পায়খানাকে আরও কার্যকরী করিয়া থাকেন।

এইপ্রকার প্রথার মূলকথা এই যে, ময়লাতে যে জীবাণু থাকে তাহার মধ্যে অনেকগুলি অ-বায়বীয় ( Anaerobic ); ইহারা বায়ুর অভাবে অন্ধকারে মলকে দ্রবণীয় করিয়া একেবারে যবক্ষারজানযুক্ত

জৈব ( Organic ) সামগ্রীকে অ-জৈব ( Inorganic ) নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত করিয়া জমির সাররূপে পর্যবসিত করিয়া দেয়।

**মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা**।—মূত্রও মলের ন্যায় অত্যন্ত দূষিত পদার্থ। মূত্রত্যাগের জন্য শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, কূপ বা পুকুর হইতে অনেকটা দূরে নর্দমার পার্শ্বে একটা স্থান নির্দিষ্ট করিবে। বাড়ীর সকলেই যাহাতে তথায় মূত্রত্যাগ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। মূত্র হইতে একপ্রকার বিষম দুর্গন্ধ বাহির হয়। তোমরা জান, রৌদ্র ও বাতাসে দুর্গন্ধ নষ্ট করে। অতএব, যে স্থানে প্রখর রৌদ্র লাগে ও সর্বদা বাতাস খেলে, সেখানে মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা করিবে। তথায় মধ্যে মধ্যে ফিনাইল, শুক্‌না মাটি ও ছাই ছড়াইয়া দিলে দুর্গন্ধ কমিবে। বাড়ীর যেখানে-সেখানে মূত্রত্যাগ করা বড়ই দূষণীয়।

**আঙ্গিনা** বা **উঠান** সব সময়ের জন্য পরিষ্কৃত রাখা প্রয়োজন। তথায় কখনও আবর্জনাদি জমা করিয়া রাখিবে না। উহা এরূপভাবে ঢালু রাখিবে যে, জল পড়িলেই তাহা অনায়াসে নর্দমায় চলিয়া যাইতে পারে। সকালে ও বিকালে ঝাঁটা দিয়া উঠান পরিষ্কার করিবে। পাকা উঠান হইলে ভাল জল দিয়া ধুইয়া দিবে এবং কাঁচা উঠান হইলে নিকাইয়া দিবে। উহার আশে-পাশে আ-গাছা, লতা, গুল্ম কিংবা বড় বড় ঘাস জন্মিতে দিবে না; লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতির গাছ জন্মাইয়া সূর্যালোক ও বায়ু-প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটাইবে না। ঐরূপ জঙ্গলা উঠানে সাপ, বৃশ্চিক প্রভৃতির উপদ্রব হওয়া অসম্ভব নয়।

বাড়ীর ভিতরের ও পার্শ্বের চলাচলের পথ সম্বন্ধেও ঐ প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে পথ পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং বাড়ী অস্বাস্থ্যকর হইবে না।

চতুর্দিকস্থ স্থান অস্বাস্থ্যকর হইলে বসত-বাটীও যে অস্বাস্থ্যকর এবং বাসের অযোগ্য হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এ-বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হইবে। বাড়ীতে নর্দমা রাখিলে দূষিত জলাদি তথায় সঞ্চিত না হইয়া বড় নর্দমা, খাল বা নদীতে যাইয়া পড়িবে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# গৃহে বস্ত্রাদি ধৌতকরণ-কার্য

স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতাও একান্ত প্রয়োজন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। বস্ত্রাদি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে শরীরে ময়লা লাগিতে পারে না; পরন্তু, মলিন বস্ত্রাদির ময়লা গায়ে লাগিলে বহু রোগ জন্মে। আমাদের দেশে শীতের চেয়ে গ্রীষ্মই বেশী। এজন্য, সামান্য পরিশ্রম করিলেই শরীর হইতে ঘাম বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে পরিশ্রম না করিলেও অবিরত ঘাম নির্গত হয়। ঘামের সহিত যে দূষিত পদার্থ বাহির হয়, তাহা তোমরা জান। উহা আমাদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদিতে লাগিয়া খুব দুর্গন্ধ জন্মায়। ইহা ছাড়া, বাহিরের ধূলা-বালি প্রভৃতি ময়লাও আমাদের জামা-কাপড় প্রভৃতিতে সর্বদাই কিছু-না-কিছু লাগে। দুর্গন্ধযুক্ত মলিন বস্ত্রাদি বহু রোগের জন্মস্থান। যাহারা এইরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, লোকে

তাহাদের নিকট হইতে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া যায়। আবার, বস্ত্রাদি ময়লা হইলে যে কেবলমাত্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং দেখিতে বিশ্রী হয় তাহাই নহে; মলিন বস্ত্রাদি অতিসহজে বস্ত্রের তন্তু-ধ্বংসকারী নানাবিধ বস্ত্রকীট আকর্ষণ করে এবং শীঘ্রই জীর্ণ হইয়া ছিঁড়িয়া যায়। এখন বুঝিতে পারিতেছ—কি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে, কি বেশ-ভূষাদির পারিপাট্য রক্ষার জন্য কিংবা গৃহস্থালীর অর্থসমস্যার দিক্ হইতে—আমাদের ব্যবহার্য বস্ত্রাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সর্বদাই একান্ত প্রয়োজন।

বস্ত্রাদি নিয়মিতভাবে অল্প মলিন থাকিতেই পরিষ্কার করা উচিত। বস্ত্র যত বেশী ময়লা হয় তাহা পরিষ্কার করিতে তত বেশী পরিশ্রম এবং সোডা-সাবান বা অন্যবিধ মূল্যবান্ রাসায়নিক দ্রব্য বেশী মাত্রায় প্রয়োজন হয় এবং বস্ত্রের ক্ষতির কারণও বেশী ঘটে।

মলিন বস্ত্রাদি সাধারণত ধোপাবাড়ী দিয়াই কাচাইয়া লওয়া হয়; কিন্তু, সর্বদা একমাত্র ধোপাদের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বস্ত্রাদি ধৌতকরণ-কার্য খুব কঠিন নয়। এই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না; গৃহস্থের অর্থ-সমস্যারও কতকটা সমাধান হয়।

**(ক) ধৌতকার্যে প্রয়োজনীয় তৈজসাদি ও তাহার যত্ন**—গৃহে বস্ত্রাদি ধৌতকরণ-কার্যে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি মনোনয়ন ও তাহাদের যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন।

ধৌতকরণ-কার্যে মাটির গামলা, মাটির হাঁড়ি এবং ভিজাইবার জন্য মাটির টবই প্রশস্ত। এইগুলি প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া উপুড় করিয়া রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া, কাপড় কাচিবার জন্য খুব মসৃণ চওড়া পুরু কাঠ বা পিঁড়ি, মসৃণ পরিষ্কৃত

শান-বাঁধান স্থান কিংবা প্রশস্ত পাথর ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড় পাট ও পালিশ করিবার জন্য লোহা বা পিতলের ইস্তিরিও রাখিতে হয়।

বস্ত্রাদি শুকাইবার জন্য পরিষ্কার দড়ি বা বাঁশের কিংবা কাঠের দণ্ডেরও প্রয়োজন হয়। অনেকে বস্ত্রাদি শুকাইবার জন্য উন্মুক্ত তৃণাচ্ছাদিত মাঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটি সুন্দর ব্যবস্থা; কারণ, ইহাতে বস্ত্রাদিতে মাড় মিশান নীলের জল ছিটাইয়া দিবার সুবিধা হয়। ধৌতকরণ-কার্যে ব্যবহৃত তৈজসাদি ব্যবহারের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া গৃহে যথাস্থানে রক্ষা করা প্রয়োজন; নতুবা, ব্যবহার-সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

**বস্ত্রাদির ময়লা ও নানাবিধ দাগ অপসারণের উপায়**— বস্ত্রাদিতে কোন দাগ লাগিলে, অবিলম্বে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত; বিলম্ব হইলে ঐ দাগ উঠান কঠিন হইয়া পড়ে।

বস্ত্রে ফলের রস বা কষ লাগিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটি ধরিয়া তথায় খানিকটা লবণ ঘসিয়া জলে ধুইয়া ফেলিবে। যদি ঐ রস বা কষ শুকাইয়া যায়, তবে লেবুর রস, তেঁতুল জল, সাইট্রিক বা টার্টারিক অ্যাসিড দ্বারা বার বার ঘসিয়া জলে ঐ অম্ল ধুইয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লইবে। লতা-পাতার সবুজ রং (ক্লারোফিলের) এর দাগ লাগিলে মেথিলেটেড স্পিরিট ভিজাইয়া তখনই সাবান জলে ধুইয়া ফেলিবে।

চা, কফি, কোকোর রং লাগিলে সদ্য সদ্য বস্ত্রের সেই অংশ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়, অথবা গ্লিসারিন মিশান জলে ধুইয়া পরে সাবান জলে ধুইতে হয়।

কাপড়ে ছাপার কালি লাগিলে একটু তার্পিন তেল রগড়াইয়া গরম জল ও সাবান ঘষিলেই উঠিয়া যায়। লেখার কালির দাগ উঠাইতে

হইলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিলেই যাইবে। নতুবা অক্স্যালিক অ্যাসিড দিবে।

লোহার মরিচার দাগ—অক্স্যালিক অ্যাসিড দ্বারা যাইবে।

রক্তের দাগ—গ্লিসারিন-জলে বার বার ধুইয়া পরে সাবান জলে ধুইতে হয়।

**(খ) ধৌতকার্যে প্রয়োজনীয় ক্ষার-পদার্থ, শ্বেতসার, নীল প্রভৃতির কার্য ঃ—**

**ধৌতকার্যে ময়লা-নাশক মশলাদি**।—সোডা, সাবান, সাজি-মাটি, কলার বাসনা বা ক্ষার, তেঁতুলবীজের ক্ষার বা অন্যবিধ গাছ পোড়ান ছাই, রিটা ফল এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধৌত বস্ত্রাদি ভাঁজ, পাট ও পালিশ করিবার জন্য বিবিধ মাড় বা কলপের প্রয়োজন হয়। এই মাড় বা কলপের জন্য চাউল-সিদ্ধ জল বা ভাতের মাড়, চিড়া, খই বা যব-সিদ্ধ জলে শ্বেতসার-পদার্থ বিদ্যমান থাকায় উহা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি ; কারণ, যথোপযুক্ত পরিমাণে মাড় ব্যবহার করিলে শুষ্ক বস্ত্রাদির ভাঁজ ঠিক থাকে এবং অল্প ভিজা অবস্থায় ইস্তিরি করিলে ইচ্ছামত ভাঁজ করা যায় ও জামা-কাপড় ভালভাবে পাট ও পালিশ হইয়া থাকে।

ধৌত বস্ত্রাদির শুভ্রতা সম্পাদনের জন্য অনেক সময় নীলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যে কাপড় কাচিলে বেশ ধবধবে সাদা হয়, তাহাতে সাধারণত নীলের প্রয়োজন হয় না। সাবানের দোষে ও জলের দোষে অনেক সময় কাচা কাপড়ে লাল্‌চে রং হয়। আবার, কোরা কাপড়েরও লাল্‌চে রং থাকে। এরূপ স্থলেই নীলের ব্যবহার আবশ্যক।

কাপড়-কাচা সোডা ( Washing Soda ) একটি রাসায়নিক পদার্থ। ইহাতে প্রধানত সোডিয়াম কার্বনেট ( Sodium Carbonate ) আছে এবং কিয়দংশ জলীয় পদার্থ আছে (—$Na_2CO_3$, $10H_2O$ উপাদান আছে )।

আমাদের দেশে রঙিন্ ‘সাজিমাটি’ নামক একপ্রকার রাসায়নিক মাটি পাওয়া যায়। ইহাও একটি ক্ষার-পদার্থ (—$Na_2CO_3$, $NaHCO_3$, $Na_2SO_4$, Clay etc., ইহার উপাদান )।

রিটা ( Soap-nut ) একপ্রকার গাছের ক্ষারপদার্থযুক্ত ফল। এই ফলের বীজটি ফেলিয়া দিয়া উহার খোসা রাত্রে গরম জলে ফেলিয়া রাখিলে পর দিবস প্রাতে সোডা বা ক্ষার জলের মত ব্যবহৃত হইতে পারে। রেশমী ও পশমী-বস্ত্রাদি ধৌতকরণ-কার্যে ইহার প্রচলন আছে। ক্ষার (Soda) মিশান ঈষদুষ্ণ জলে বা ঐ জলের ভাপরায় এবং শীতল জলের সাহায্যে মলিন বস্ত্রাদির ময়লা দূরীভূত হয়। কোন কোন অবস্থায় অন্যবিধ রাসায়নিক দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়। ক্ষারদ্রব্যের পরিমাণ বেশী হইলে বস্ত্রাদির সূতা নষ্ট হইতে পারে।

সাজিমাটি ও চূণ একত্র জলে গুলিয়া ফুটাইলে যে উগ্র ক্ষার-জল হয় তাহাকে কস্টিক্ সোডা বা কস্টিক্ পটাশ বলে। ইহাতে বস্ত্রাদি নষ্ট করে। সস্তা সাবানে রজন মিশান থাকে বলিয়া দেখিতে বাদামী রং হয়, ফেনাও বেশী হয় ; কিন্তু কাপড় বেশী স্থায়ী বা টেকসই হয় না।

সস্তা ডেলা সাবানে ছাই, মাটি কিংবা অত্যধিক ক্ষার থাকিতে পারে। এইজন্য সস্তা বাজে সাবানে বস্ত্রাদি ধৌত করা উচিত নয়।

খানিকটা সুবান জলে গুলিয়া তাহাতে পাতিলেবুর রস মিশাইলে যদি জলে খুব বেশী বুদ্বুদ্ উঠে তবে বুঝিবে ঐ সাবানে ক্ষারের মাত্রা বেশী। বেশী ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিতে নাই। খর

( Hard ) জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, কাজেই উহাতে বস্ত্রাদিও ভালরূপ পরিষ্কৃত হয় না ; পরন্তু ঐ জলের ক্যালসিয়ম্ বা ম্যাগনেসিয়াম-লবণ সাবানের সঙ্গে মিশিয়া খণ্ড খণ্ড চট্‌চটে পদার্থের আকারে বস্ত্রাদিতে লাগিয়া যায়। ঐ কাপড় ইস্তিরি করিবার সময় ঐগুলি পুড়িয়া কাপড়ে দাগ ধরে।

'খর' জল ভালরূপ ফুটাইলে 'কোমল' হয় ; অন্যথা, উহাতে সামান্য কাপড়-কাচা সোডা মিশাইয়া লইতে হয়। খর জলে কাপড় কাচিবার পর পুনরায় ভাল 'কোমল' জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সোডা ছাড়াইয়া লওয়া প্রয়োজন।

**(গ) কার্পাসের সূতার বস্ত্রাদি ও পট্টবস্ত্রাদি ধৌতকরণ-প্রণালী ঃ—**

**কার্পাস-বস্ত্রাদির ধৌতকরণ-প্রণালী**—পরিষ্কার, 'কোমল' ( Soft ) এবং শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে বস্ত্রাদি ভিজাইয়া রাখিয়া প্রথমত তাহাদের ময়লা কতকটা দূর করিয়া নিংড়াইয়া লইবে ; তারপর ঐগুলিকে সাবান-জলে ফেলিবে। বড় মাটির বা এনামেলের পরিষ্কার পাত্রে প্রয়োজন মত খুব গরম জল ঢালিয়া তাহাতে কাপড়-কাচা সাবান কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে এবং একটি পরিষ্কার কাষ্ঠখণ্ড দিয়া ঐ সাবানগুলি গুলিয়া জলের সহিত মিশাইয়া লইবে। পরে ঐ জল হাতসহা মত গরম থাকিতে থাকিতে পূর্বের ঐ কাপড়গুলি উহাতে ডুবাইবে এবং কয়েক মিনিট ধরিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একপাশে ঠাসিয়া রাখিয়া দিবে। কিছু সময় পরে পরিষ্কার শান-বাঁধান স্থানে কিংবা পুরু চওড়া তক্তার উপরে বারবার অল্প অল্প ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল দিয়া থুপিয়া ঐ সাবান-জলে মাখানো কাপড়গুলি কাচিবে। কাপড়গুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কাচিবে। বেশ

পরিষ্কৃত হইলে কাপড়ের কোন অংশে সামান্য সাবান-কুচিও ( সোডা যদি পূর্বে ব্যবহার করা না হইয়া থাকে ) যেন লাগিয়া না থাকে। কাপড়ে সাবান-কুচি লাগিয়া থাকিলে ইস্তিরি করিবার সময় কাপড়ে দাগ হইতে পারে।

এখন কাপড়গুলি নিংড়াইয়া লইয়া অপর একটি পরিষ্কার পাত্রে সামান্য পরিমাণ সাবান-গোলা জলে আবার কিছু সময় ফুটাইয়া লও। জল গালিয়া ফেল। কিছু শীতল হইলে কাপড়গুলি প্রথমে ঈষদুষ্ণ জলে এবং পরে প্রচুর শীতল জলে শেষবারের মত ধুইবে। এইবার প্রত্যেক কাপড় হইতে ভালরূপে জল নিংড়াইয়া উহা খোলা বাতাসে ও রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। ময়দানে পরিষ্কার ঘাসের উপর মেলিয়া দেওয়া ভাল। কতকটা শুকাইয়া আসিলে কাপড়ের উপর মাড়-মিশান ফিকা নীল জলের ছিটা মাঝে মাঝে দিবে।

কাপড় রোদে শুকাইয়া গেলে উঠাইয়া পাট ও ভাঁজ করিবার জন্য উহাতে মাড়-জল ছিটাইয়া ইস্তিরি করিয়া লইবে।

**রেশম-বস্ত্র ও পশম-বস্ত্র ধৌতকরণ-প্রণালী**—রেশম-বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ভাল কাপড়কাচা সাবান বেশ ভাল করিয়া গুলিয়া লইবে; তাহার মধ্যে বস্ত্রগুলি ডুবাইয়া দিবে। ১৫।২০ মিনিটকাল এই ভাবে রাখিবার পর প্রচুর ঠাণ্ডা ও গরম জলে এক একখানি বস্ত্র সাবধানতার সঙ্গে থুপিয়া থুপিয়া কাচিয়া লইবে। ইহাতে বস্ত্রের ময়লা সম্পূর্ণরূপে না গেলে আবার নূতন ঈষদুষ্ণ সাবান-গোলা জলে ঐ বস্ত্র ভিজাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ থুপিয়া কাচিয়া লইবে।

রঙিন রেশম-বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে শীতল জলের সহিত কিছু ভিনিগার মিশান ভাল। রেশম-বস্ত্র পরিষ্কৃত হওয়ার পর উহা না

নিংড়াইয়া কোন পরিষ্কৃত ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া যথোপযুক্ত ভাবে টান করিয়া শুকাইতে দিবে। সম্পূর্ণ শুকাইবার পূর্বেই উহার উপর সূতি কাপড় রাখিয়া ইস্তিরি করিবে।

পশম-বস্ত্রও রেশম-বস্ত্রের ন্যায় একই প্রণালীতে পরিষ্কার করিবে।

**রেশম ও পশম-বস্ত্র ধৌতকরণ সম্বন্ধে সাবধানতা**—অতিরিক্ত গরম জল বা 'খর' ( hard ) জল কদাচ ব্যবহার করিতে নাই। ঐ জলের ব্যবহারে সাবানের ফেনা হয় না; উপযুক্ত কার্য হয় না—অথচ, সাবানের অপচয়ও অধিক হইয়া থাকে। জলে যেন কোনরূপে ক্ষারের মাত্রাধিক্য না ঘটে। কাপড়ের উপর হাতে করিয়া সাবান ঘষিতে নাই; তাহাতে উহার সূতা নষ্ট হইয়া যায়।

সস্তাদরের অপকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবে না। রেশম ও পশম-বস্ত্র কদাচ আছড়াইবে না বা নিংড়াইবে না। ছায়াযুক্ত স্থানেই শুকাইবে।

**বস্ত্র ধৌতকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা**—সূতি ও পট্ট-বস্ত্রে অত্যন্ত তেল-ময়লা আটকাইলে বেশী পরিমাণে কস্টিক্ বা কার্বনেট্ সোডা না দিয়া সাবান-গোলা জলে সামান্য পরিমাণ সোহাগা বা কেরোসিন তৈল দিলে সূতা নষ্ট হইবে না, অথচ ঐ তেল-ময়লা সহজেই ছাড়িবে।

পশম ও রেশম-বস্ত্রে বেশী তেল-ময়লা আটকাইলে শুষ্ক অবস্থাতেই ঐগুলিতে পেট্রল, বেঞ্জিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য ঘষিবে কিংবা সাবান-জলে খুব সামান্য পরিমাণে সোহাগা বা এমোনিয়া লোশন মিশাইয়া তাহাতে কাপড় কাচিবে।

সাধারণ সস্তাদরের সাবান, সোডা ও জলে পশমী ও রেশমী-বস্ত্রাদি নষ্ট হয় বলিয়া আজকাল পেট্রল, বেঞ্জিন, ঈথার, স্পিরিট, এসিটোন,

ক্লোরোফর্ম বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের মধ্যে উক্ত বস্ত্রাদি ডুবাইয়া অতি সহজে পরিষ্কৃত করা হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির ব্যবহারে সুবিধা এই যে, উহারা অতি শীঘ্র ময়লা দূর করে। উহাদের রং বা গন্ধ কাপড়ে লাগে না; সুতরাং, বস্ত্রাদির কোন ক্ষতি হয় না। তবে, ঐগুলি খুব মূল্যবান্। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দাহ্য পদার্থ বলিয়া উহাদের ব্যবহারকালে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# রন্ধন-বিধি

## (ক) খাদ্য ( Food )

-:*:-

ইঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন জল, কয়লা ও আগুনের প্রয়োজন, মানবদেহকে চালাইতেও তেমনি খাদ্যের ও জলের আবশ্যক। ইঞ্জিনের কর্মশক্তির মূল যেমন কয়লা ও জল প্রভৃতি, মানুষের কর্মশক্তির মূলও তেমনি খাদ্য ও জল। খাদ্যের ও জলের অভাবে মানুষের দেহ-যন্ত্র একেবারে অচল হইয়া পড়ে।

আমরা যাহা কিছু খাই, সে সকলই খাদ্য নহে। সকলগুলিকে খাদ্য বলিলে ভুল হয়। যে সকল সামগ্রী আহার করিলে—(১) শরীরের

ক্ষয় পূরণ হয়, (২) শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়, (৩) শরীরে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি জন্মে, (৪) সকল অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং (৫) আবশ্যকমত কার্য করিবার শক্তি জন্মে—তাহাই 'খাদ্য' নামে অভিহিত হইতে পারে। খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকটসম্বন্ধ।

ক্ষয়পূরণাদি বিভিন্ন কাযের জন্য বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমরা যে সকল দ্রব্য খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান ( Nutritive Principles ) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন :—

(১) আমিষ-জাতীয় উপাদান ( Proteins ) ; (২) শর্করা-জাতীয় উপাদান ( Carbohydrates ) ; (৩) তৈল-জাতীয় উপাদান ( Fats ) ; (৫) লবণ-জাতীয় উপাদান ( Salts ) ; (৫) জল-জাতীয় উপাদান ( Water ) ; (৬) ভাইটামিন ( Vitamins )।

১। **আমিষ-জাতীয় উপাদান**—মাছ, মাংস, ডিমের শ্বেতাংশ, পনির, ছানা এবং নানাবিধ ডাল প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। আমিষ-জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। মাংসপেশী ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টিসাধনই এই জাতীয় খাদ্যের প্রধান কার্য। আমাদের শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কোষ দ্বারা নির্মিত। সেই সকল কোষ প্রোটোপ্ল্যাজম্ ( Protoplasm ) নামক এক প্রকার নাইট্রোজেন-প্রধান পদার্থের দ্বারা গঠিত। আমিষ-জাতীয় এবং লবণ-জাতীয় উপাদানের দ্বারা এই সকল প্রোটোপ্ল্যাজমে ( Protoplasm ) পুনর্গঠন সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত, দেহাভ্যন্তরস্থিত নানাবিধ 'রস' এই উপাদানের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। মেদ-গঠন-সম্বন্ধেও আমিষ-জাতীয় খাদ্য কিয়ৎপরিমাণে

সহায়তা করে। এই জাতীয় উপাদান দ্বারা শারীরিক দহন-ক্রিয়া সাধিত হইয়া কিঞ্চিৎপরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

২। **শর্করা-জাতীয় উপাদান**।—চাউল, আলু, ময়দা, চিনি, গুড়, এরোরুট, যব প্রভৃতি পদার্থ এই শ্রেণীর খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় উপাদান হইতে যে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ তৈল-জাতীয় উপাদান হইতে উৎপন্ন তাপ ও শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু, শর্করা-জাতীয় উপাদান হইতেই শরীরের মেদ জন্মে। সেইজন্য অধিক পরিমাণ ভাত, মিষ্টান্ন ও রুটি খাইলে লোকে মোটা হইয়া পড়ে।

৩। **তৈল-জাতীয় উপাদান**।—এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। শারীরিক তাপ উৎপাদন করাই এই জাতীয় খাদ্যের প্রধান কার্য এবং এই তাপ হইতেই আমরা কাজ করিবার শক্তি ( Energy ) প্রাপ্ত হই। মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্যের তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা সামান্য মাত্র। ঘৃত, তৈল, মাখন, চর্বি, চাউল, ময়দা, আলু, গুড়, চিনি প্রভৃতি যাবতীয় তৈল ও শর্করা-জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা শরীর-রক্ষণোপযোগী তাপ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মাংস, অর্থাৎ আমিষ-জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের মাংসপেশীর ও যন্ত্রাদির ক্ষয় পূরণ করে। কোন কার্য করিবার নিমিত্ত আমাদের যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা প্রধানত ভাত, রুটি, মাখন, ঘৃত, তৈল, গুড় ও চিনি প্রভৃতি খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত, তৈল-জাতীয় খাদ্যের দ্বারা দেহস্থিত মেদ ( Fat ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অন্যান্য খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে।

৪। **লবণ-জাতীয় উপাদান**।—লবণ-জাতীয় উপাদানের মধ্যে যে লবণ আমরা প্রতিদিন খাদ্যের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহাই সর্বপ্রধান। সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যে লবণ অল্পাধিক বিদ্যমান থাকে। খাদ্যের সহিত লবণ খাইলে মুখের লালা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। লবণ যকৃৎকে পিত্ত প্রস্তুত করিতে সহায়তা করে এবং পাকাশয় হইতে যে পাচক-রস ( Gastric Juice ) নির্গত হয়, তাহার অম্লাংশ ( Hydrochloric Acid ) লবণ হইতে উৎপন্ন হয়। ফল, মূল, তরি-তরকারি প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে লবণ-জাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকে। ইহাদের দ্বারা আমাদের রক্ত পরিষ্কৃত হয়। টাট্‌কা ফলমূল ও তরি-তরকারি না খাইলে রক্ত বিকৃত হইয়া 'স্কার্ভি' ( Scurvy ) নামক এক প্রকার উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে। লেবুর রস,. টাটকা ফল-মূল ও তরি-তরকারি খাওয়াই স্কার্ভি রোগের মহৌষধ।

৫। **জল**।—আমাদের শরীরের প্রায় $\frac{3}{4}$ ভাগ জল। মল, মূত্র ও ঘর্ম প্রভৃতি নানা আকারে আমাদের শরীর হইতে জল প্রতিনিয়ত নির্গত হইতেছে। আমাদের রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে। এই জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া শরীরের সর্বত্র উহার চলাচলে সহায়তা করে। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং তদ্দ্বারা শারীরিক ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। জল খাদ্যকে কোমল ও তরল করিয়া পরিপাকের এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযোগী করে। এতদ্ব্যতীত, অজীর্ণ খাদ্য ও দেহোৎপন্ন নানা দূষিত পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মল, মূত্র ও ঘর্মের আকারে নিয়ত শরীর হইতে বহির্গত হয়।

৬। **খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন।** উপর্যুক্ত পঞ্চ প্রকার উপাদান ভিন্ন 'ভাইটামিন' নামক এক প্রকার সার পদার্থ আমাদের শরীরের পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং এই জাতীয় সার পদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভাইটামিন প্রায় সকল খাদ্যের মধ্যেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। চাউলের উপরের স্তর ভাইটামিন-যুক্ত। সেইজন্য মাজা চাউল অপেক্ষা আমাজা চাউল বেশী পুষ্টিকর। কাঁচা খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ভাইটামিন বেশী থাকে। রন্ধনের সময় আগুনের জ্বালে অনেক ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। কলে ভাঙা শাদা আটা অপেক্ষা যাঁতায় ভাঙা অপরিষ্কার আটায় অধিক পরিমাণে 'ভাইটামিন' থাকে।

এ পর্যন্ত বহু প্রকার ভাইটামিনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাত প্রকার ভাইটামিন প্রধান: —Vitamin A, Vitamin $B_1$, $B_2$, $B_3$, Vitamin C, Vitamin D Vitamin E.

বিভিন্ন-জাতীয় খাদ্য-উপাদানের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ সামগ্রী যথোপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান না থাকিলে শিশু ও যুবকদিগের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের খাদ্যে এই উভয় উপাদান কি প্রকারে বর্ধিত করা যায়, সেই বিষয়ে প্রভূত গবেষণা চলিতেছে। ভাতের সহিত আটা, ময়দা প্রভৃতি, প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ, ডিম, মাংস ও বিভিন্ন প্রকার ডাইলের প্রস্তুত দ্রব্য—ধোকা, বড়ি, পাঁপড় প্রভৃতি প্রত্যহ পরিমিতরূপে গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ, বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে আহার্যের মধ্যে না থাকিলে জীবের পুষ্টি হয় না, জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার উপাদানে গঠিত খাদ্য

খাওয়াইয়াও পশুশাবককে বাঁচাইয়া রাখা যায় না; কিন্তু উহার সহিত দুধ মিশাইয়া দিলে সে অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, দুগ্ধে এমন জিনিস আছে যাহা খাদ্যের সহযোগে জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দেয়। এই পদার্থের নামই ভাইটামিন এবং জীবনীরক্ষার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই ইহাকে 'খাদ্যপ্রাণ' বলা হয়।

খাদ্যমধ্যস্থ ভাইটামিন আমাদের জীবনীশক্তি বজায় রাখে। সকলপ্রকার খাদ্যেই কম বেশী পরিমাণে ভাইটামিন আছে। ভাইটামিনের অভাব হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়; বেরি-বেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ ভাইটামিনের অভাবেই জন্মে। সুতরাং, খাদ্যে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকা আবশ্যক। টাট্‌কা ফল, তরকারী, দুধ, মাখন, চাউল, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি সকল খাদ্যের মধ্যেই ভাইটামিন আছে।

চাউলে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে; কিন্তু, খুব বেশী ছাঁটাই করিলে চাউলের ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। কলের চাউল খুব পরিষ্কার; চাউল যত ছাঁটা যায়, ততই পরিষ্কার হয়। এজন্য কলের চাউলে ভাইটামিন অতি সামান্যই থাকে। তাই, যাহারা কলের চাউল খায়, বেরি-বেরি প্রভৃতি নানা রোগ তাহাদেরই বেশী হয়। কাঁচা ফল, শাকসব্জি, অঙ্কুরিত ছোলা, কাঁচামুগ ও মাখন প্রভৃতিতে খুব বেশী পরিমাণে ভাইটামিন থাকে।

আগুনের উত্তাপে খাদ্যের ভাইটামিন কতকটা নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য প্রত্যহ অল্পপরিমাণে অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ এবং কিছু ফলমূল কাঁচা খাওয়া উচিত। তরি-তরকারিও শুষ্ক হইলে তাহার ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সর্বদা টাট্‌কা তরি-তরকারি আহার করা উচিত।

দেহ সতেজ, সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে সর্বদা টাট্‌কা তরি-তরকারি, ঢেঁকিছাঁটা চাউল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা ও ফলমূল আহার করা কর্তব্য। ভাতের ফেন ( মাড় ) কখনও ফেলা উচিত নয়; উহার সঙ্গে চাউলের সারাংশের বেশীর ভাগই চলিয়া যায়। শাকসব্জি সিদ্ধ করা জলও ঐকারণেই ফেলা উচিত নয়। মৎস্য, মাংস, ডিম প্রভৃতিও মাঝে মাঝে খাওয়া দরকার। দুধ প্রত্যহ খাওয়া উচিত।

আমাদের খাদ্যে যে পাঁচ প্রকার ভাইটামিন আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; এখন ইহাদের প্রত্যেকটি আমাদের কি কি প্রয়োজনে আসে তাহা বলা যাক।

**ভাইটামিন "এ"** (A—ক)—এই জাতীয় ভাইটামিন আমাদের শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাব হইলে শরীর সুগঠিত ও পুষ্ট হয় না। সংক্রামক পীড়া প্রতিরোধের ক্ষমতাও ইহার খুব বেশী। দুগ্ধ, মাখন, ডিম, টাট্‌কা তরি-তরকারি, কড্‌মাছের তৈল (Cod Liver Oil), বাঁধাকপি, পালং শাক প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মসুর, মুগ প্রভৃতি ডাল এবং মাংসেও ইহা পাওয়া যায়।

রন্ধন করিবার সময়ে উত্তাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে ভাইটামিন 'এ' অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ঢাকিয়া রাখিলে ইহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না। 'এ' ভাইটামিনের অভাব হইলে চক্ষুরোগ, এবং শিশু ও বালক-বালিকাদের চূণ-জাতীয় পদার্থের অভাব হইয়া থাকে; ফলে দন্ত ও অস্থির পূর্ণ সংগঠন হইতে পারে না।

**ভাইটামিন "বি"** (B—খ)—এই জাতীয় ভাইটামিনও আমাদের শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যথোচিত পরিমাণে এই

ভাইটামিনে শরীরাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিসমূহ হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে শরীর সুস্থ ও সবল হয়। ইহার অভাবে বেরি-বেরি প্রভৃতি কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। 'বি' ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে বেরি বেরিতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ভাইটামিন 'বি' জলে গলিয়া যায়, কিন্তু রন্ধন করিবার সময়ে আগুনের উত্তাপে ইহা সহজে নষ্ট হয় না। ইহা জলে গলিয়া যায় বলিয়া ভাতের ফেনের ( মাড়ের ) সহিত ইহার অধিকাংশ বাহির হইয়া যায়। সুতরাং, ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে এই ভাইটামিনও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এই কারণেই ভাতের মাড় এবং তরি-তরকারি সিদ্ধ জলও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে।

অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর ও চাউল প্রভৃতিতে ভাইটামিন 'বি' প্রচুরপরিমাণে থাকে। সবুজ বর্ণের পাতায়, ফল ও বীজে এই ভাইটামিন থাকে। যে সকল পশু ঘাস পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের মস্তিষ্ক, যকৃত প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রে এবং দুগ্ধে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। শরীর-গঠন ও ক্ষয়পূরণের জন্য ভাইটামিন 'বি' বিশেষ আবশ্যক। শরীরে বলসঞ্চারের জন্য এই ভাইটামিন চাই। ইহার অভাবে পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। ইহা স্নায়ুমণ্ডল, পেশীসমূহ, পাকস্থলী, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতির শক্তি বৃদ্ধি করে। তৈল-জাতীয় পদার্থ ও শাদা চিনিতে এই ভাইটামিন থাকে না। এই ভাইটামিনের অত্যন্ত অভাব হইলে হাত, পা এবং হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হইয়া যায়।

এই ভাইটামিন **বি$_1$, বি$_2$**, ( $B_1$, $B_2$ ) প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

**ভাইটামিন "সি"** (C—গ)—টাট্‌কা সবুজ বর্ণের শাকসব্জিতে, টমেটো, কমলালেবু ও পাতিলেবুর রসে এবং অধিকাংশ টাট্‌কা

ফলে ভাইটামিন 'সি' প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। ছোলা, মুগ প্রভৃতি শস্যে এই ভাইটামিন থাকে না; কিন্তু অঙ্কুরিত হইলে এই ভাইটামিন উৎপন্ন হয়। রক্তের বিশুদ্ধতা-রক্ষায় এবং শরীর গঠনে এই ভাইটামিন বিশেষ সাহায্য করে। অন্ত্র সুস্থ রাখিয়া রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা এই ভাইটামিনের প্রধান কাজ। ইহার অভাবে শরীরে 'স্কার্ভি' (Scurvy) নামক কঠিন রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 'স্কার্ভি' হইলে রক্তাল্পতা, অগ্নিমান্দ্য, দাঁতের যন্ত্রণা ও মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে; শারীরিক যন্ত্রাদিতে রক্ত জমিয়া রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। কাঁচা তরকারি, পাতিলেবু, কাগজিলেবু এবং কমলালেবুর রসে ভাইটামিন **'সি'** যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল ফলের রস যথেষ্ট পরিমাণে খাইলে 'স্কার্ভি' রোগের আক্রমণ সহজে হইতে পারে না।

ভাইটামিন 'সি' আগুনের তাপে ও বায়ুর সংস্পর্শে অন্য সকল ভাইটামিনের চেয়ে সহজে নষ্ট হয়। এইজন্য দুধ ও শাকসব্জি সিদ্ধ করিবার সময় রন্ধনপাত্রের মুখ ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

**ভাইটামিন "ডি" (D—ঘ)**—দুগ্ধ, মাংস, ডিমের কুসুম ও সকলপ্রকার মাছের তৈলে ভাইটামিন 'ডি' প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। নারিকেলেও এই ভাইটামিন থাকে। সূর্যের কিরণ শরীরে লাগাইলে এই ভাইটামিনের সৃষ্টি হয়। ভাইটামিন 'ডি' শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার অভাব হইলে শিশুদের অস্থি এবং পেশীসমূহ অত্যন্ত দুর্বল হয়, শরীরে রক্তাল্পতা ঘটে, গায়ের রং ফ্যাকাসে হয়, ফুস্‌ফুসে নানা রোগ জন্মে, সহজে সর্দি লাগে; এই জন্য তাহাদের মেজাজ খিট্‌খিটে হয় এবং সুনিদ্রা হয় না। এই রোগের নাম 'রিকেট'। এই রোগ হইলে শিশুর শরীরের অস্থিসমূহ এত কোমল

হইয়া যায় যে, সে দেহের ভার সহ্য করিতে পারে না ও তাহার পা বাঁকিয়া যায়। শরীর ক্ষুদ্র হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্টিলাভ করে না। এই রোগ হইলে শিশুদিগকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইতে হয় এবং শরীরে রৌদ্র লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। শিশুদিগকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহাতে শিশুর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন 'ডি' উৎপন্ন হওয়ার ফলে 'রিকেট' বড় একটা দেখা যায় না। প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে শিশুরা এই উৎকট রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

**ভাইটামিন "ই"** ( E—ঙ )।—শরীরের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এই ভাইটামিন বিশেষ আবশ্যক। নানাপ্রকার শস্য, বিশেষত চাউল, গম, যব প্রভৃতি এবং ডিমের কুসুমে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

মোট কথা **ভাইটামিনগুলি**—

১। আমাদের শরীর গঠন ও পোষণ করে ;

২। বিভিন্ন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে ;

৩। দেহের অস্থিসকল সুগঠিত করিয়া শরীর সুস্থ ও সবল রাখে ;

৪। শরীরের রক্তবৃদ্ধি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর সবলতা বৃদ্ধি করে ;

৫। শরীর নীরোগ রাখে।

আমাদের কোন্ খাদ্যে কোন্ জাতীয় ভাইটামিন কি পরিমাণে আছে তাহা পরবর্তী তালিকায় দেখান হইল।

## ভাইটামিন

| | এ | বি | সি | ডি |
|---|---|---|---|---|
| কাচা দুধ | ৩ | ২ | ১ | ২ |
| জ্বাল দেওয়া দুধ | ১ | ১ | × | ১ |
| মাখন | ৩ | × | × | ৩ |
| দধি ও ঘোল | ১ | ৩ | ১ | ১ |
| চাউল— | | | | |
| ঢেঁকি ছাঁটা | ১ | ২ | × | ১ |
| কলে ছাঁটা | × | × | × | × |
| ডাল | ১ | ১ | × | ১ |
| মুগ, মটর | ১ | ২ | ২ | ১ |
| আলু | ১ | ২ | ২ | ১ |
| রাঙা আলু | ১ | ১ | × | ১ |
| কলাই শুঁটি | ২ | ২ | ১ | ২ |
| ফুলকপি | ১ | ২ | ১ | ১ |
| বাঁধাকপি | ১ | ১ | ২ | ১ |
| পটোল | × | ১ | ১ | × |
| পালং শাক | ৩ | ৩ | ৩ | ২ |
| পিঁয়াজ | × | ২ | ২ | × |

| | এ | বি | সি | ডি |
|---|---|---|---|---|
| রশুন | × | × | ২ | × |
| বেগুন | × | ১ | ১ | × |
| টমেটো | ১ | ৩ | ৩ | ১ |
| আম | ১ | × | ২ | ১ |
| কলা | ১ | ১ | ১ | ১ |
| কমলা লেবু | ১ | ২ | ৩ | ১ |
| ঝুনা নারিকেল | ১ | ২ | × | ১ |
| পেঁপে | ১ | ১ | ২ | ১ |
| লেবু | × | ১ | ১ | × |
| আঙ্গুর | × | ২ | ২ | × |
| যব | ১ | ২ | × | × |
| যাঁতায় ভাঙ্গা আটা | ১ | ২ | × | ১ |
| কলের ময়দা | × | ১ | × | × |
| সরিষার তৈল | × | × | × | × |
| চিনাবাদামের তৈল | ২ | × | × | ১ |
| কড্ মাছের তৈল | ৪ | × | × | ৪ |
| চিনি | × | × | × | × |
| গুড় | × | ১ | × | × |
| মাছ | ২ | ২ | × | ১ |
| মাছের যকৃৎ | ২ | × | × | ২ |
| মাছের ডিম | ১ | ২ | × | ১ |

## দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ

বিভিন্ন অবস্থায় একজন যুবকের সাধারণত কি প্রকার খাদ্য কতটুকু প্রয়োজন হয়, বিশেষজ্ঞগণ তাহার যে হিসাব করিয়াছেন, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল ; যথা –

| কি অবস্থায় প্রয়োজন | পরিমাণ আউন্স হিসাবে দেওয়া হইল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | আমিষ-জাতীয় (প্রোটিন) | তৈল-জাতীয় পদার্থ (ফ্যাট) | শর্করা-জাতীয় পদার্থ (কার্বোহাইড্রেট) | লবণ-জাতীয় পদার্থ (সল্ট) | জলীয় পদার্থ (ওয়াটার) |
| কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য | ২ | ১/২ | ১২ | ১/২ | ৫০ হইতে ৬০ |
| খুব সামান্য পরিশ্রমীর অর্থাৎ, অলস ব্যক্তির জন্য | ২ ১/২ | ১ | ১২ | ১/২ | ঐ |
| সাধারণ পরিশ্রমীর জন্য | ৪ ৬/৫ | ৩ | ১৪ ১/৪ | ১ ১/৪ | ঐ |
| কঠোর পরিশ্রমীর জন্য | ৬ | ৩ ১/২ | ১৬ | ১ ১/২ | ঐ |

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কোন্ জিনিস কি পরিমাণ খাইলে চলিতে পারে, নিম্নে তাহার মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :—

(১) **চাউল**—দেড় পোয়া হইতে সাত ছটাক। (২) **ডাল**—দেড় ছটাক হইতে দুই ছটাক। (৩) **মৎস্য বা মাংস**—অর্ধ পোয়া হইতে আড়াই ছটাক। (৪) **ঘৃত ও তৈল**—দেড় কাঁচ্চা হইতে তিন কাঁচ্চা। (৫) **লবণ**—এক কাঁচ্চা। (৬) **তরকারি**—দুই ছটাক। (৭) **মসলা**—অর্ধ কাঁচ্চা। (৮) **দুগ্ধ**—অর্ধ সের হইতে তিন পোয়া।

ডাল বা মৎস্য এবং তাহার সহিত ঘৃত বা তৈল কম খাওয়া হইলে, বেশী দুগ্ধ খাওয়া প্রয়োজন। মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হইলে, চাউল ও তাহার সহিত ডাল কিঞ্চিৎ কমাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি মাছ-মাংস যদি না খাওয়া হয়, তাহা হইলে মিষ্ট ভোজন হেতু ডালের পরিমাণ কম না করিয়া চাউলের পরিমাণ কিছু কমান আবশ্যক।

সাধারণ খাদ্যের উপাদানসমূহের আনুপাতিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

| খাদ্য | আমিষ-জাতীয় উপাদান Protein | শর্করা-জাতীয় উপাদান Carbo-Hydrates | তৈল-জাতীয় উপাদান Fats | লবণ-জাতীয় উপাদান Salts | জলীয় উপাদান Water | কোথায় পরীক্ষিত বা পরীক্ষকের নাম Authority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গো-দুগ্ধ (দেশীয় গৃহপালিত গরুর দুধ) | ৩·৯৭ | ৪·৮২ | ৪·২৮ | ·৬ | ৮৬·৮৭ | সায়েন্স এসো-সিয়েশন |
| গো-দুগ্ধ (কলিকাতার বাজারের) | ২·৫৭ | ২·৬০ | ২·২৭ | ·৩৯ | ৯২·১৭ | " |
| স্তন্য-দুগ্ধ (মানুষের) | ২·৯৭ | ৫·৮৭ | ২·৯০ | ·১৬ | ৮৮·০ | ব্লাইদ্ |
| ছাগ-দুগ্ধ | ৩·৬২ | ৪·০ | ৪·২০ | ·৫৬ | ৮৭·৫৪ | |

| খাদ্য | আমিষ-জাতীয় উপাদান Protein | শর্করা-জাতীয় উপাদান Carbo Hydrates | তৈল-জাতীয় উপাদান Fats | লবণ জাতীয় উপাদান Salts | জলীয় উপাদান Water | কোথায় পরীক্ষিত বা পরীক্ষকের নাম Authority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মহিষ-দুগ্ধ | ৪·৪ | ৪·৮ | ৯·০ | ·৮ | ৮১·০ | ওয়াটসন্ |
| গর্দভ-দুগ্ধ | ১·৭৯ | ৫·৫ | ১·০২ | ·৪২ | ৯১·১৭ | ব্লাইদ |
| মেষ-দুগ্ধ | ৭·১০ | ৪·২০ | ৫·৩০ | ১·০ | ৮২·২৭ | " |
| দধি (নাটোরের) | ৫·৬৩ | ১·৬৫ | ৪·৮৫ | ·৯৭ | ৮৪·৯৩ | গ্রন্থকার |
| মাখন | ১·০ | ... | ৯০·৫ | ১·০ | ৭·৫ | বেল্ |
| ছানা | ২১·৬৮ | ·২৮ | ১৬·৮ | ১·৬৮ | ৫৮·৭২ | গ্রন্থকার |
| ছাগমাংস | ২৪·০৬ | ০ | ২·৫ | ১·২ | ... | মেডিঃ কলেজ |
| মুরগীর মাংস | ২৩·৩ | ০ | ৩·১ | ১·০ | ৭০·০ | হাচিন্সন্ |
| রুই (পুকুরের) | ১৭·৫ | ০ | ৭·৪ | ... | ... | মেডিঃ কলেজ |
| মাগুর | ১৯·৪৯ | ০ | ·৫ | ১·৩ | ৭৮·৮৫ | সায়েন্স এসঃ |
| টেংরা | ১৭·২৮ | ০ | ·৬ | ১·১৫ | ৭৭·৭ | " " |
| গম | ১৪·৬ | ৬৭·৯ | ১·২ | ১·৬ | ১৪·০ | " " |
| ময়দা | ১১·০ | ৭১·২ | ২·০ | ·৮ | ১·০ | পার্কস্ এসঃ |
| আটা | ১১·৫ | ৬৭·৫ | ১·৯ | ৩·৮৫ | ১৪·৬৪ | মেডিঃ কলেজ |
| চাউল (গড়ে) | ৫·০ | ৮৩·২ | ·৮ | ·৫ | ১০·০ | পার্কস্ এসঃ |
| ঐ (বালাম) | ৭·৫ | ৭৮·৪৯ | ·৪২ | ·৭৪ | ১২·৫ | ... |
| ঐ দেশী | ৬·৩৯ | ৭৯·২ | ·৭ | ·৭৬ | ৯·৪ | মেডিঃ কলেজ |
| ঐ বাঁকতুলসী আতপ | ৬·৮৩ | ৮০·১ | ·৯ | ·৬৮ | ১১·৪ | সায়েন্স এসঃ |
| ঐ বাঁকতুলসী সিদ্ধ | ৬·৭১ | ৮২·২ | ·১. | ·৮২ | ১১·০৬ | ... |
| ঐ দাদখানি পুরাতন | ৫·৪ | ৮০·৩৫ | ·১৬ | ·৪০ | ১১·০ | ... |
| ডাল (গড়ে) | ২৩·৫ | ৫৪·৮ | ১·০ | ৯·০ | ১১·৩ | ওয়াল্ডেন্ |
| সোনামুগ | ২৩·৮ | ৫৪·১ | ১·৭ | ১০·২ | ১১·৪ | " |
| কৃষ্ণমুগ | ২২·২ | ৫৮·৪ | ১·৩ | ৩·৪ | ২০·৮ | " |
| মসূর | ২৫·১ | ৫৫·৭ | ১·৬ | ১০·৩ | ১১·৮ | " |

| খাদ্য | আমিষ-জাতীয় উপাদান Protein | শর্করা-জাতীয় উপাদান Carbo-Hydrates | তৈল-জাতীয় উপাদান Fats | লবণ-জাতীয় উপাদান Salts | জলীয় উপাদান Water | কাহার দ্বারা বা কোথায় পরীক্ষিত Authority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অড়হর ডাল | ১৭·১ | ৫১·৩৮১ | ২·৩৮ | ২·৮ | ১৩·৩ | পার্কস এসঃ |
| খেঁসারি | ২৪·০৮ | ৫৫·৮ | ১·২ | ৯ ২ | ১২·৭৪ | ওয়ার্ডেন " |
| ছোলা | ২৩·৬৬ | ৬০·০২ | ৪·৩০ | ২·৪৪ | ৯·৫৮ | সায়েন্স এসঃ |
| মটর | ২২·০ | ৫৩·০ | ২·০ | ২·৪ | ১৫·০ | ওয়ার্ডেন |
| ঘৃত | | | | | | |
| তৈল | | | | | | |
| চিনি | ০ | ৯৬·৫ | ০ | ·৫ | ৩·০ | পার্কস্ এসঃ |
| আলু | ২·১ | ২৯·০ | ·৪৬ | ১·০ | ৭৪·০ | " |
| বাঁধাকপি | ১·৮ | ৭·৮ | ·০৫ | ·০৭ | ৯১·০ | " |
| ফুলকপি | ·৫ | ২·০ | ০ | ·৭ | ৯২·০ | পটিয়ার |
| কলাইশুঁটি | ৬·৩৫ | ১২·০ | ·৫৩ | ·৮১ | ৭৮·৪৪ | হাচিন্সন |
| অন্যান্য তরকারি (গড়ে) | ২.০৫ | ৫ ·৩৩ | ·১৪ | — | - | মেডিঃ কলেজ |
| পিঁয়াজ | ১·৫৭ | ২·৯৯ | ·৪৫ | ৮৮·৯০ | ২·৫ | এ কে টার্নার |
| লাউ | ·৫৫ | ২·৩৬ | ·২৬ | ৯৫·৮৮ | ·৯ | " |
| বেগুন | ·৮৯ | ১·৪৮ | ১·৩৮ | ৯৩·৯৮ | ৩·৪৮ | " |
| কাঁচকলা | ১·৩১ | ২·৭ | ·১৭ | ৭৮·০ | ১৬·৮ | এন এন বসু |
| টমেটো | ·৮০ | ·৪৯ | — | ৯৪·৭৩ | ৩·৬ | এ কে টার্নার |
| রাঙা আলু | ·৭৮ | ৩·৩১ | ·৫২ | ৭৪·১০ | ২১·৭ | " |
| ওলকপি | ·৮৪ | ·৫৪ | ১·৪৬ | ৮৭·০ | ১১·৪ | " |
| ওল | ২·৩৩ | ২·৮৯ | ১·৪ | ৮০·৬০ | ১২·৮ | " |
| ঢেঁড়শ | ১·৯১ | ১·১১ | ·৮ | ৯০·৪৩ | ৬·৭২ | " |
| মূলা | ·২৪ | ·০৬ | ·৬৪ | ৯৫·৭৫ | ৩·৩৮ | " |
| বিট্ পালং | ১·৯৬ | ২·০১ | ১·৩ | ৮৩·৩০ | ১১·৪১ | " |
| বিলাতি কুমড়া | ·৯০ | ১·০৩ | ·৭ | ৯৩·৪০ | ৩·২৬ | " |
| বরবটি | ৩·৫০ | ১·২৫ | ১·৬ | ৯১·৯৭ | ১·৭৫ | " |

## শিশু ও যুবকদের পক্ষে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যাদির বিশেষ উপকারিতা

**দুগ্ধ।**—আমরা যতপ্রকার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি তন্মধ্যে দুগ্ধই সর্বোৎকৃষ্ট। আমাদের শরীর রক্ষা এবং তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন তাহার সবগুলিই দুগ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান আছে। সেইজন্য শিশুরা কেবলমাত্র দুধ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে এবং দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুগ্ধের সহিত অন্যান্য পুষ্টিকর ও ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে শরীর অতি সত্বর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে। আমরা সাধারণত গরু, মহিষ ও ছাগল প্রভৃতি হইতে দুধ পাইয়া থাকি।

দুগ্ধ পান করিলে মানবদেহ সুপুষ্ট ও সুগঠিত হইতে পারে; কারণ, দুগ্ধে মানবদেহ-পোষণকারী সর্বপ্রকার উপাদান বিদ্যমান। কাঁচাদুধ জাল-দেওয়া দুধ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য হইলেও উহা পান করা নিরাপদ্ নহে। দুগ্ধে অতি সহজেই নানাপ্রকার রোগের জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে। এজন্য দুগ্ধ ১০ মিনিট জাল দিয়া পান করা উচিত; কারণ, ১০ মিনিট জাল দিলে জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। অধিক উত্তাপ দিলে দুগ্ধের ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায় ও কিছুপরিমাণে গুরুপাক হয়। এইজন্য উহা সহজে পরিপাক হয় না। সুতরাং, অল্পক্ষণ জাল-দেওয়া ( এক বলক ) দুগ্ধই শরীরের পক্ষে উপকারী।

রোগগ্রস্ত গাভীর দুধ সাধারণত রোগের জীবাণুপূর্ণ থাকে; উহা পান করা নিরাপদ্ নহে। দোহনকারীর হাত ও দোহনপাত্র যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে দূষিত

পদার্থের সংস্পর্শে দুগ্ধও দূষিত হইয়া পড়ে। দুগ্ধের গন্ধাকর্ষণ-শক্তি আছে। কোন দুর্গন্ধ বা ধূমপরিপূর্ণ স্থানে রাখিলে উহা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত দুগ্ধ পান করা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

**ভাল দুগ্ধের লক্ষণ।**—একসের গোদুগ্ধে মোটামুটি ১½ কাঁচ্চা ছানা, ৩ কাঁচ্চা চিনি, ২½ কাঁচ্চা মাখন ও ½ কাঁচ্চা লবণ-জাতীয় উপাদান থাকে। খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের মূল্য খুবই বেশী। অনেকে বলেন, 'দুধ ও রক্ত একই পদার্থ; কেবলমাত্র বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ নাই।' দেহগঠনের সকল প্রকার উপাদান দুগ্ধে বর্তমান।

ল্যাক্টোমিটার ( Lactometer ) নামক যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দুগ্ধে অতিরিক্ত পরিমাণে জল মিশান আছে কিনা বুঝা যায়। দুগ্ধ দেখিয়া, আঘ্রাণ লইয়া এবং পাত্রের তলায় 'তলানি' আছে কিনা দেখিয়া দুগ্ধের কৃত্রিমতা কতকটা ধরিতে পারা যায়।

দুগ্ধের উপাদান ( শতকরা ভাগ )

| | আমিষ-জাতীয় | তৈল-জাতীয় | লবণ-জাতীয় | শর্করা-জাতীয় | জলীয় |
|---|---|---|---|---|---|
| গো-দুগ্ধ— | ৩·৬ | ৩·৭ | ০·৭০ | ৪·৯ | ৮৭ |
| ছাগ দুগ্ধ— | ৪·০০ | ৪·৮ | ০·৭৫ | ৪·৫ | ৮৬ |
| মহিষ-দুগ্ধ— | ৬·১১ | ৭·৫ | ০·৮৭ | ৪·০ | ৮১ |

## দুগ্ধজাত খাদ্য

**ক্ষীর।**—দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঘন হইলে, তাহার সহিত চিনি মিশাইয়া ক্ষীর প্রস্তুত হয়। ক্ষীর সুস্বাদু ও পুষ্টিকর, কিন্তু গুরুপাক। এজন্য অধিক পরিমাণে ক্ষীর খাইলে পেটের নানাপ্রকার পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

**দধি**—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে সামান্য অম্লরসযুক্ত সাঁজা বা দম্বল মিশাইয়া দধি প্রস্তুত হয়। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইবার সময় উহার শর্করা-জাতীয় উপাদান অম্লরসে পরিণত হয় বলিয়া দধি অম্লস্বাদযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট দধি শীতল ও মুখরোচক খাদ্য। ইহাতে প্রচুরপরিমাণে ভাইটামিন বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেসিনিকফ্ বলেন—'দধি ভোজন করিলে জীবনীশক্তি বাড়ে।'

**ঘোল**—দধি হইতে মাখন তুলিয়া লইলে ঘোল হয়। দুগ্ধের তৈল-জাতীয় উপাদান ভিন্ন অন্য সমস্ত উপাদানই ইহাতে পূর্ণমাত্রায় থাকে। তৈল-জাতীয় উপাদান না থাকায় ইহা লঘুপাক। ঘোল স্নিগ্ধকর ও পিপাসা-নাশক ; এইজন্য ঘোল রোগীরও পথ্য।

**মাখন**—দুগ্ধ এবং দধি মন্থন করিলে ইহাদের তৈল-জাতীয় উপাদান আলাদা হইয়া যায়। মন্থনশেষে উহা উপরে ভাসিতে থাকে। ইহাকেই মাখন বলে। ইহাতে প্রচুরপরিমাণে ভাইটামিন থাকে। টাট্‌কা মাখন সুস্বাদু, বলকারক, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য।

**ঘৃত**—মাখন জাল দিলে ঘৃত হয়। দুগ্ধের তৈল-জাতীয় পদার্থ ভিন্ন ঘৃতে আর কিছুই থাকে না। আমরা গব্যঘৃত ও মহিষাঘৃত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। মেদ-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃতই প্রধান।

**ছানা**—ফুটন্ত দুগ্ধে অম্লরস মিশাইলে ইহার আমিষ ও তৈল-জাতীয় উপাদান জল হইতে পৃথক্ হইয়া ছানাতে পরিণত হয়। ইহাতে দুগ্ধের তৈল-জাতীয় উপাদান ও আমিষ-উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। ছানা সুস্বাদ এবং অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ছানার জল রোগীর পথ্য।

ছানা হইতে সন্দেশ প্রভৃতি পুষ্টিকর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা খাইলে মাছ-মাংস খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। নিরামিষাশীদের পক্ষে ছানা একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য।

**সর**—জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধের উপরে একটি তৈলাক্ত আবরণ পড়ে, ইহাই দুধের সর। ইহাতে দুগ্ধের তৈল এবং শর্করা-জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। ইহা অতি সুস্বাদ এবং পুষ্টিকর।

## বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের অর্থাৎ মিশ্রখাদ্যের উপযোগিতা

**মিশ্রখাদ্যের উপকারিতা**—শরীর-গঠন এবং শারীরিক পুষ্টির জন্য আহারের প্রয়োজন। কেবলমাত্র একজাতীয় উপাদানের দ্বারা খাদ্যের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয় না। দুগ্ধ হইতে আমরা সর্বপ্রকার উপাদান পাই বটে, কিন্তু তাহাতে জলের ভাগ অধিক বলিয়া উহা পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না। সে অভাব পূরণ করিতে হইলে, উদর পূর্ণ করিয়া প্রচুর দুগ্ধ পানের আবশ্যক হয়। সুতরাং, মিশ্রিত খাদ্য আমাদের জীবনধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক; শরীরের পুষ্টিকর সকল সামগ্রী পাইবার জন্যই আমরা মিশ্রখাদ্য ( mixed diet ) গ্রহণ করি। খিচুড়িতে তাই চাউল, ডাল, ঘৃত, লবণ ও জল দেওয়া হয়। মাংসে শ্বেতসার-জাতীয় সামগ্রীর অভাব বলিয়া তাহাতে আলু দেওয়া হয়; ডাল দ্বারা ভাতের প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। মিশ্রখাদ্যে শরীরের পক্ষে আবশ্যক কোন সামগ্রীর একান্ত অভাব হয় না। অধিকন্তু, তাহাতে খাদ্য-সামগ্রী রুচিকর হইয়া থাকে। খাদ্য রুচিকর হইলে

উপকার আছে। রুচির সহিত যে খাদ্য আহার করা যায়, তাহা সহজে পরিপাক হয়, শরীরেও কোন গ্লানি থাকে না।

**খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন প্রয়োজন**—প্রত্যহ একই রকমের খাদ্যে অরুচি আসিবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, শরীরধারণের পক্ষে প্রোটিন যেমন আবশ্যক, তেমনি তৈল-জাতীয়, শর্করা-জাতীয়, জলীয়, শ্বেতসার-জাতীয় প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যেরই প্রয়োজন। শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে এ সকলই আবশ্যক। সেইজন্য একই জাতীয় আহার ত্যাগ করিয়া মিশ্রখাদ্য অর্থাৎ খাদ্যের যে উপকরণসমূহে সর্ববিধ পুষ্টিকর সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাই আহার করা প্রয়োজন। সকলেই সেইজন্য 'এক-ঘেয়ে' আহার বর্জনের পক্ষপাতী। আমিষ ও নিরামিষ উভয় শ্রেণীর খাদ্য একসঙ্গে খাওয়া ভাল। দেহকে কর্মক্ষম রাখিবার পক্ষে মিশ্রভোজন হিতকর।

বাঙ্গালীর খাদ্য আজকাল Balanced অর্থাৎ টাট্‌কা, পুষ্টিকর, উপকারী এবং সর্বরকমে লোভনীয় নহে। আমাদের খাদ্যে আজকাল প্রোটিনের দৈন্য সুস্পষ্ট। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রত্যহ প্রত্যেকের অন্তত ১০০ গ্র্যাম প্রোটিন খাওয়া প্রয়োজন। সেই ১০০ ভাগের মধ্যে ৪০ ভাগ জান্তব প্রোটিন হওয়া আবশ্যক। আজকাল বাঙ্গালীরা, খুব বেশী হয় তো, মাত্র ৭০ গ্র্যাম প্রোটিন খাইতে পান; তাহার মধ্যে জান্তব প্রোটিন মাত্র ষোল গ্র্যাম। এই প্রোটিনের স্থান অধিকার করিয়াছে—মসলায় এবং অম্লপ্রধান খাদ্যের বাহুল্যে। তাহার সঙ্গে আছে—শর্করার প্রাধান্য, আর ভেজালের বাহুল্য। অন্যদিকে ভাইটামিন-প্রধান খাদ্যেরও অভাব। কাজেই বাঙ্গালী যে স্বভাবত দুর্বল ও কর্মবিমুখ হইবে, তাহা আশ্চর্য নহে।

**খাদ্যে ভেজাল** ( Food Adulteration )

আমাদের দেশে আজকাল প্রায় সকল খাদ্য-সামগ্রীতেই অল্প-বিস্তর ভেজাল দেখিতে পাওয়া যায়। দুধ, ঘৃত, মাখন, তৈল প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের সহিত এত অধিক পরিমাণে ভেজাল থাকে যে, উহার মধ্যে আসল জিনিসের অস্তিত্ব পাওয়া কঠিন।

দুগ্ধের প্রধান ভেজাল জল। কলিকাতার বাহির হইতে সাধারণত যে সকল দুধ আমদানি হয়, তাহাতে পুষ্করিণীর অপরিষ্কৃত ও দূষিত জল মিশান থাকে। ঐ জলে কোন সংক্রামক ব্যাধির বীজ থাকিলে দুগ্ধপানকারীর ঐ সকল রোগ হইতে পারে। গো-জাতির মধ্যেও যক্ষ্মারোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক কালমিট্ সাহেব বলেন,—'গো-যক্ষ্মার বীজ-সংক্রামিত দুগ্ধ রীতিমত ফুটাইয়া লইলেও উহার ব্যবহারে ঘোর অনিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।'

আজকাল কল ( Lactometer ) দিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে দেখিয়া চতুর গোয়ালাগণ কিয়ৎপরিমাণ চিনি কিংবা কয়েকখানা বাতাসা জলমিশ্রিত দুগ্ধে যোগ করিয়া কলের পরীক্ষার ফল ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুগ্ধের সহিত কখন কখন ময়দা, এরোরুট বা দেশী পালো প্রভৃতি মিশাইয়া উহাকে ঘন করা হইয়া থাকে। এরূপ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে আইওডিন্ জল ( Iodine water ) যোগ করিলে তখনই নীলবর্ণ ধারণ করিবে।

মাখনের প্রধান ভেজালও জল। জল মিশাইলে মাখন ভারী হয় এবং উহার পরিমাণ বাড়ে। দধিও মাখনের একটি ভেজাল। মাখনের সহিত দধি মিশ্রিত করিলে মাখন শীঘ্র বিকৃত হইয়া যায়।

অনেক সময় মাখনের সহিত চর্বি ( Fat ) মিশাইয়া দেওয়া হয়। এরূপও শুনা যায় যে, কলা চট্‌কাইয়া এবং কচু সিদ্ধ করিয়া

মাখনের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। ঘৃত আমাদের নিত্যব্যবহার্য খাদ্য। কলিকাতা সহরে প্রতিবৎসরে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ঘৃত আমদানি হইয়া থাকে (Vide 'Food Adulteration in Calcutta'—Dr. Birendra Nath Ghosh)। এই ঘৃতের অধিকাংশ মহিষের দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন এবং অপরিষ্কার। পাহাড় অঞ্চলে যে বড় বড় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের চর্বিও সময় সময় ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয় বলিয়া শুনা যায়। পশ্চিম হইতে কলিকাতায় যে ঘৃতের আমদানি হয়, তাহার সহিত সাধারণত চীনা বাদামের তৈল, মহুয়ার তৈল বা পোস্তবীজের তৈল ভেজাল থাকে।

শুনা যায় যে, গন্ধ ও বর্ণহীন কেরোসিন-জাতীয় এক প্রকার বিদেশী তৈল (Petroleum Jelly) ঘৃতের সহিত কখন কখন মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। কলুরা সরিষার সহিত সোরগুঁজা মিশ্রিত করিয়া তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। আজকাল সরিষা তৈলের সহিত কেরোসিনের ন্যায় একপ্রকার মেটে তৈল (mineral oil) মিশাল দেওয়া হয়। এই মেটে তৈল মিশ্রিত সরিষার তৈল ব্যবহার করিলে পা-ফোলা (Epidemic Dropsy) অথবা বেরি-বেরি (Beri-Beri) ব্যাধি হইয়া থাকে।

ভেজাল সরিষার তৈল ঝাঁঝাল করিবার জন্য পেশাই করিবার সময় সরিষার সহিত সজিনার ছাল ও লঙ্কা মিশ্রিত করা হয়। ময়দার সহিত চাউলের গুঁড়া ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন বা নির্দিষ্ট পরিমাণ যব ও বিভিন্ন প্রকারের পালো ময়দার সহিত মিশান হয়। রামখড়ির গুঁড়া (French Chalk) গমের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভেজাল ময়দা তৈয়ারি করা হইয়া থাকে।

চাউলের দাম বাড়িলে উৎকৃষ্ট চাউলের সহিত নিকৃষ্ট চাউল বা কুঁড়া মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। নূতন চাউলের সহিত পুরাতন চাউল মিশাইয়া 'পুরাতন' বলিয়া বিক্রীত হয়।

বাজারের মিঠাই প্রস্তুত করিবার সময় অতি জঘন্য ঘৃত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় তৈল ও চর্বি একত্র মিশাইয়া এই সকল মিঠাই প্রস্তুত করে।

**খাদ্য ও ব্যাধি।**—সাধারণত অপরিমিত ভোজন বা যে কোন জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যহানিকর। কিন্তু খাদ্যের অল্পতা হইতেও যে রোগ জন্মিতে পারে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে গেলে যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে, তাহা হইতে তাপের উৎপত্তি হয়। এই তাপ হইতেই আমাদের কার্য করিবার ক্ষমতা আসে। সুতরাং, যদি এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা যায়, যাহার কার্যকরী শক্তি ( Energy ) বা যাহার তাপজনন ক্ষমতা ( Caloric contents ) কম, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে দেহের ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। শিশু, বালক ও যুবক, যাহাদের পূর্ণ বৃদ্ধি হয় নাই, তাহাদের পুষ্টি যদি স্বল্প হয়, তাহা হইলে আর তাহাদের বৃদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ বৃদ্ধি স্থগিত হওয়াকে 'ইন্‌ফ্যান্টিলিজম্‌' ( Infantilism ) বলে।

অল্প খাদ্য গ্রহণ করিতে করিতে শরীরের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া থাকে। এই কারণেই যাহাদের অল্প পুষ্টি হয়, তাহারা সাধারণত সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক সহজেই আক্রান্ত হইয়া থাকে। এইজন্য একটা প্রচলিত কথা আছে যে, "Plague dogs the footsteps of famine" অর্থাৎ মহামারী দুর্ভিক্ষের পথ অনুসরণ করে।

**নিকৃষ্ট খাদ্যের বিপদ্।**—খাদ্য নিকৃষ্ট, ভেজালযুক্ত বা ব্যাধির জীবাণুদুষ্ট হইলে আহারের উদ্দেশ্য-ত সিদ্ধ হয়ই না, বরং শরীরের প্রভূত অপকার হয়। শরীর-গঠন, ক্ষয়-পূরণ, তাপ-সংরক্ষণ, কার্যকরী ক্ষমতার সমতা-রক্ষণ এবং ব্যাধি-প্রতিরোধের ক্ষমতা অব্যাহত রাখা, ইহার কোনটিই নিকৃষ্ট খাদ্য দ্বারা সাধিত হয় না।

নিকৃষ্ট দুগ্ধে জলের ভাগ বেশী থাকায় এবং উহার প্রধান উপাদান ছানা, মাখন ও দুগ্ধ-শর্করার স্বল্পতা হেতু উহা দ্বারা উপযুক্ত পুষ্টিসাধন-তো হয়ই না, বরং ডোবা ও পুষ্করিণীর অপরিষ্কৃত ও দূষিত জল-মিশ্রিত দুগ্ধ নানা সংক্রামক ব্যাধির বীজ শরীরে প্রবেশ করায়। সংক্রামক ব্যাধির বীজ দুগ্ধে থাকিলে, দুগ্ধ-পানকারীর ঐ সকল রোগ হইতে পারে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গরুর দুগ্ধপানে যে ঐ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ভেজাল ঘৃত ও মাখনে নানাপ্রকার বিযাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অম্বল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহারে নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সরিষার তৈলে পাকড়া, সোরগুঁজা প্রভৃতি বিযাক্তদ্রব্যের তৈল ভেজাল থাকিলে বহু লোকের জীবন-সংশয় হইতে দেখা গিয়াছে। সরিষার তৈলের সহিত মেটে তৈল প্রভৃতির সংমিশ্রণ থাকিলে, পা-ফোলা, অর্থাৎ বেরি-বেরি-জাতীয় নানাপ্রকার রোগ সংক্রমিত হয় বলিয়া ডাক্তারেরা অনুমান করেন। বেরি-বেরি-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের তৈল-ব্যবহার বন্ধ করায় রোগের উপশম হইতে দেখা যাইতেছে।

গুদাম-পচা কিংবা কলে ছাঁটা ও কীটদষ্ট চাউল ভেজাল তৈলের মতই অনিষ্টকর। ডাক্তারেরা নিকৃষ্ট চাউলকে ভেজাল তৈলের মতই অখাদ্য বলিয়া মনে করেন।

মৎস্য, মাংস ও ডিম টাট্‌কা না হইলে বা পচা থাকিলে খাওয়া উচিত নহে। অনেক সময় ইহার ফলে কলেরার মত মারাত্মক ব্যাধি ( Ptomaine Poisoning ) হইতে দেখা যায়।

বাজারের মিঠাই বা চা'য়ের দোকানে প্রস্তুত সস্তা খাদ্যে ভেজালের আধিক্য দেখা যায়। তাহার ফলে নানাপ্রকার ব্যাধি আজকাল বাড়িয়া যাইতেছে।

খাদ্য সুসিদ্ধ না হইলে ও অত্যধিক পরিমাণে মসলা-ঘৃতাদি সংযুক্ত হইলে, সহজে হজম হয় না।

খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া ঢাকিয়া না রাখিলে, ধূলা, মাছি প্রভৃতি পড়িয়া উহাতে নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু ছড়াইয়া দেয়। খোলা অবস্থায় থাকিলে অনেক সময় বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি জীবজন্তু খাদ্যে মুখ দিয়া উহা বিষাক্ত করে। ফলে, কলেরা, টাইফয়েড্, রক্তামাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সংক্রমিত হয়।

## (খ) উপযুক্ত খাদ্য-নির্বাচন ও তাহার ব্যয়—

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আজকাল সাধারণ বাঙালীর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়াছে। ফলে, আমরা খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের এই দুর্বলতার কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। অনেকে বলেন,—পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলে, যথেষ্ট পয়সার প্রয়োজন ; আমাদের মত দরিদ্র এত পয়সা পাইবে কোথায় ? কিন্তু, আমরা যদি একটু বিবেচনা ও বিচার করিয়া আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের ব্যবস্থা করি, তবে আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয় না।

আজকাল অনেকেই প্রাতঃকালে জলযোগের সময় দুই পয়সার এক কাপ চা ও দুই পয়সার বিস্কুট বা ঐ রকম কিছু খাইয়া থাকেন এবং বলেন যে, অর্থাভাবের জন্যই বাধ্য হইয়া এইরকম কোনপ্রকারে জলযোগ করেন। দুঃখের বিষয়, চা'য়ের মধ্যে খাদ্যের উপযোগী কোন উপাদানই নাই ; কিন্তু, আধ পয়সার অঙ্কুরিত ছোলা খাইলে খরচ ত' কমই হয়, অধিকন্তু আহারের উদ্দেশ্যও সফল হয়। ছোলা দুষ্প্রাপ্য নহে, দুর্মূল্যও নহে। স্নুতরাং, কোন্ খাদ্যে কি কি উপাদান আছে তাহা জানিয়া প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা উচিত।

সকাল বেলা অঙ্কুরিত ছোলা ও গুড়, মুড়ি, চিড়ার সঙ্গে নারিকেল বা ফেন-ভাত—অবস্থায় কুলাইলে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মাখন—ইহাই সাধারণ বাঙালীর পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ বা প্রাতঃকালীন ভোজ্যদ্রব্য। যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা লুচি, হালুয়া, পরোটা, দুধ, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি খাইতে পারেন।

ভাত, ডাল, টাট্‌কা মাছ, শাক, তরকারি, লেবু, দুধ, কলা প্রভৃতি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পক্ষে প্রশস্ত। অবস্থায় কুলাইলে মাংস, ডিম, ছানা, দধি প্রভৃতিও খাওয়া যাইতে পারে।

আম, কলা, শশা, ফুটি, নারিকেল, কমলালেবু, বাতাবিলেবু, চিনাবাদাম প্রভৃতি ফল ঋতুভেদে বৈকালিক জলযোগের পক্ষে প্রশস্ত। এগুলি সহজপ্রাপ্য এবং দামেও সস্তা। অবস্থায় কুলাইলে, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্, আখরোট, আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি খাওয়া ভাল। ফল রক্ত-পরিষ্কারক এবং বলবর্ধক।

রাত্রির আহার ও দিনের আহার প্রায় একই রকম চলিতে পারে। রাত্রিতে আহারের পরিমাণ কিছু কম হওয়াই উচিত।

আমরা প্রতিদিন সাধারণত চারি বার খাদ্য গ্রহণ করি। সকালে ও বৈকালে জলযোগ করি; মধ্যাহ্নে ও রাত্রে পূর্ণ-আহার গ্রহণ করি। শহরে ও পল্লীতে কোন্ সময়ে কোন্ খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহাই বলিতেছি।

**সকালে**—অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ, মুড়ি, চিড়া ( কাঁচা ও ভাজা ), আদা, লবণ, পিঁয়াজ, রসুন, সালাদ্-শাক, শশা, গুড় বা চিনি ইত্যাদি।

**মধ্যাহ্নে**—ফেন-সহিত ভাত, ডাল, মাছ, ডিম, শাক, তরকারি, খিঁচুড়ি, লেবু, দই, দুধ ইত্যাদি।

**বৈকালে**—নানাবিধ ফল, শাঁক-আলু, রাঙ্গাআলু, শশা, কলা, ছানা, সন্দেশ ইত্যাদি এবং সকাল বেলার ন্যায় অন্যান্য দ্রব্যাদি।

**রাত্রে**—ফেন-সহিত ভাত বা খিঁচুড়ি, ডাল, মাছ, তরকারি, রুটি, লুচি, দুধ, মাংস ইত্যাদি।

শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং যথোচিত পুষ্টির জন্য আমিষ, শর্করা, তৈল, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একজন বাঙালীর স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য প্রতিদিন তাহার খাদ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্নজাতীয় উপাদান থাকা প্রয়োজন :—

১। আমিষ-জাতীয় ( উপাদান )—দেড় হইতে দুই ছটাক।

২। তৈল-জাতীয় ( উপাদান )—দেড় ছটাক।

৩। শর্করা-জাতীয় ( উপাদান )—সাড়ে সাত ছটাক।

৪। লবণ-জাতীয় ( উপাদান )—অর্ধ ছটাক।

পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত উপাদানসমূহ নিম্নোক্ত সাধারণ খাদ্যে পাওয়া যায় :—

| খাদ্যদ্রব্য | পরিমাণ |
|---|---|
| ১। দুগ্ধ | অর্ধ সের হইতে এক সের |
| ২। চাউল | এক পোয়া হইতে দেড় পোয়া |
| ৩। ডাল | দেড় ছটাক |
| ৪। আটা | এক পোয়া |
| ৫। মাখন বা ঘৃত | এক তোলা |
| ৬। তৈল | এক তোলা |
| ৭। তরকারি | দেড় পোয়া |
| ৮। মাছ | আড়াই ছটাক |
| ৯। লবণ | অর্ধ ছটাক |
| ১০। চিনি বা গুড় | অর্ধ ছটাক |

এই সকল খাদ্যদ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে লেবু, তেঁতুল বা অন্য কোন প্রকার টক এবং সাধ্যমত শশা, কলা প্রভৃতি ফল কিছু খাওয়া ভাল।

উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলে খাদ্যদ্রব্য যত মহার্ঘই হউক না কেন, জনপ্রতি বয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক তিন আনা হইতে চারি আনা মাত্র ব্যয় পড়িতে পারে। তবে, সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে সাধারণত গৃহে দুগ্ধবতী গাভী সংরক্ষণ করা যায়, গোলাভরা ধান, পুকুরে মাছ প্রভৃতির সুব্যবস্থা আছে এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় তরি-তরকারীর বাগান আছে—সেখানে একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক মাত্র ছয় পয়সা ব্যয়ে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা সত্যই সম্ভব এবং তাহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র নহে।

শহরে একজন মধ্যবিত্ত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য-তালিকা ও তাহার ব্যয়—

**জল-খাবার দৈনিক দুই বার ( সকালে ও বৈকালে ) ঃ—**

| খাদ্য সামগ্রী | মূল্য |
|---|---|
| অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ, ভাজা-চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, খই, কলা, গুড়, নারিকেল, বিবিধ ফল ( যখন যেমন ) | ৵৫ |

**পূর্ণ আহার দৈনিক দুই বার ( মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে ) ঃ—**

| খাদ্য সামগ্রী | পরিমাণ | মূল্য |
|---|---|---|
| চাউল ( ঢেঁকি ছাঁটা ) | ৩ ছটাক | ৵০ |
| লাল আটা (যাঁতা-ভাঙা ) | ৫ ছটাক | |
| ডাল | ১½ ছটাক | ৶৫ |
| মাছ, মাংস, ছানা | ১ ছটাক | ৵০ |
| তরি-তরকারি | ৪ ছটাক | ৶১০ |
| ঘৃত | ½ ছটাক | ৶১৫ |
| সয়াবিন | ১ ছটাক | ৶৭॥ |
| গুড়, লবণ, মসলা | — | ৶৭॥ |

জনপ্রতি দৈনিক ব্যয় সাড়ে পাঁচ আনা মাত্র ।৵১০

একসঙ্গে বেশী লোক খাইলে ব্যয় ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা পড়িবে।

পল্লীগ্রামে এই ব্যয় অনেক কম পড়িবে।

**(গ) ভাঁড়ার-ঘরের ( store-rooms ) সুব্যবস্থা, খাদ্য-সামগ্রীর সংরক্ষণ ও নির্বাচন—**

আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের সুব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ভাঁড়ার-ঘরে ইঁদুর, আরশুলা ও কীটপতঙ্গাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়া থাকে। পাকা মেঝে ও দৃঢ় গাঁথুনির দেওয়াল থাকিলে ঘর স্যাঁৎসেঁতে হয় না এবং খাদ্য-সামগ্রীও ভাল থাকে।

আমাদের ভাঁড়ার-ঘরে আমরা চাউল, ডাল, আটা, ময়দা, তেল, ঘি, মসলা প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী রাখিয়া থাকি। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য-সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ পরিষ্কৃত পাত্রে রাখা উচিত। পাত্রের মুখ সর্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য জালযুক্ত আলমারি, তাক, মাচা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। খাদ্য-সামগ্রী উপযুক্ত স্থানে সর্বদা সুসজ্জিতভাবে রাখিবে। মসলা রাখিবার পাত্রের গায়ে উহাদের নামের 'লেবেল' দিয়া রাখিলে, রন্ধন করিবার সময় কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। দৈনন্দিন রন্ধনকার্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী ভাঁড়ার-ঘর হইতে পরিমাণমত বাহির করিয়া লইবে। কোনও দ্রব্য ফুরাইয়া গেলে পুনরায় যথাসময়ে কিনিয়া আনিয়া তাহার স্থান পূরণ করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য সর্বদা তাহার নির্দিষ্ট স্থানেই রাখিয়া দিবে। দ্রব্যাদি যথাস্থানে না থাকিলে, বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। খাদ্য-সামগ্রী যাহাতে দীর্ঘদিন ভাল ও অবিকৃত থাকে তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন লইবে।

ভাঁড়ার-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে ভালরূপে আলো-বাতাস খেলিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দরজা-জানালার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

প্রতিদিন ভাঁড়ার-ঘর ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিবে। তৈল ও ঘৃতাদি ফুরাইলে উহার পাত্রগুলি ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় ঘৃতাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

যাহাতে কোনও দ্রব্যের অপচয় না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সামান্য অবহেলার জন্য যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

ভাঁড়ার-ঘরের সুব্যবস্থা থাকিলে, রন্ধনকার্যে সুবিধা ঘটে। ইহা গৃহস্থালীর একটি প্রধান কার্য।

গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর নির্বাচন ও সংরক্ষণ বিষয়ে বলিতেছি :—

**চাউল।**—চাউল প্রস্তুত হইলে যাহাতে সে চাউলে আর্দ্রতা স্পর্শ করিতে না পারে, সেজন্য ভূমি হইতে উচ্চে চাউলগুলি কোন শুষ্কপাত্রে রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। চাউল রাখিবার জন্য মৃৎপাত্র, মাটির জালা ইত্যাদি বা বস্তা ভাল।

আতপ চাউল অনেক পরিমাণে একসঙ্গে প্রস্তুত করিয়া রাখিলে প্রায়ই দীর্ঘ সময় ভাল থাকে না ; কারণ, উহা সত্বর আর্দ্রতা আকর্ষণ করিয়া বিকৃত হইয়া পড়ে ও ব্যাধির কারণ হইতে পারে। সুতরাং, আতপ চাউল অল্প অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করাই ভাল। তবে, অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইলে ইহার সহিত কিছু গুঁড়া চূণ মিশাইয়া রাখিলে কিছুদিন ভাল থাকে।

সিদ্ধ চাউলের প্রতিমণে পাঁচপোয়া গুঁড়া চূণ মিশাইয়া বস্তাবন্দি করিয়া অথবা বড় মাটির জালায় রাখিলে ভাল থাকে। গুঁড়া চূণ দিলে চাউলে আর্দ্রতা স্পর্শ করে না, পোকাও ধরে না। বেশী চূণ দিলে চাউল লালবর্ণ হয়, কিন্তু চাউলের তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

চাউল যত পুরাতন হয়, পোকার উপদ্রবও তত বাড়ে। এমতাবস্থায় বড় বড় কাচের পাত্রে চাউল রাখিয়া শুষ্ক অথচ অন্ধকারময় স্থানে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এইরূপে রোগীর জন্য পুরাতন চাউল সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে।

ডাল, ময়দা, আটা, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যও এই প্রকারে কাচের পাত্রে বা ঢাকনাযুক্ত টিনে রাখিলে বেশ ভাল থাকে।

**লবণ।**—কাঁসা, পিতল, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি কোন ধাতুপাত্রে লবণ রাখা উচিত নহে। মাটির পাত্র, চীনামাটির জার বা কাঠের পাত্রই লবণ রাখিবার পক্ষে ভাল। বর্ষাকালে লবণ গলিয়া জল হইয়া যায়, কারণ, ইহা বাহিরের আর্দ্রতা আকর্ষণ করে। সুতরাং, তখন লবণের পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

**চিনি বা গুড়।**—টিনের পাত্রে মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে, নতুবা উহার মধ্যে পিঁপড়া, তেলাপোকা ইত্যাদি যাইতে পারে।

**মসলা।**—টিনের কৌটায় বা কাচের শিশিতে রাখিলে ভাল থাকে।

**মাছ।**—কৈ, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছ জীবিত অবস্থায় কিনিয়া আনিয়া জলে রাখিবে এবং রোজ জল বদলাইয়া দিবে; তাহা হইলে কয়েকদিন ভাল থাকিবে।

**তরকারি।**—তরকারি ও শাক ইত্যাদি টাট্‌কা খাওয়াই ভাল। শাক ঘরে রাখিয়া খাওয়া চলে না। বেগুন, পটোল, কাঁচকলা, কপি প্রভৃতি তরকারি ২।৪ দিন ঘরে রাখিয়াও খাওয়া চলিতে পারে; তবে, শুষ্ক হইলে বা কোনরূপে পচিয়া গেলে কিংবা ইঁদুর ইত্যাদিতে খাইলে খাওয়া উচিত নহে। এগুলি খোলা বাতাসে রাখিলে ভাল থাকে। আলু, কচু, ওল প্রভৃতি তরকারি অনেকদিন ভাল রাখা যায়। ঘরের

শুষ্ক মেঝেতে বালি ছড়াইয়া তাহার উপর খুব পাতলা করিয়া ঢালিয়া রাখিলে আলু অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। মধ্যে মধ্যে উহা হইতে খারাপ আলু বাছিয়া ফেলিয়া দিবে। মিষ্টিকুমড়া ও চালকুমড়া শিকায় ঝুলাইয়া রাখিলে অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

**আচার, মোরব্বা, আমসত্ত্ব।**—প্রভৃতি দ্রব্য চীনামাটির জারে বা কাচের পাত্রে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। তাহা হইলে ভাল থাকিবে। বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি দ্রব্য টিনের পাত্রে ঢাকনা দিয়া রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। জ্বাল-দেওয়া দুধ কাঁসা বা কাচের পাত্রে রাখিলে ভাল থাকে।

**মিঠাই।**—কাচের আলমারিতে বা লোহার জালযুক্ত আলমারিতে রাখিবে। ইহাতে ধূলাবালি, মাছি প্রভৃতি যাহাতে না পড়ে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

**ভাত, ডাল ও অন্যবিধ তরকারি।**—এই সকল দ্রব্য রাঁধিয়া টাট্‌কা খাওয়াই ভাল। শীতের সময় এক বেলার রাঁধা জিনিস অপর বেলায় খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু গরমের সময় এক বেলার জিনিস অন্য বেলায় টক্ হইয়া যায়। রাঁধা জিনিসে হাত দিতে নাই বা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে নাই, তাহাতে উহা নষ্ট হইয়া যায়।

আজকাল রাঁধা খাদ্য-সামগ্রী, প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ও মাংস প্রভৃতি একাধিক দিন অবিকৃত ও ভাল রাখিবার জন্য ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা ও **"কেলভিনেটর"**—নামক যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ প্রচলিত হইতেছে। এ প্রথা ভাল।

রাঁধা-জিনিসপত্র অবস্থাবিশেষে উঁচু কাঠ বা বাঁশের মাচা বা জালযুক্ত আলমারি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রক্ষা করা উচিত। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মেঝের সংস্পর্শে যত কম

আসে ততই ভাল; কারণ, মেঝের ধূলা, পায়ের ময়লা, আবর্জনা, বা স্যাঁৎসেঁতে স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য দূরে রাখাই প্রয়োজন।

যাহাতে রাঁধা-জিনিস মাত্রেই মাছি বসিতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

**গৃহে খাদ্য-সামগ্রী নির্বাচন** (Planning menu for the home)।—যে সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী আহার্যরূপে গৃহীত হয় তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। যথা,—

**চাউল**।—ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। চাউল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। চাউলে শর্করা জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। আশু, বোরো ও আমন প্রভৃতি নানা জাতীয় ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত হয়। আমন ধানের চাউলই সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য।

চাউল দুই প্রকার, আতপ ও সিদ্ধ। ধান রৌদ্রে শুকাইয়া তুষ ছাড়াইয়া লইলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল বলে। জলে সিদ্ধ করিয়া, সিদ্ধ ধান শুকাইয়া তুষ ছাড়াইলে যে চাউল হয়, তাহাকে সিদ্ধ চাউল বলে। ধান সিদ্ধ করিলে, তাহার ভাইটামিন কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিক উপকারী। ধানের খোসার ঠিক নীচে, চাউলের উপরে একটা আবরণ থাকে, উহা ভাইটামিনে পরিপূর্ণ। চাউল বেশী ছাঁটা ও মাজা হইলে এই আবরণ নষ্ট হইয়া যায়; এইজন্য কল-ছাঁটা চাউলে ভাইটামিন থাকে না। ভাইটামিনশূন্য চাউলের ব্যবহারে বেরি-বেরি ও নানাপ্রকার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

ভাত রাঁধিবার সময় অতিশয় সাবধান হওয়া উচিত। চাউলে এইরূপ পরিমাণে জল দেওয়া উচিত, যাহাতে ভাত সুসিদ্ধ হওয়ার পরে আর জল অবশিষ্ট না থাকে। রন্ধনপাত্র সর্বদা ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য।

কারণ, উত্তাপ এবং বায়ুর সংস্পর্শে ভাইটামিন বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ভাতের ফেন ( মাড় ) ফেলিয়া দিলে, উহার সহিতও চাউলের সারাংশ এবং ভাইটামিন অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়।

ধান এবং চাউল শুষ্ক এবং আলো-বাতাসপূর্ণ স্থানে রাখিতে হয়। ভিজা বা স্যাঁৎসেঁতে স্থানে রাখিলে উহা বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

**ডাল।**—ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা আমিষ-জাতীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। যাহারা নিরামিষাশী, অথবা যাহাদের পক্ষে মাছ, মাংস সংগ্রহ করা কষ্টকর, তাহাদের প্রচুর পরিমাণে ডাল খাওয়া আবশ্যক। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ডাল অতি সহজেই পরিপাক করা যায়; কিন্তু সুসিদ্ধ না হইলে ইহা অতিশয় দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে।

মুগ, মসুর, অড়হর, ছোলা, কলাই, খেসারি প্রভৃতি বহু প্রকারের ডাল আছে।

অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন থাকে। ইহারা সহজপাচ্যও বটে। এইজন্য প্রতিদিন কতক পরিমাণে এই সকল খাদ্য গ্রহণ করা শরীরের পক্ষে হিতকর।

গোটা মুগ ও মসুরডালের যুষ ( ঝোল ) অতীব বলকারক এবং সহজপাচ্য; এইজন্য রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

**খিঁচুড়ি।**—চাউল ও ডাল একত্র মিশাইয়া রন্ধন করিলে খিঁচুড়ি প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সারবান্ এবং উপাদেয় খাদ্য। ইহাতে চাউল এবং ডালের সকল উপাদান ও গুণ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে, অধিকন্তু, অতি অল্প মসলা দ্বারা রন্ধন করিলে ইহা সহজপাচ্যও হয়। চাউল, ডালে তৈল-জাতীয় উপাদান কম থাকে, এইজন্য খিঁচুড়িতে প্রয়োজনমত মাখন বা ঘৃত মিশাইয়া লইতে হয়।

**সুজি, আটা ও ময়দা।**—গোধূম বা গম হইতে সুজি, আটা ও ময়দা প্রস্তুত হয়। গমে চাউল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমিষ ও তৈল-জাতীয় উপাদান থাকায় ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক; কিন্তু, অতীব পুষ্টিকর।

গমের বাহিরের আবরণযুক্ত মোটা অংশ হইতে সুজি প্রস্তুত হয়। গমের এই অংশ সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। সুজির হালুয়া এবং মোহনভোগ পুষ্টিকর ও সুস্বাদ।

গমের দ্বিতীয় স্তর হইতে সাদা আটা প্রস্তুত হয়। ইহা কিঞ্চিৎ লঘুপাক। গমের প্রথম ও দ্বিতীয়, এই উভয় স্তর হইতে যে আটা প্রস্তুত হয় উহার রং ঈষৎ লাল এবং ইহা সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ও সুস্বাদ। এই আটা সুজি অপেক্ষা লঘুপাক; এই জন্য এই আটাই সর্বদা ব্যবহার করা উচিত। এই আটাতে গমের ভাইটামিন পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

কলের প্রস্তুত আটা অপেক্ষা যাঁতায় ভাঙা আটা অধিক হিতকর; কারণ, কলের পেষণ ও উহার আভ্যন্তরিক উত্তাপে গমের ভাইটামিন অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যাঁতায় তাহা হয় না।

গমের একেবারে ভিতরের অংশ হইতে ময়দা প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভাইটামিন অতি সামান্যই থাকে। এজন্য ময়দা, আটা ও সুজি অপেক্ষা লঘুপাক ও অপেক্ষাকৃত কম পুষ্টিকর।

**রুটি।**—আটা ও ময়দা উভয় সামগ্রী হইতেই রুটি প্রস্তুত হয়। রুটি ভালরূপে সেকা না হইলে ভাল সিদ্ধ হয় না, সুতরাং অত্যন্ত গুরুপাক হয়। সুসিদ্ধ রুটি লঘুপাক।

**লুচি।**—আটা ও ময়দা, উভয় বস্তু হইতেই লুচি প্রস্তুত করা যায়। লুচি রুটি হইতে কিঞ্চিৎ লঘুপাক; কারণ, ঘৃতে ভাজার

দরুণ ইহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু, যাহাদের ঘৃত সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে লুচি খাওয়া উচিত নহে। ময়দা অপেক্ষা আটার লুচি বেশী উপকারী।

**পাঁউরুটি**।—আটা বা ময়দা বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাখিয়া ও সেঁকিয়া পাঁউরুটি প্রস্তুত হয়। পাঁউরুটির অভ্যন্তর ভাগ অতীব কোমল; এই জন্য ইহা লঘুপাক এবং সুস্বাদ। রোগীদের পক্ষে সাধারণ রুটি বা লুচি অপেক্ষা পাঁউরুটি অধিক হিতকর।

**যব**।—যব খুব পুষ্টিকর খাদ্য। আমরা সাধারণত ইহার ছাতু খাইয়া থাকি। ইহাতে আমিষ-জাতীয় উপাদান গম হইতে কিঞ্চিৎ কম থাকিলেও তৈল ও লবণ-জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আছে। ইহা সহজপাচ্য, সুস্বাদ ও বলকারক। যবের ছাতুর সরবৎ অতি স্নিগ্ধ, শীতল ও লঘুপাক।

যব হইতেই সাধারণ বার্লি প্রস্তুত হয়।

**মৎস্য**।—আমাদের বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ বাঙালীই ইহা আদরের সহিত আহার করিয়া থাকেন। মাছ-ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য।

টাট্‌কা মাছ সর্বদা খাওয়া উচিত। টাট্‌কা মাছ সুস্বাদ, সহজপাচ্য ও বলকারী। টাট্‌কা মাছের শরীর শক্ত ও কান্‌কো লাল থাকে, এবং ইহাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকে না। পচা মাছ কখনও খাওয়া উচিত নহে; ইহা দুষ্পাচ্য। পচা মাছ খাইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে।

কই, মাগুর, শিঙি, মৌরলা প্রভৃতি ছোট মাছে তৈলাংশ কম থাকে বলিয়া ইহারা বড় মাছ অপেক্ষা লঘুপাক। এজন্য ছোট মাছই রোগীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

**বৃহৎ মৎস্য।**—রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ যত বড় হয়, ততই অধিক চর্বি-বিশিষ্ট হয়। এই জন্য ইহারা ছোট মাছের ন্যায় লঘুপাক নহে। রুই, কাতলাও ছোট থাকিতে লঘুপাক ও বলকারক থাকে। মাছের মধ্যে রুই মাছই সর্বাপেক্ষা উপকারী।

**ইলিশ মাছ।**—ইলিশ মাছ রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ অপেক্ষা গুরুপাক; কারণ রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ অপেক্ষা ইহাতে তৈলাংশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু, ইলিশ মাছ অন্য মাছ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং ইহাতে প্রচুর ভাইটামিন থাকে।

**মৎস্য-ডিম্ব ও মাছের তৈল।**—মাছের ডিম ও তৈল অতীব পুষ্টিকর ও বলকারক; অধিকন্তু, ইহাতে প্রচুর ভাইটামিন বিদ্যমান।

**মাংস।**—মাংস আমিষ-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রধান। ইহা সুস্বাদ এবং অতীব বলকারক। শর্করা-জাতীয় উপাদান ভিন্ন, আমাদের শরীর-পোষণোপযোগী সকল উপাদানই মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অতি পুষ্টিকর ও উত্তেজক বলিয়া, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই ইহা আদরের সহিত ভোজন করে।

নানা কারণে মাংসের উপাদান ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। পশু-শাবকের মাংস অপেক্ষা যুবা পশুর মাংস অধিক পুষ্টিকর ও সুস্বাদ। বৃদ্ধ পশুর মাংস সহজে হজম হয় না বলিয়া অভক্ষ্য।

পশু হত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে ইহার শরীর কঠিন হয়। কিছুকাল কঠিন অবস্থায় থাকিবার পরে, উহা পুনরায় কোমল হয়। কঠিন অবস্থায় রন্ধন করিলে মাংস সুসিদ্ধ হয় না বলিয়া সহজে পরিপাক হয় না। এইজন্য কোমল অবস্থায় না আসা পর্যন্ত মাংস রন্ধন করা উচিত নহে।

পশুর শরীরে কোন ব্যাধি থাকিলে উহার মাংসও দোষযুক্ত হয়। এজন্য অসুস্থ পশুর মাংস খাইতে নাই। টাট্‌কা মাংস দেখিতে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। পচা মাংসে অপ্রীতিকর গন্ধ অনুভূত হয়, এবং উহা ভোজন করিলে শরীরে বিষক্রিয়া হয়। গৃহপালিত পশুর মাংসে বন্যপশু অপেক্ষা চর্বি কম থাকে বলিয়া ইহার মাংস অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য।

**ছাগ-মাংস।** ছাগ-মাংস বলকারক ও লঘুপাক। আমাদের দেশে ছাগ-মাংসই খাদ্যরূপে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**মেষ-মাংস।**—অধিক পরিমাণে চবি থাকে বলিয়া মেষ-মাংস অত্যন্ত গুরুপাক।

**পক্ষি-মাংস।**—পক্ষি-মাংস লঘুপাক। কুক্কুট-মাংসে আমিষ-জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে, এবং চর্বি কম থাকে বলিয়া ইহা অত্যন্ত লঘুপাক। হাঁসের মাংসে চর্বি বেশী বলিয়া কুক্কুট-মাংস অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। ঘুঘু, হরিয়াল, বেলেহাঁস প্রভৃতি পক্ষীর মাংস পুষ্টিকর এবং লঘুপাক।

**ডিম্ব।**—খাদ্য হিসাবে হাঁস ও মুরগীর ডিম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শর্করা-জাতীয় উপাদান ভিন্ন, মনুষ্যদেহ-গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদানই ডিমে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। মাছ ও পশুদেহে অনেক সময় নানাপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থ থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু, ডিমে সেই সকল পদার্থ কখন দেখা যায় না। ডিমের শ্বেতাংশ অপেক্ষা হরিদ্রাংশে আমিষ, তৈল ও লবণ জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। শ্বেতাংশে প্রচুরপরিমাণে 'য়্যালবুমেন' নামক আমিষ-জাতীয় উপাদান থাকে। ইহা আগুনের উত্তাপে সহজেই জমিয়া যায়। সিদ্ধ অথবা রন্ধন-করা ডিম অপেক্ষা কাঁচা ডিম সহজে পরিপাক হয়।

অধিকক্ষণ সিদ্ধ করা ডিম অপেক্ষা অল্পক্ষণ সিদ্ধ করা ( Half-boiled ) ডিম লঘুপাক ও পুষ্টিকর ; এইজন্য অল্পক্ষণ সিদ্ধ করা ডিমই খাওয়া উচিত।

পচা ডিম শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এজন্য, রন্ধন করিবার পূর্বেই ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া দরকার যে, ডিম পচা কি ভাল। অর্ধ সের জলে এক ছটাক লবণ মিশাইয়া তাহাতে ডিম ছাড়িয়া দিলে, যদি ডিম ডুবিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে ডিম ভাল আছে। অনেকদিন অবিকৃত রাখিতে হইলে চূণ, বালি, ভূষি প্রভৃতির ভিতর ডিম রাখিতে হয়। ডিমের উপর তৈল মাখাইয়া রাখিলেও ইহা অনেক দিন ভাল থাকে।

**তরি-তরকারি**।—উদ্ভিদ্‌গণ বায়ু ও মাটি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাণ্ড, পত্র, মূল ও ফলে সঞ্চিত রাখে। তরকারি মাত্রেই লবণ-জাতীয় উপাদান ও ভাইটামিন আছে বলিয়া নিয়মিতভাবে উপযুক্ত পরিমাণে শাক-সব্জি আহার করিলে আমাদের শরীরের রক্ত পরিষ্কার থাকে। অনেকদিন টাট্‌কা ফল ও শাক-সব্জি না খাইলে শরীরে ভাইটামিনের অভাবজনিত 'স্বার্ভি' রোগ হইতে দেখা যায়।

**আলু**।—আলুর মধ্যে শরীররক্ষার উপযোগী সকল প্রকার উপাদান বর্তমান থাকায়, ইহা অতি পুষ্টিকর। আলুর খোসায় লবণ-জাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন বেশী থাকে বলিয়া ইহার খোসা বাদ দিয়া সিদ্ধ করা উচিত নহে। তাহাতে ইহার পুষ্টিকারিতা কমিয়া যায়। সুসিদ্ধ না হইলে ইহা সহজে পরিপাক হয় না। যে আলু সিদ্ধ করিলে কোমল হয়, তাহাই উত্তম আলু।

ভাজা আলু গুরুপাক, সিদ্ধ করা আলু তদপেক্ষা লঘুপাক এবং পোড়ান আলু সর্বাপেক্ষা লঘুপাক।

মটরশুঁটি, বরবটি, শিম প্রভৃতি তরকারিতে আমিষ-জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ডাল-জাতীয় খাদ্য বলিয়া ইহারা সমধিক পুষ্টিকর।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, ধুঁধুল প্রভৃতি তরকারিতে শরীর-রক্ষণোপযোগী উপাদান অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ইহাদের মধ্যে জলীয় ভাগই বেশী। মিষ্টি-কুমড়ায় শর্করা-জাতীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী আছে।

কাঁচকলা, মোচা, ইচড় ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারি অতি হিতকারী। ইহাদের মধ্যে লৌহ-জাতীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় ইহারা রক্ত শোধন করে।

মানকচু এবং ওল অর্শ, উদরি, শোথ প্রভৃতি রোগে উপকারী; এজন্য রোগীর পথ্য। পটোল ও ঢেঁড়শ অতি সহজে হজম হয় বলিয়া রোগীর পথ্যরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে খাদ্যপ্রাণ বেশী থাকে।

কাঁটালের বীজ অতি উত্তম খাদ্য। ইহাতে আমিষ-জাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

হিঞ্চে, উচ্ছে, পলতা, নিমপাতা প্রভৃতি তিক্তরসযুক্ত তরকারি। ইহারা পাকস্থলী ও যকৃতের কার্যকারিতা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উহাদিগকে সবল করে। ক্ষুধা এবং রুচি বৃদ্ধি করাও এই জাতীয় তরকারির বিশেষ গুণ।

**শাক।**—শাক মাত্রেই প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন বিদ্যমান। সবুজপত্রে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে বলিয়া, ইহা আহার করা বিশেষ প্রয়োজন। শাক পাকিয়া গেলে সহজে হজম হয় না, সেজন্য পাকা শাক কোন কারণেই আহার করা উচিত নহে। সহজপাচ্য ও সুস্বাদ বলিয়া সর্বদা টাট্‌কা শাক খাওয়া উচিত।

শাকের মধ্যে প্রায়ই নানাপ্রকার পোকা, পোকার বাসা ও ডিম প্রভৃতি দূষিত পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। এইজন্য রন্ধনের পূর্বে শাক উত্তমরূপে ঝাড়িয়া, বাছিয়া ধৌত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

**পেঁয়াজ ও রশুন।**—পেঁয়াজ কাঁচা খাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য খাদ্য মুখরোচক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। খাদ্য হিসাবে ইহারা খুব বেশী পুষ্টিকর নহে, কিন্তু ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন থাকে বলিয়া, মাঝে মাঝে কাচা পেঁয়াজ ও রশুন খাওয়া ভাল। ইহা আজকাল রোগের ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হইতেছে।

**মসলা।**—খাদ্যদ্রব্য মুখরোচক ও সুস্বাদ করিবার জন্য রন্ধনের সময় নানাবিধ মসলা যোগ করা হয়। খাদ্য হিসাবে মসলার কোনই গুণ নাই; তবে, ইহাদের সহযোগে অন্যান্য খাদ্য সুস্বাদ ও মুখরোচক হইলে আহারকালে মুখে প্রচুর লালা নিঃসৃত হইয়া হজমের সহায়তা করে। কিন্তু, অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে মসলা পাকস্থলীকে উত্তেজিত করিয়া হজমের ব্যাঘাত ঘটায়। সর্বদা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি আহার করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

**ফল।**—ফলমাত্রেই সুস্বাদ এবং অতিশয় উপকারী। নানাপ্রকার আস্বাদযুক্ত ফলে অম্ল, শর্করা ও লবণ জাতীয় নানা উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়া ইহারা মুখরোচক, পুষ্টিকর, বলকারক ও রক্ত-পরিষ্কারক।

ফল সুপক্ক হওয়া দরকার। কাঁচা ফল সহজে হজম হয় না বলিয়া নানাবিধ রোগের কারণ হইয়া থাকে। আবার, অতিরিক্ত পাকা ফলও ভাল নহে। অতিরিক্ত পাকা ফলে, বাহির হইতে দেখা না গেলেও ভিতরে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়; সুতরাং, এইরূপ বিকৃত ফল খাওয়া উচিত নহে।

ফলের খোসা, আঁশ ও বীজ সহজে হজম হয় না ; এইজন্য ফলের এই সকল অংশ না খাওয়াই উচিত। অনেক সময় ফলের গায়ে নানাপ্রকার ধূলা, বালি প্রভৃতি ময়লা লাগিয়া থাকে। উহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার রোগজীবাণু থাকাও অসম্ভব নয়। এইজন্য ফল পরিষ্কার জলে ধুইয়া খাওয়া উচিত।

**আম**।—আম সকল ফলের মধ্যে অধিক মুখরোচক। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা-জাতীয় উপাদান থাকায় ইহা অতীব হিতকারী। অধিকন্তু, ইহা কাঁটাল প্রভৃতি অপেক্ষা লঘুপাক। আম পুষ্টিকর, বল, মেধা ও কান্তিবর্ধক এবং কোষ্ঠ-পরিষ্কারক।

**কাঁটাল**।—কাঁটাল অতি পুষ্টিকর, কিন্তু গুরুপাক। কাঁটালের বীজ আলু অপেক্ষাও অধিকতর পুষ্টিকর। কাঁচা কাঁটালকে ইচড় বলে। ইচড় খুব পুষ্টিকর তরকারি, কিন্তু গুরুপাক।

**পেঁপে**।—পেঁপে পুষ্টিকর ও যকৃতের ক্রিয়াবর্ধনকারী। যাবতীয় যকৃতরোগে ইহা পরম হিতকারী। কাঁচা পেঁপে অতি উপাদেয় তরকারি। ইহাতে 'পেপিন' নামক একপ্রকার পাচক পদার্থ আছে। ইহা তরকারি ও আমিষ-জাতীয় খাদ্য পরিপাক করিতে সহায়তা করে। পেঁপে বলকারক, ক্ষুধাবর্ধক, শীতল ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক।

**কলা**।—পাকা কলা অতি পুষ্টিকর ফল। আমাদের শরীর-ধারণোপযোগী সমস্ত উপাদানই পাকা কলায় অল্পাধিক বিদ্যমান। প্রত্যহ কিছু পরিমাণে কলা খাওয়া শরীরের পক্ষে হিতকর।

**নারিকেল**।—নারিকেল খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতেও আমাদের শরীররক্ষার সর্বপ্রকার উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অন্যান্য ফল অপেক্ষা ইহাতে তৈল-জাতীয় উপাদান অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। মূল্য হিসাবে নারিকেলের পুষ্টিকারিতা গুণ খুবই বেশী।

নারিকেল হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। অম্লরোগে ইহা মহা উপকারী।

কচি নারিকেলকে ডাব বলে। ইহার জল স্নিগ্ধ, তৃষ্ণানিবারক ও বমনরোধক। অজীর্ণরোগে ডাবের জল মহা উপকারী।

**বেল**।—পাকা বেল সারকগুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা অতীব পুষ্টিকর।

পোড়ান কাঁচা বেল এবং ইহার মোরব্বা আমাশয় রোগে উপকারী।

**লেবু**।—কমলা, বাতাবি, কাগজি ও পাতি প্রভৃতি সর্বপ্রকার লেবুই প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিনযুক্ত ও হিতকর। ইহা যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। জ্বর এবং অন্যান্য সকল অসুখেই লেবু পরম হিতকর।

**আনারস**।—আনারস অতি উপাদেয় ফল। ইহাও যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া পরিপাকের সহায়তা করে এবং ক্রিমি নষ্ট করে। ইহা অরুচিনাশক ও বলবর্ধক। আনারসের পাতার রস ক্রিমিরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শশা, তরমুজ, কাকুড়, লিচু, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি ফল পুষ্টিকর ও বলকারক। পেস্তা, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফলে অত্যধিক পরিমাণে তৈল-জাতীয় উপাদান থাকায় ইহারা গুরুপাক, কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকর।

ডালিম, বেদানা, আঙুর প্রভৃতি ফলের রস বলকারী ও লঘুপাক খাদ্য ; এজন্য রোগীর পক্ষে উপাদেয় পথ্য।

## (ঘ) রন্ধন-প্রণালী ( Method of Cooking )

রন্ধন দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ হইয়া নরম হয় এবং পরিপাকের উপযোগী হইয়া থাকে। চাউল, ডাল, আলু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে

শ্বেতসার ( Starch ) নামক যে পদার্থ থাকে, রন্ধন করিলে তাহার দানাগুলি উত্তাপ-সংযোগে বিদীর্ণ হইয়া সুপাচ্য হয়। মাংসাদি আমিষ খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি পদার্থ উষ্ণজলে দ্রবণীয় খাদ্যে পরিণত হয়; রন্ধন দ্বারা মাছ, মাংস প্রভৃতি কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য হয়; কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য সিদ্ধ হইয়া সহজপাচ্য হইয়া থাকে।

খাদ্যে দূষিত জীবাণু থাকিলে রন্ধনের উত্তাপে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। রন্ধন দ্বারা খাদ্যদ্রব্য লবণ ও মসলা প্রভৃতির সংযোগে মুখরোচক হয় ও আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়। আমাদের দেশে রন্ধন-প্রণালীর দোষে খাদ্যের অধিকাংশ পুষ্টিকর ও হিতকর দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভাত সিদ্ধ করিয়া ফেন ফেলিয়া দিলে ও আলুর খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে, অনেক সারবান্ পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। অনেক উত্তাপে পাক করিলে খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদ ও সহজপাচ্য হয় না। মৃদুজালে রন্ধনই ভাল। কুকারের ( Cooker ) মৃদুজালে ভাত, ডাল, খিঁচুড়ি, পোলাও, মাংস প্রভৃতি ধীরে ধীরে বেশ ভাল রান্না হয়।

রন্ধনের পক্ষে মৃৎপাত্রই প্রশস্ত। পিতলের পাত্রে অম্ল রন্ধন করিতে বা রাখিতে নাই। তবে, পাত্র কলাই করিয়া লইলে চলিতে পারে। এলুমিনিয়ম পাত্রে ক্ষার-জাতীয় পদার্থ ব্যতীত অন্য সকল খাদ্য রন্ধন করা যায়। রন্ধনকার্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রথম আবশ্যক। রাঁধিবার পাত্র, থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি জল দ্বারা বিশেষভাবে সর্বদা পরিষ্কার করা উচিত। যিনি পাক করিবেন, তাঁহার হস্তের নখ কদাপি বড় থাকিবে না। নখের নিম্নে নানা প্রকার দূষিত ময়লা থাকে। সাবান দ্বারা ভাল করিয়া হাত ধুইয়া রন্ধনকার্য আরম্ভ করা উচিত। পরিহিত বস্ত্র বা গাত্রমার্জনীয় গামছার দ্বারা আসন প্রভৃতি মুছিবার অভ্যাস বড় বিপজ্জনক।

মসলা যদি বাটিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এ-বেলার বাটা মসলা ও-বেলা ব্যবহার করা উচিত নয়। বাসি হইলেই উহা অল্প-বিস্তর পচিয়া উঠে। গুঁড়া মশলা শিশিতে করিয়া রাখিয়া ব্যবহার করা উত্তম। জলে না ভিজিলে উহা অনেক দিন পযন্ত ভাল থাকে।

পক্বান্ন মাত্রেই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা দোযাবহ। ভাত, ব্যঞ্জন, তরকারি প্রভৃতি কোন জিনিসে হাত দেওয়া ভাল নহে। হাতা বা চাম্‌চে আবশ্যকমত ব্যবহার করা উচিত। যে পরিষ্কৃত জল পান করা যায়, তাহাতেই রন্ধন ও তৈজসাদি প্রক্ষালন করা কর্তব্য। মাজা হইলে পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে বাসনগুলি অত্যুষ্ণ জলে ধৌত করিয়া লইলে ভাল হয়; তাহাতে রোগের আশঙ্কা থাকে না।

সংসারে সাধারণত মেয়েরাই রন্ধন কর্ম করিয়া থাকেন; স্থলবিশেষে এবং প্রয়োজনবোধে মেয়েদের তত্ত্বাবধানে ও উপদেশমত পাচক-পাচিকাগণও রন্ধনাদি কর্ম করিয়া থাকে। অতএব, এই রন্ধনকর্ম-সম্বন্ধে মেয়েদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য রন্ধনাদি কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

আমরা প্রত্যহ বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী খাইয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কাঁচা খাই, আর কতকগুলি রন্ধন করিয়া খাই। রন্ধন দ্বারা খাদ্য-সামগ্রী সিদ্ধ হওয়ায় নরম হয়; এইজন্যই উহারা পরিপাকের পক্ষে উপযোগী হয়। খাদ্য-সামগ্রী সাধারণত দুই প্রকার—উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। উদ্ভিজ্জ খাদ্য চাউল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, তরি-তরকারি, ফল ও মূল প্রভৃতি। প্রাণীজ খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে যে শ্বেতসার ( Starch ) পদার্থ থাকে, রান্না করিলে তাহার কোষগুলি উত্তাপযোগে বিদীর্ণ হয় বলিয়া সুপাচ্য হয়। মাছ,

মাংসাদি আমিষ খাদ্যে যে সকল পদার্থ থাকে উহা উষ্ণজলে গলিয়া সুপাচ্য হয়।

রন্ধনকালে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যেন খাদ্যদ্রব্যগুলি সুসিদ্ধ হয়। খাদ্যদ্রব্য ভাজা হইলে দুষ্পাচ্য হয়; ভাজা দ্রব্য অপেক্ষা দগ্ধ বা সিদ্ধ দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়; তবে কোন কোন দ্রব্য অতিরিক্ত জলে সিদ্ধ হইলে ঐ দ্রব্যের মধ্যে যে লবণ ও ভাইটামিন থাকে তাহা জলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এইজন্য মুখ-ঢাকা পাকপাত্রে কম জলে রন্ধন করা উচিত ও ভাপরায় সিদ্ধ করা উচিত। এই কারণে "ইক্‌মিক্ কুকারে" রন্ধন করাই প্রশস্ত।

আমাদের দেশে ভাত রান্না করিবার যে সাধারণ প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা কোনক্রমেই প্রশংসনীয় নহে। ভাত রান্না করিবার পর যে ফেন ( মাড় ) গালিয়া ফেলা হয়, সেই ফেনের সঙ্গেই উহার সারপদার্থ বাহির হইয়া যায়। চাউলে যে ছানা-জাতীয়, শর্করা ও লবণ জাতীয় উপাদান এবং ভাইটামিন আছে, তাহার অনেকাংশ রন্ধনকালে ফেনের সহিত বাহির হইয়া যায়। ভাত ও ডাল পৃথক্‌ভাবে রান্না করিয়া মিশাইয়া খাওয়ার চেয়ে চাউল ও ডাল মিশাইয়া খিঁচুড়ি রান্না করিয়া খাওয়াই ভাল। খিঁচুড়ি খুবই সারবান্ খাদ্য। খিঁচুড়ি রাঁধিবার সময় ফেন গালিয়া ফেলিতে হয় না। প্রতিদিন খিঁচুড়ি খাওয়ায় অসুবিধা বোধ হয়, অথবা ফেনাভাত খাইতেও বিশেষ ভাল লাগে না। এইজন্য চাউলের সহিত কি পরিমাণ জল দিলে ভাত সুসিদ্ধ হইবে অথচ ফেন গালিতে হইবে না—এই বিষয়ে মেয়েদের অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রন্ধন-কার্যে আমরা কাঠ, কাঠ-কয়লা, পাথুরে কয়লা ( coke )

প্রভৃতি জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। কাঠের জ্বালে অধিক সময় ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইলে খাদ্য-দ্রব্য সুপাচ্য হয়। পাথুরে কয়লার আঁচ বেশী; কাজেই ইহার কম আঁচে রাঁধিলে চলিতে পারে। রন্ধন-কালে অমনোযোগী হইতে নাই। রন্ধন-কার্যে এবং রান্নার ব্যবহারার্থ তৈজসাদি ধৌত করিবার জন্য পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করাই উচিত। জলপাত্র পরিষ্কার রাখা দরকার এবং সর্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। উহাতে না বাসনাদি বা হাত ডুবাইবে না। চাউল, ডাল, তরি-তরকারি ও শাক-সজি প্রভৃতি সর্ববিধ খাদ্য-সামগ্রী রন্ধনের পূর্বেই ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবে ও পরে পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিয়া রন্ধন করিবে। রন্ধনের পরে ঐ রাঁধা জিনিষে কখনও হাত দিবে না। পরিবেশনের সময় পরিষ্কৃত হাতা বা চামচ ব্যবহার করিবে। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। দেখিও যেন কখনও উহাতে ধূলা, বালি না পড়ে বা মাছি না বসে অথবা অন্যবিধ কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীদ্বারা দূষিত না হয়।

সূক্ষ্ম জালের আলমারিতে বা উঁচুস্থানে কাঠের বা বাঁশের মাচায় খাদ্য-দ্রব্য রাখা উচিত। খাদ্য-দ্রব্য কখনও মেঝেতে রাখিতে নাই, কিংবা না ঢাকিয়া রাখিতে নাই।

মাছ বা মাংস বেশী সিদ্ধ করিতে নাই; কারণ, তাহাতে উহার ছানা-জাতীয় উপাদান কঠিন হয়। ফলে, উহা অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য হয়; পরন্তু, উহার সার অংশের অনেকটাই জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই কারণে মাছ ও মাংসের সঙ্গে উহার ঝোলও খাওয়া উচিত।

মাছ অল্প তেলে ভাজিবার সময় সাবধানতার সহিত অল্পে অল্পে ভাজাই উচিত; নতুবা পুড়িয়া যাইবে। ভালভাবে ভাজিতে হইলে, বেশীমাত্রায় তৈল লইবে ও ঐ ফুটন্ত ছাঁকা তেলে মাছগুলি ছাড়িয়া

শীঘ্র শীঘ্র তুলিয়া লইবে। তাহা হইলে উহা কড়াভাজা হইবে না, কঠিন হইবে না, এবং উহার সার অংশ নষ্ট হইবে না। কাজেই উহা সুপাচ্য ও মুখরোচক অবস্থায় থাকিবে।

সিদ্ধ মাংস ঝোল সহিতই খাওয়া উচিত। ঝোল বাদ দিয়া খাইলে, উহার সার অংশ অনেকটা বাদ পড়িয়া যায়। মাংসের সহিত বেশী পরিমাণে ঘি বা মসলা দিলে উহা অত্যন্ত গুরুপাক হয়।

কাঁচা ডিম অপেক্ষা অর্ধ-সিদ্ধ ডিম সহজপাচ্য। বেশী সিদ্ধ হইলে ডিম গুরুপাক হয়।

তরকারি অধিক সিদ্ধ করিলে উহার ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। তরকারি সিদ্ধ করিয়া জল গালিয়া ফেলা উচিত নয়; তাহাতে উহার ভাইটামিন অনেকটা চলিয়া যায়।

গোল আলু, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারি খোসা-সমেত সিদ্ধ করিয়া পরে খোসা ছাড়াইয়া খাওয়া উচিত। ইহাতে উহাদের পুষ্টিকারিতা থাকে এবং সহজে পরিপাক হয়। কাঁচা অবস্থায় খোসা ছাড়াইয়া লইলে, ঐ খোসার সঙ্গে উহার সার অংশ অনেকটা চলিয়া যায়।

**রন্ধন-পাত্রাদির কথা।**—আমরা মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্র, পিতল, তামা, লোহা, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত পাত্র রন্ধন-কার্যে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রই সর্বোৎকৃষ্ট।

ভাত পিতলের পাত্রে রান্না করা চলে, কিন্তু উহাতে অম্ল রান্না করা বা রাখা কখনও চলে না। ঘি ও তৈল পিতলের পাত্রে বেশী সময় রাখিলে ‘কলঙ্ক’ ধরে ও আহারের পক্ষে অযোগ্য হয়। নূতন লোহার পাত্রে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিলে উহাতে ‘কষ’ ধরে ও কতকটা বিস্বাদ হয়।

তামার পাত্রে রাঁধিতে হইলে 'কলাই' করিয়া লওয়া উচিত। আজকাল এলুমিনিয়াম পাত্রের প্রচলন হইয়াছে; ইহাতে সকল খাদ্যই রান্না করা যাইতে পারে। এনামেল-যুক্ত পাত্রেরও যথেষ্ট ব্যবহার চলিতেছে; তবে, উহার 'এনামেল্' উঠিয়া গেলে উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রও পরিবর্তন করা দরকার।

পাক-পাত্র ও খাইবার থালা, গেলাস, বাটি প্রভৃতি তৈজসাদি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

**রন্ধন-কার্যে উনানের আগুনের সদ্ব্যবহার।**—রন্ধন-সময়ে উনানের অবস্থা ও জ্বালের দোষে রন্ধন-কার্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং জ্বালানির অযথা অপব্যবহার হয়। এইজন্য উনান-প্রস্তুত-প্রণালীও এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, যেন রন্ধনকালে পাক-পাত্রের চতুর্দিকে আগুনের জ্বাল বা আঁচ সমভাবে লাগে। সচরাচর রন্ধন-কার্যে তোলা ও বসা উনান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোলা-উনান ইচ্ছামত স্থানান্তর করা চলে; বসান উনানে সেরূপ হয় না। আজকাল অনেক স্থানেই পাথুরিয়া কয়লার জ্বালে রন্ধন-কার্য চলিতেছে। কয়লার উনানের প্রস্তুত-প্রণালী স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত, 'স্পিরিট-স্টোভ্' 'কেরোসিন-স্টোভ্' প্রভৃতি বিবিধ বিলাতী উনুনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বালানি হিসাবে কাষ্ঠ অপেক্ষা কয়লার জ্বালে শীঘ্র রন্ধন হইয়া থাকে; কিন্তু দৈনন্দিন নিয়মিত রন্ধন-কার্যের পর উনুনের আঁচ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় না। তখন আমরা আমাদের গৃহস্থালীর বস্ত্রাদি-ধৌতকরণ-কার্য ব্যাপারে ঐ আঁচের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। কিংবা রন্ধনশেষে উনুন হইতে জ্বলন্ত কয়লাগুলি চিমটার দ্বারা উঠাইয়া মাটিতে ঢাকিয়া দিয়া, নিভিয়া গেলে জলে ধুইয়া তুলিয়া রাখিয়া পরে ঐগুলি পুনরায় রন্ধন-কার্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

অল্প ব্যয়ে, কম আঁচে 'কুকারে' ছোট মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালাইয়া রন্ধন-কার্য হইয়া থাকে। ইহাতে খাদ্য-দ্রব্য সুসিদ্ধ হয় এবং বদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধ হওয়ায় খাদ্য-দ্রব্যের 'ভাইটামিন' ( খাদ্যপ্রাণ ) নষ্ট হয় না। রন্ধন-কার্য যেরূপেই করা হউক না কেন, ভাজা প্রভৃতি কার্যের সময় ব্যতীত অন্যসময় রন্ধনকালে রন্ধনপাত্র ঢাকিয়া দেওয়া উচিত; তাহাতে আগুনের আঁচের সদ্ব্যবহার হয় এবং খাদ্য-সামগ্রীর খাদ্যপ্রাণেরও বিশেষ অপচয় হয় না।

পল্লীতে রন্ধনশেষে উনুনের উপরে আগুনের আঁচে ও ধোঁয়ায় মৎস্যের ডিম প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইলেই ঐ শুষ্ক ডিম বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে ও খাওয়া চলে।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# গার্হস্থ্য অর্থ-ব্যবহার-নীতি

## (ক) পারিবারিক হিসাব-সংরক্ষণ

সংসারী লোকের নানাভাবে অর্থাগম হইয়া থাকে—কেহ জমিদারির মালিক, কেহ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কর্তা, কেহ কল-কারখানা দ্বারা অর্থার্জন করেন;—চাকুরি, চিকিৎসা, আইন প্রভৃতিও বহুলোকের উপজীবিকা।

কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইতে যাহার অর্থাগম হইয়া থাকে কিংবা যিনি ঐরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক, তাঁহার সকল রকম হিসাবপত্র একত্রে রাখা সম্ভব হয় না;—এক একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হইয়া থাকে। মহাজনদের মহাজনী খাতাপত্র থাকে, জমিদারের জমিদারী হিসাবপত্র আছে;—কারখানার মালিকদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে। এই সমুদয় হইতে গৃহস্থালীর হিসাবপত্র আলাদা। কিন্তু, এই শেষোক্ত হিসাব সকলেরই আছে;—গৃহস্থমাত্রকেই উহা রক্ষা করিতে হয়।

হিসাবের দুইটি অঙ্গ, আয় ও ব্যয়—জমা, খরচ। এইজন্যই হিসাবের বইখানিকেও সাধারণত 'জমা-খরচার বহি', সংক্ষেপে 'জমা-খরচ'ও বলা হইয়া থাকে।

**পারিবারিক হিসাবে জমা হয় কোথা হইতে?**—গৃহস্বামী কিংবা গৃহের উপার্জনশীল পরিজন সাংসারিক-ব্যয়-নির্বাহার্থ তৎ-

সম্পর্কিত তহবিলে যে অর্থ প্রদান করেন, প্রধানত তাহাই পারিবারিক হিসাবের জমামধ্যে গণ্য। এ ভিন্ন, যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা হিসাব রাখা হয় না, কিন্তু তাহাদের উপস্বত্বাদি গৃহস্থালীর কার্যে ব্যয়িত হয়, উক্তসংক্রান্ত আয়ও গৃহস্থালী হিসাবের জমার মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং তৎসম্পর্কিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ যথাসম্ভব বিশদভাবে উক্ত হিসাবে লিখিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যিনি জমিদারির মালিক তাঁহার জমিদারি-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের বিবরণ গৃহস্থালীর হিসাবের ভিতর লিখিতে হইবে না; কারণ, ঐ সকল বিষয়ের জন্য আলাদা জমিদারী হিসাব রাখা হইয়া থাকে। হয়ত কর্তা জমিদারি হইতে লব্ধ কিঞ্চিৎ অর্থ সংসার-খরচের জন্য প্রদান করিলেন; এরূপস্থলে উক্ত অর্থকে কর্তার প্রদত্ত জমা বলিয়া হিসাবে উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু, কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যদি অল্প-স্বল্প জমি-জমা থাকে, দু'চার ঘর প্রজা থাকে, দু'দশ টাকা আয় হয়, সামান্য কিছু খাজনা-পত্র দেনা-পাওনা হয়, তবে এই অকিঞ্চিৎকর লেখার জন্য তিনি আলাদা হিসাব না-ও রাখিতে পারেন। এরূপক্ষেত্রে জমি-জমার হিসাব এবং গার্হস্থলীর হিসাব একই পারিবারিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ঐ জমি-সংক্রান্ত হিসাব জমিদারী হিসাবের মতই খুব স্পষ্টভাবে গৃহস্থালীর হিসাবের ভিতর লিখিয়া রাখিতে হইবে। মনে কর, একটি প্রজা কয়েক টাকা খাজনা দিয়া গেল। তাহা হইলে হিসাবে লিখিতে হইবে "অমুক জমার বকেয়া খাজনা এত, হাল পাওনা এত—একুনে এত টাকা মধ্যে মারফত অমুক, জমা এত টাকা।"

গৃহকর্তা কিংবা অপর কেহ যদি তাহার বেতনের সমুদয় টাকাই হিসাবের তহবিলে নিয়মিতভাবে বরাবর প্রদান করিয়া থাকেন

তবেই তাহার প্রদত্ত অর্থকেঃ "অমুকের অমুক মাসের 'বেতন-জমা' এত টাকা" বলিয়া লিখিবে ; নতুবা, তাহার উপার্জনের আংশিক টাকা তহবিলে পাইয়া উহাকে তাহার 'বেতন-জমা' বলিয়া লিখিলে কাযত কতকটা ভুল করা হইবে।

বাড়ী ভাড়া, টাকার সুদ, ব্যবসায়ের আয়, শেয়ারের লভ্যাংশ, জমির ফসল, বাগানের ফল, ক্ষেতের সব্জি প্রভৃতি অপরাপর সহস্র উপায়ে লোকের ধনাগম হইতে পারে এবং এই সমুদয়ই গার্হস্থলী-হিসাবের জমার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

এইরূপ **গার্হস্থলী হিসাবে ব্যয়ের দফারও অবধি নাই।** সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে, পরিজনদের ভরণপোষণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, উৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, নিরাপত্তা, নানাবিষয়ে উন্নতি বিধান, লৌকিকতা রক্ষা এবং দানাদি কার্যের জন্যই গৃহস্থালীর আয় ব্যয়িত হইয়া থাকে।

**হিসাব লিখি কেন?**—হিসাব লেখার উদ্দেশ্য আয়-ব্যয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-অর্জন, এবং সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে আয়-বৃদ্ধি, ব্যয়-হ্রাস, অপচয় নিবারণ, এবং ভবিষ্যৎ অভাবের প্রতিরোধকল্পে নিজের সামর্থ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করা। হিসাবের খাতাখানি আর্থিক দিনলিপিও (Financial Diary) বটে। কি কড়ারে কাহাকে কত টাকা দিলাম, কি সর্তে কাহার নিকট কি মাল বিক্রয় করিলাম, কাহার নিকট কি ভাবে কত টাকা গচ্ছিত রাখিলাম, কাহার সহিত আমার কিরূপ আর্থিক ব্যাপার ঘটিল—হিসাবের খাতাখানিতে তাহা দিন-

তারিখসহ স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। সংসারে অপরের সহিত অর্থসম্বন্ধ নিত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। হিসাবের খাতাখানি উভয় পক্ষের স্মারকলিপি এবং বহুবিষয়ে গোলযোগের মীমাংসক।

**হিসাব লেখার পদ্ধতি।**—এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচনার বিষয়। আপাতত মনে হয়, আয়ের ঘরে আয়, এবং ব্যয়ের ঘরে ব্যয়ের দফাগুলি বসাইয়া যোগ-বিয়োগ করিয়া রাখিলেই হিসাব সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু, বস্তুত তাহা নহে; এ-বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান এবং পরিষ্কার বিচারবুদ্ধি না থাকিলে সুনিপুণ হিসাব-নবীশ হওয়া যায় না। ব্যবসায়-জগতে হিসাব-সংরক্ষণ বিদ্যার কদর খুবই অধিক। জমিদারী, মহাজনী এবং দেনা-পাওনার হিসাব রক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন আছে। গৃহস্থালীর মোটামুটি হিসাব-রক্ষা সহজ হইলেও পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার হিসাবের সংস্পর্শই ইহাতে থাকিতে পারে। তাই সর্ববিধ হিসাব বিদ্যায়ই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীলোকগণ স্বামীর সহকর্মিণী, সন্তানের শিক্ষয়িত্রী এবং অধীনস্থ পরিজনবর্গের অভিভাবিকা এবং উপদেষ্টা স্বরূপ যতই এ সকল বিষয়ে সুনিপুণা হইবেন ততই পরিবারের মঙ্গল;—ততই গৃহস্থালীতে শৃঙ্খলা আসিবে, অপচয়ের হ্রাস হইবে, জমা বৃদ্ধি পাইবে।

হিসাবের খাতায় প্রতিপৃষ্ঠায় দুইটি ঘর;—বামদিকে জমা এবং ডা'নদিকে খরচের ঘর। আয়-ব্যয় দেনা-পাওনার কোন্ দফাটি কোন্ ঘরে কিভাবে বসিবে, কি ভাষায় ইহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে—ইহাই শিক্ষণীয় বিষয়। নিজেরা নগদ টাকা উপার্জন করিয়া নগদ খরচ করিয়া হিসাব লেখায় কোন জটিলতা নাই;—সেই বিষয়ের বিশেষ আলোচনারও তেমন প্রয়োজন নাই। অনেকে ইহাকেই সাংসারিক জমা-খরচের পর্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বস্তুত অনেকেরই

সাংসারিক জমা-খরচের বিষয়-বস্তু ইহা হইতেও অনেকটা অতিরিক্ত। ধারে ক্রয়-বিক্রয়, ধারের দেনা-পাওনা, আংশিক আদান-প্রদান, আমানত করা, আমানত লওয়া, অগ্রিম আদান-প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারগুলি অনেকেরই গার্হস্থলী হিসাবের অঙ্গ। এই সকল বিষয়ের হিসাব লেখায় একটু জটিলতা আছে।

আমরা চাই নিজেরা কত উপার্জন করিলাম, কত ব্যয় করিলাম—তাহাই জানিতে ও বুঝিতে। কিন্তু, অপরের সাথে যে-সকল ধার-কর্জ লেন-দেন হইতেছে তাহার বিবরণ কোথায় লিখিব ? সে টাকাগুলিও ত আমারই তহবিলে আসা-যাওয়া করিতেছে,—আমারই তহবিল কমিতেছে বাড়িতেছে! তাদের বিবরণও ত হিসাবের খাতারই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

আবার দেখ, আমি ১লা তারিখে দু'শ টাকা বেতন পাইলাম। এক শ' টাকা সাংসারিক খরচ করিলাম. এক শ' টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলাম। তহবিল হইতে বাহির হইয়া গেল বলিয়া ব্যাঙ্কে রাখার টাকাটাও খরচের ঘরে লিখিতে হইল। দু'দিন পরে ব্যাঙ্কের টাকাটা তুলিলাম ; জমার ঘরে এক শ' টাকা জমা হইল। আবার দু'দিন পরে ঐ টাকাটাই ব্যাঙ্কে রাখিলাম—আবার খরচ লিখিলাম। যদি দশবার এই ব্যাপার ঘটে তবে আমার জমার ঘরে অতিরিক্ত দশ শ' টাকা জমা হইল, খরচের ঘরে অতিরিক্ত দশ শ' টাকা খরচ হইল এবং একুনে আমার ঐ মাসে বার শ' টাকা আয়-ব্যয় হইল। বস্তুতই কি আমি এত টাকা আয়-ব্যয় করিলাম, সুখভোগদানাদি ক্রিয়াকর্মে এতগুলি টাকা খরচ করিলাম ?—না।

আরো দেখ, দোকান হইতে ৫৲ মূল্যের এক মণ চাউল বাকিতে আনিলাম, দশদিন পরে মূল্য শোধ করিলাম। হিসাবটা লিখিব কবে ?

আজ, না মূল্য শোধ দেওয়ার দিন—না উভয়দিন? উভয়দিনই দেনা-পাওনা হয়; সুতরাং, তাহার স্মরণার্থ উভয় দিনই কিছু লেখাপড়া দরকার। আজ আমার জমার ঘরে ব্যবসায়ীর নামে এক মণ চাউলের মূল্য ৫৲ জমা করিব এবং খরচের ঘরে চাউলের বাবত ৫৲ খরচ লিখিব। পরে যেদিন টাকা শোধ করিব সেদিন ঐ ব্যবসায়ীর নামে ৫৲ খরচ লিখিব। তাহা হইলেই দেখ, নগদ টাকায় খরিদ করিলে আমার ৫৲ খরচ মাত্র লিখিতে হইত; কিন্তু এস্থলে ধারে ক্রয় করায় এক মণ চাউল খরিদ সম্পর্কে খরচের ঘরে দশ টাকা খরচ লিখিতে হইল এবং জমার ঘরে ৫৲ জমা করিতে হইল। আমার জমা-খরচে এই যে অতিরিক্ত ৫৲ জমা এবং পাঁচ টাকা খরচ—ইহা অবাস্তব। ইহাতে আমার জমা-খরচে আয়-ব্যয় মিছামিছি ৫৲ করিয়া বৃদ্ধি পাইল। এই অতিরিক্ত টাকা আমার উপার্জনও হয় নাই কিংবা ব্যয়ও হয় নাই। তবু, হিসাবের স্মরণার্থ এইরূপ আয়-ব্যয় লিখিতে হইবে; তবে এই ব্যাপারটিকে এমনভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লিখিতে হইবে যে, আমার বাস্তব আয়-ব্যয়টা, বুঝিতে বেগ পাইতে না হয়।

ব্যবসায়ীদের একখানা খাতা থাকে তাহাতে যাবতীয় আর্থিক খরিদ-বিক্রয়, দেনা-পাওনা, আদান-প্রদানের বিষয়—তাহা নগদই হউক কিংবা বাকিতেই হউক—লেখা থাকে। তা'ছাড়া, তাহাদের আরও ৩।৪ খানি খাতা থাকে যদ্দ্বারা তাহারা নিজেদের আয়-ব্যয় এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। তাহাদের খাতাগুলির নাম—খসড়া, রোকড়, খতিয়ান, রেওয়া ইত্যাদি। আমরা এই উদ্দেশ্যে সাধারণ জমা-খরচ বহি ব্যতীত আর একখানি মাত্র খাতা রাখিব; ইহাকে বলিব **'খতিয়ান'**। কোন্ খাতার কোন ঘরে কোন্ বিষয় লিখিব তাহা পর পৃষ্ঠায় বলা হইতেছে :—

**জমা-খরচ খাতায়—**

**(ক) জমার ঘরে**—(১) নিজ ঘরের যাবতীয় আয়—যে আয়ের উপর অপরের কোনরূপ কোন অধিকার নাই—তাহা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিবে। দ্রব্যাদি বিক্রয়ের টাকা এবং প্রাপ্ত সুদাদিও ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইবে; ধারে বিক্রয়ের টাকা যখন নগদ পাইবে তখনই মাত্র এই ঘরে জমা করিবে।

**(খ) খরচের ঘরে**—(২) নগদ টাকায় খরিদ দ্রব্যের মূল্য; (৩) ধারে কেনা দ্রব্যের মূল্য (এখানে সেই ব্যবসায়ীর নামও লিখিবে; যেমন, বঃ গোপীবল্লভ সাহা—ইত্যাদি; ইহার অর্থ গোপীবল্লভ সাহা তোমার পক্ষে ঐ খরচটা করিলেন, তিনি তোমার নিকট পাওনাদার হইলেন); (৪) অপরে তোমার নিকট হইতে যে টাকা উপার্জন করিল।

**খতিয়ান খাতায়—**

**(গ) জমার ঘরে**—(৫) বাকিতে ক্রয় করা দ্রব্যের পরিমাণ, মূল্য এবং ব্যবসায়ীর নাম; (৬) বাকিতে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইলে তাহা; (৭) গৃহীত ঋণের টাকা; (৮) ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত টাকা; (৯) অপর কেহ তোমার নিকট টাকা আমানত করিলে তাহা; (১০) কেহ তোমার বকেয়া প্রাপ্য শোধ করিলে তাহা।

**(ঘ) খরচের ঘরে**—(১১) তুমি কাহারও বকেয়া প্রাপ্য শোধ করিলে তাহা; (১২) ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিলে তাহা; (১৩) ধারে বিক্রয় করিলে তাহা; (১৪) কাহারও নিকট কোন কারণে টাকা আমানত করিলে তাহা।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলিই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দেখান হইতেছে—

| জমা-খরচ বহি | | খতিয়ান বহি | |
|---|---|---|---|
| (ক) | (খ) | (গ) | (ঘ) |
| জমা | খরচ | জমা | খরচ |
| (১) যাবতীয় নিজস্ব প্রাপ্ত, অর্থাৎ,উপার্জিত কিংবা উৎপন্ন অর্থাদি। | (২), (৩) নগদ কিংবা ধারে খরিদ করা দ্রব্যের মূল্য; (৪) সুদাদি শোধ এবং যাবতীয় নগদ খরচ যাহার পুনঃ-প্রাপ্তি হইবে না (ঋণ শোধ নহে)। | (৫) বাকিতে ক্রীত দ্রব্য; (৬) বাকিতে বিক্রীত দ্রব্যের প্রাপ্য মূল্য; (৭) গৃহীত ঋণ; (৮) ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত টাকা; (৯) অপর কর্তৃক আমানত করা টাকা; (১০) অপর কর্তৃক তোমার বকেয়া প্রাপ্য শোধ। | (১১) অপরের বকেয়া প্রাপ্য শোধ; (১২) ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রাখা হইতেছে; (১৩ ধারে বিক্রয়ের অপ্রাপ্ত অর্থ; (১৪) অপরের নিকটে নিজ আমানত করা টাকা। |

**খতিয়ান খাতার জমা-খরচ ঘরগুলির সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।** ইহার 'জমা' ঘরের অর্থ এই—তুমি অপরের নিকট হইতে অত টাকা জমা লইয়াছ অথবা অপরে তোমার ঘরে অত

টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে; সুতরাং তুমি তাহার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থের জন্য ঋণী হইয়া আছ। উহার 'খরচের' ঘরের অর্থ এই—তুমি অপরের নিকট অত টাকা রাখিয়া দিয়াছ; সুতরাং, উহা তোমার প্রাপ্য হইয়া আছে;—ঐ টাকা একসময়ে তোমার তহবিলে আসিবে। এইটুকু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকিলেই হিসাব সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। প্রশ্ন হইতে পারে—

১। আমার নিজস্ব জমা কত?—উঃ। **'ক'**—ঘরের অঙ্ক-সমষ্টি। (চার্ট দেখ)।

২। আমার নিজস্ব খরচ কত—উঃ। **'খ'**—ঘরের অঙ্ক-সমষ্টি।

৩। আমার কত পাওনা আছে?—উঃ। **'গ'—'ঘ'** (ফল ধনরাশি হইলে প্রাপ্য এবং ঋণরাশি হইলে দেনা বুঝিবে)।

৪। আমার নগদ তহবিল কত?—উঃ (**'ক+গ'**)—(**'খ+ঘ'**)।

হিসাব লেখার সময় মনে রাখিবে—

(১) ধারে দ্রব্য খরিদ করিলে তাহা খতিয়ানের **জমার** ঘরে এবং জমা-খরচের **খরচের** ঘরে তখনই লিখিয়া রাখিবে; কারণ, ব্যবসায়ী ঐ দ্রব্য তোমার নিকট জমা রাখিল এবং তুমি তাহা নিজে খরচ করিলে।

(২) ধারে দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহা খতিয়ানে **খরচ** লিখিবে। পরে টাকা পাইলে তাহা খতিয়ানের **জমার** এবং 'জমা-খরচে'র জমার ঘরে আলাদা আলাদা লিখিবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা তোমার নিকট যে নগদ টাকা জমা রাখিল তাহা তোমার নিজস্ব হইল বলিয়া আসল জমা-খরচের জমার অন্তর্ভুক্ত করিলে।

(৩) দ্রব্য ক্রয় করার জন্য টাকা আমানত করিয়াছিলে। খতিয়ানে

আমানতকারীর নামে উহা **খরচ** হইল। সে ব্যক্তি পরে তোমার নিকট দ্রব্য আনিয়া জমা করিল, উহা খতিয়ানে **জমা** হইল। এইদ্রব্যে তোমার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে এবং তোমারই খরিদ-দ্রব্য হইল বলিয়া অতঃপর উহা বাস্তব জমা-খরচের **খরচের** অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

নিম্নে হিসাব-সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ জটিল প্রশ্ন এবং তাহার সমাধান দেওয়া গেল।

প্রশ্ন।—হিসাব-রক্ষক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু—

**১লা বৈশাখ**—২০০৲ বেতন পাইলেন ; ৫৲ বাজার খরচ করিলেন ; চাটার্ড ব্যাঙ্কে ১০০৲ জমা করিলেন ; গোলাম হোসেন ব্যাপারীর ( সাং ফলতলা ) নিকট ধারে ৮৫৲ টাকায় আম বাগান বিক্রয় করিলেন।

**৫ই বৈশাখ**—সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক হইতে আমানতী টাকার বাবদ ৭৫৲ সুদ পাইলেন ; গোপীবল্লভ সাহার নিকট হইতে ৫৲ মণের ২ মণ চাউল ধারে ক্রয় করিলেন ; রামকৃষ্ণ রায়ের নিকট হইতে অলঙ্কার খরিদ করিয়া দেওয়ার জন্য ১২৫৲ আমানত লইলেন এবং ঔষধ কিনিয়া আনার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৫৲ আমানত করিলেন।

**৭ই বৈশাখ**—গোলাম হোসেন আম বাগানের মূল্য ৮৫৲ শোধ করিল ; সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ৫৲ টাকার ঔষধ খরিদ করিয়া আনিয়া দিলেন ; রামকৃষ্ণ রায়কে ১২০৲ টাকার অলঙ্কার কিনিয়া দেওয়া হইল ; পূর্বোক্ত গোপীবল্লভ সাহার চাউলের মূল্য ১০৲ শোধ করা হইল।

উক্ত তিন দিনের জমা-খরচাদি তৈরী কর।

( পরপৃষ্ঠায় জমা-খরচ লিখিয়া দেখান হইতেছে )

## হিসাব লেখার আদর্শ

| জমা-খরচ বহি | | খতিয়ান বহি | |
|---|---|---|---|
| (ক) জমা | (খ) খরচ | (গ) জমা | (ঘ) খরচ |
| ১লা বৈশাখ—<br>শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু—২০০৲ | বাজার খরচ<br>ইত্যাদি —৩৲ | ——— | ১লা বৈশাখ—<br>আমানত জমা—<br>চার্টার্ড ব্যাঙ্ক —১০০৲<br>আম বাগান বিক্রয়—<br>বঃ গোলাম হোসেন ব্যাপারী<br>সাং ফুলতলা —৮৫৲<br>আমানত—<br>শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়<br>বাবতে ঔষধ খরিদ —৫৲ |
| ৫ই বৈশাখ—<br>সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক—<br>বাবতে আমানতী টাকার<br>সুদ —৭৫৲ | চাউল খরিদ—<br>বঃ গোপীবল্লভ<br>সাহা ২৴ ৫৲ হিঃ<br>—১০৲ | ৫ই বৈশাখ—<br>চাউল খরিদ<br>শ্রীগোপীবল্লভ সাহা<br>২৴ ৫৲ হিঃ —১০৲<br>আমানত—<br>শ্রীরামকৃষ্ণ রায়<br>বাবতে অলঙ্কার খরিদ—১২৫৲ | |
| ৭ই বৈশাখ—<br>গোলাম হোসেন ব্যাপারী<br>বাবতে ১লা বৈশাখ<br>তারিখে আম বাগান<br>বিক্রয়ের প্রাপ্য শোধ<br>—৮৫৲ | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ<br>বন্দ্যোপাধ্যায়—<br>বাবতে ঔষধ<br>খরিদ ৫৲ | ৭ই বৈশাখ—<br>গোলাম হোসেন ব্যাপারী<br>১লা বৈশাখ তারিখে আম বাগান<br>ক্রয়ের মূল্য শোধ —৮৫৲<br>শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়<br>বাবতে ঔষধ খরিদ —৫৲ | আমানত শোধ—<br>শ্রীরামকৃষ্ণ রায়<br>বাবতে অলঙ্কার খরিদ<br>১২৫৲ মধ্যে —১২০৲<br>শ্রীগোপীবল্লভ সাহা<br>বাবতে চাউলের মূল্য শোধ<br>—১০৲ |
| মোট ৩৬০৲ | ২০৲ | ২২৫৲ | ৩২০৲ |

পূর্বোক্ত হিসাব হইতে সহজেই বলা যায় যে উক্ত কয়দিনের জন্য শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসুর—

(১) নিজস্ব জমা = (**ক**) ঘরের অঙ্ক-সমষ্টি = ৩৬০৲

(২) নিজস্ব খরচ = (**খ**) ......... = ২০৲

(৩) অপরের নিকট প্রাপ্য আছে = **ঘ − গ** = ৩২০৲ − ২২৫৲ = ৯৫৲

(৪) নগদ তহবিল = (**ক** + **গ**) − (**খ** + **ঘ**)

= (৩৬০৲ + ২২৫৲) − (২০৲ + ৩২০৲)

= ৫৮৫৲ − ৩৪০৲

= ২৪৫৲ টাকা।

মুদির দোকান, দুধওয়ালা, কয়লাওয়ালা প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক সংসারেই প্রায়শ কিংবা নিত্যই বাকিতে মাল খরিদ করা হয়। এই বাকির হিসাব অবশ্যই খতিয়ান খাতায় লিখিতে হইবে; তবে, এইজন্য খতিয়ান খাতায় প্রত্যেকের নামে কয়েকখানা করিয়া আলাদা পৃষ্ঠা রাখিয়া দিলেই ভাল হয়। দৈনিক মাল খরিদ উহার জমার ঘরে লিখিয়া রাখিবে এবং যখন যে টাকা দেওয়া হয় তাহা খরচের ঘরে লিপিবদ্ধ করিবে, এবং ঐ শেষোক্ত পরিমাণ টাকা তোমার জমা-খরচের খাতায় উক্ত মালের ক্রয় বাবদ খরচ লিখিবে। খতিয়ান খাতায় প্রথম পৃষ্ঠায় ভিতরের নামগুলির পৃষ্ঠাঙ্কসহ সূচী করিবে; যেমন,—মুদির হিসাব—৮০ পৃঃ; দুধওয়ালার হিসাব—৯৬ পৃঃ, ইত্যাদি। ইহাতে সুবিধা এই যে, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কাহারও সহিত তাহার বাকি দেনা-পাওনার হিসাব করা সম্ভবপর হইবে।

## চেক ( Cheques )

**'চেক' ( Cheques ) বা মহাজনি-পত্র**—'চেক' সম্বন্ধে বলিতে হইলেই 'ব্যাঙ্ক' ( Banks ) বা মহাজনিখানার কথা বলিতে হয়;

কারণ, 'ব্যাঙ্ক' সম্বন্ধেও আমাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

**ব্যাঙ্ক** ( Bank )—ইতালি ভাষায় বান্স্ ( Bance ) অর্থাৎ 'বেঞ্চ' ( Bench ) শব্দ হইতেই 'ব্যাঙ্ক' শব্দের উদ্ভব। ব্যাঙ্ক একটি মহাজনি-প্রতিষ্ঠান। এখানে টাকা লেন-দেনের কার্য হয়। ব্যাঙ্ক অন্যের গচ্ছিত অর্থ উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে; প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে আদান-প্রদান করে এবং দূরবর্তী স্থানসমূহের সহিত কাজকারবারে টাকার আদান-প্রদান বিষয়ে সুবিধা প্রদান করে।

ব্যাঙ্কে সাধারণত দুইটি নিয়মে টাকা জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে; একটি 'চলতি হিসাব' ( Current account ); অপরটি 'স্থায়ী হিসাব' ( Deposit or fixed account )। ব্যাঙ্ক টাকা গচ্ছিতকারীর প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য করে। ব্যাঙ্ক হইতে সাধারণকে বিবিধ নিয়মে টাকা ঋণ দিবারও নিয়ম আছে।

'চলতি হিসাবে' ( Current account ) দৈনন্দিন আয় হইতে টাকা গচ্ছিত ( জমা ) রাখা যায় এবং ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাকে পূর্বে না জানাইয়াও যখন তখন ইচ্ছামত টাকা উঠাইয়া লওয়া যায়। এই হিসাবে গচ্ছিত টাকার জন্য সুদ খুবই কম পাওয়া যায়, অনেক ব্যাঙ্কে আদৌ পাওয়া যায় না।

'স্থায়ী-হিসাবে'র ( Deposit or fixed Account ) বেলায় কোন নির্দিষ্টপরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য গচ্ছিত রাখা হয়। সাধারণত তিন, ছয় বা বার মাসের ওয়াদায় রাখা হইয়া থাকে। উক্ত ওয়াদার সময় অতীত হইবার পূর্বে স্থায়ী-হিসাবের টাকা উঠান যায় না। এই হিসাবে সাধারণত সুদের হার বার্ষিক

শতকরা চারি টাকা হইতে ছয় টাকা পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই সুদের হার ওয়াদার সময়ের দীর্ঘতার অনুপাতে কম-বেশী হইতে পারে।

ব্যাঙ্কের উপকারিতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, এখানে গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। ইহা সাধারণের অর্থ-সঞ্চয়ের নিমিত্ত সাহায্য করে। 'ব্যাঙ্ক' গচ্ছিতকারীর ক্যাশিয়ারের ( Cashier ) বা হিসাব-রক্ষকের কাজ করিয়া থাকে।

**চেক** ( Cheques ) **বা মহাজনি-পত্র** ( বা হাতচিঠা )—কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলে, অর্থাৎ, গচ্ছিত রাখিলেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার জন্য ব্যাঙ্কের কর্তা কতকগুলি ছাপান ফর্ম দিয়া থাকেন; এইগুলিকেই চেক বলে। চেকগুলি সাধারণত রঙীন কাগজেই ছাপা হইয়া থাকে। টাকা গচ্ছিতকারীর জন্য ব্যাঙ্কের কর্তা তাঁহাকে কতকগুলি চেক ফর্ম-সম্বলিত একখানি চেক বহি দিয়া থাকেন।

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠান প্রয়োজন হইলে ঐ চেকবহির একখানি চেকফর্মে গচ্ছিতকারীর নিজের নাম, টাকার পরিমাণ ও তারিখ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিখিয়া দিতে হয়।

টাকা-গচ্ছিতকারী ব্যাঙ্কের কর্তাকে ( Banker, Drawee ) চেক পাঠাইয়া তাঁহার নিজের নামে ( Drawer ) অথবা প্রয়োজনমত কোন তৃতীয় ব্যক্তির নামে ( Payee ) টাকা উঠাইতে পারেন।

একখানি চেকের সহিত সাধারণত তিন পক্ষের সম্বন্ধ থাকে,—

Drawer—যিনি টাকা উঠাইয়া লন, অর্থাৎ কেবলমাত্র গচ্ছিতকারী।

Drawee—যাঁহার প্রতি ( টাকা উঠাইবার জন্য ) চেকের সাহায্যে আদেশ প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের কর্তা।

Payee—যাঁহাকে ঐ চেকের সাহায্যে টাকা প্রদান করা হয়। গচ্ছিতকারী নিজের নামে টাকা উঠাইলে তখন চেকের সহিত কেবল দুইটি পক্ষের সম্বন্ধ থাকে ; যথা,—Drawee, Drawer.

**চেক-ফর্ম পূরণ করিবার সাধারণ নিয়মাদি**।—এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় :—

**স্বাক্ষর** (Signature)—ব্যাঙ্কে প্রথম টাকা গচ্ছিত রাখিবার সময়ে গচ্ছিতকারী যেরূপ স্বাক্ষর ( নিজের নাম লিখিবার সময় ) দিয়াছেন চেকে লিখিত স্বাক্ষর তাহার ঠিক অনুরূপ হইবে। এ বিষয়ে কিছুমাত্র গরমিল হইলে টাকা উঠান যায় না।

**পাওনাদারের নাম** ( Name of the Payee )—যাহাকে টাকা প্রদান করিবার জন্য চেকের দ্বারা ব্যাঙ্কারকে আদেশ প্রদান করা হইতেছে, তাঁহার নামটি খুব স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হয়।

**টাকার পরিমাণ** ( The amount )—ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা তুলিতে হইবে তাহার পরিমাণ স্পষ্টভাবে চেকের মধ্যভাগে শব্দে লিখিতে হয় এবং চেকের নিম্নে বামকোণে অঙ্কে লিখিতে হয়। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি যাহাতে না হয় তজ্জন্য এইরূপে টাকার পরিমাণ দুই স্থানে দুইরূপে লিখিতে হয়।

**চেক-মুড়ি** ( Counterfoils )—প্রত্যেক চেক-ফর্মে বামদিকে চেকবহির সহিত কতক অংশ চেক-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পরিচয়াদি লিখিয়া রাখিবার জন্য থাকে ; ইহাকে চেক-মুড়ি ( Counterfoils ) বলে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লেখা থাকে। এইগুলির ঘর চেকদাতাকে পূরণ করিতে হয়। যথা—

(১) যাহার নামে চেক দেওয়া হয় ( Name of the Payee )

(২) কি জন্য উক্ত টাকা দেয় ( What the payment is for )

(৩) টাকার পরিমাণ ( Amount )

(৪) তারিখ ( Date )

**চেকের প্রকারভেদ**।—প্রধানত দুই প্রকার চেক প্রদত্ত হয়—

(১) 'বহনকারী-চেক' ( Bearer Cheque )—এই ক্ষেত্রে চেক-ফর্মে পাওনাদারের নামের শেষে "or Bearer" এই কথা লেখা থাকে। ইহা যে-কেহ লইয়া গিয়া টাকা উঠাইতে পারে; ইহাতে পাওনাদারের নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে বাহককে কোন অনুজ্ঞা করিতে হয় না।

(২) 'পাওনাদারের আদেশযুক্ত-চেক' ( Order Cheque )—ইহাতে চেক-ফর্মে পাওনাদারের নামের পরে "Or Order" এই কথা লেখা থাকে। এক্ষেত্রে পাওনাদারকে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া বাহককে টাকা দিবার অনুজ্ঞা করিতে হয়।

আরও একপ্রকার চেক-ফর্মের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহাকে "Crossed Cheque" বলে। ইহাতে চেক-ফর্মের বামপার্শ্বে কোণাকুণিভাবে দুইটি "সমান্তরাল রেখা" দেওয়া হয়; ইহার মধ্যে "& Co", "Not Negotiable" etc লেখা থাকিতে পারে।

এইরূপ চেকের বেলায় চেকের টাকা কোন ব্যাঙ্কের সাহায্যে ( মধ্যস্থতায় ) পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি তুমি এইরূপ "Crossed Cheque" পাও, তবে তুমি এই "চেক" তোমার নিজের নামে যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত আছে বা যে ব্যাঙ্কের সহিত তোমার হিসাব খোলা আছে তথায় এই "চেক" জমা দিবে; সেই ব্যাঙ্ক তোমার টাকা প্রদানকারী-ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিয়া তোমার হিসাবে জমা করিয়া লইবে। যদি তোমার নিজের নামে কোনও

ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা না থাকে তবে যাহার ব্যাঙ্কে হিসাব আছে এমন কোন ব্যক্তির হিসাবে তথায় জমা দিবে।

**ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার ফর্ম** (Paying-in-slips or Credit slips)—কোন ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার ইচ্ছা করিলে, তাহাকে ঐ ব্যাঙ্কের কর্তার সহিত বা ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হয়, কিংবা তথায় পত্রাদি লিখিতে হয়। উক্ত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি বা ম্যানেজারের নির্দেশমত নিজের হস্তাক্ষরের আদর্শ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ফর্মে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে হয়।

এইরূপে কোন ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিলে টাকা জমা দিবার জন্য ঐ ব্যাঙ্ক হইতে বিনাব্যয়ে টাকা জমা দিবার ফর্ম (Paying-in-slips or Credit slips) আবাঁধা অবস্থায় কিংবা কতকগুলি ফর্ম সম্বলিত বাঁধাই পুস্তক পাওয়া যায়। সাধারণত, এই ফর্মগুলির সহিত মুড়ি (Counterfoils) যুক্ত থাকে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার সময় ঐ 'টাকা-জমা দিবার ফর্মে' প্রদত্ত মুদ্রাদির পরিচয় অর্থাৎ কিরূপ মুদ্রা কতকগুলি তাহার পরিচয় এবং নোট ইত্যাদির পরিচয় যথাযথ লিখিয়া দিতে হয়, এবং উক্ত ফর্মের "মুড়িতে" মুদ্রাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়াদি লিখিয়া ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট বিভাগের কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত করাইয়া লইতে হয়।

## পাস-বুক (Pass-book)

**ব্যাঙ্কের পাস-বুক** (Pass Book) **বা হিসাব-বহি**—কোন ব্যাঙ্কে প্রথমবার টাকা জমা দিবার পরেই ঐ ব্যাঙ্ক হইতে একখানি ছোট হিসাবের বহি পাওয়া যায়; ইহাকেই পাস-বুক বলে। এই 'বহি'তে

তোমার হিসাব সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে যে খতিয়ান-হিসাব আছে তাহারই 'নকল' হিসাব থাকে। খতিয়ান হিসাবের ন্যায় পাস বহিতেও জমা ও খরচ ( Debit & Credit ) দুই দিকেই উল্লেখ করা থাকে। তোমার নিজের খতিয়ান-হিসাবের সহিত পাস বইএর হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ব্যাঙ্কের জমার ঘরের সহিত তোমার নিজের খতিয়ানের খরচের ঘরের মিল আছে এবং ব্যাঙ্কের খরচের ঘরের সহিত তোমার নিজ খতিয়ানের জমার ঘরের মিল আছে।

## (খ) সাংসারিক আয় ও ব্যয়

## অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

অর্থের উপার্জন ও রক্ষণে যেরূপ যত্ন লওয়া ও সুবিবেচনার প্রয়োজন, ব্যয়ের বিষয়েও তাহার চেয়ে সমধিক যত্ন ও বিবেচনার অল্প প্রয়োজন নহে। এতদ্ব্যতীত, ধনাগমের অন্য উপযোগিতা নাই। অনেকে অর্থ-উপার্জন করিতে সক্ষম, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিতে অসমর্থ। রুগ্ন অবস্থায়, বার্ধক্যে বা বিপদ্-আপদের সময় উপার্জনের ক্ষমতা থাকে না। এই সকল প্রকার অসময়ের জন্য পূর্ব-উপার্জিত অর্থের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যয়াদি করিয়াও নিয়মিত সঞ্চয় করা উচিত। এই জন্য যাহাতে অযথা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অর্জিত অর্থের কিয়ৎপরিমাণও সঞ্চয় করা যায় তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আয়ের অনুরূপ ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বদা আয় ও ব্যয়ের সাম্য-রক্ষা করিয়া চলিবে। অমিতব্যয়িতার জন্য বহু ধনবান্ ব্যক্তি পরিণামে অর্থকষ্ট-জন্য অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সময়ে কোন এক বিষয়ে অধিক ব্যয় করিতে হইলে অন্য বিষয়ের ব্যয়-সংক্ষেপের চেষ্টা করিবে। নিজের আয়-ব্যয়ের হিসাবের তালিকা যত্নের সহিত

নিয়মিতভাবে রক্ষা করিবে। ইহাতে কখনও কোন বিষয়ে অযথা ব্যয়বাহুল্য হইতেছে কিনা বুঝিতে পারা যায় ও সময়ে তাহার সংশোধন করাও সম্ভব হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা বিশেষ কঠিন হয় না।

সঞ্চিত অর্থ যাহাতে সুরক্ষিতভাবে থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এজন্য এই অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া চলে। জীবন-বীমা, যৌথ-কারবার প্রভৃতিতে টাকা খাটাইলে ঐ টাকা সময়ে বহুগুণ বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।

নিজ নিজ সম্মান রক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ ও বিবিধ সৎকর্ম করিবার জন্য অর্থাগমের প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন, ব্যয়ের সময়েও তুল্যরূপ বা তদপেক্ষা বুদ্ধি, বিবেচনা ও পরিণামদর্শিতার একান্ত প্রয়োজন। আয়ের অনুরূপ ব্যয় করা গৃহীমাত্রেরই কর্তব্য। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে পরিণামে নিঃস্ব হইয়া অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। সর্বদা আয় ও ব্যয়ের সাম্য রক্ষা করিয়া চলাই উচিত; নতুবা, অর্থসঞ্চয়ের কোন উপায়ই থাকিবে না। কাজেই রুগ্ন অবস্থায়, বার্ধক্যে বা আকস্মিক বিপদ্-আপদের সময় যখন অর্থের একান্ত প্রয়োজন, তখন অর্থাভাবে বিপন্ন হইতে হইবে। মিতব্যয়ীর কখনও অর্থকষ্ট হইতে পারে না। সর্বদা মিতব্যয়িতার সহিত আয়ের কিয়দংশ আকস্মিক বিপদ্-আপদ্, ব্যারাম-পীড়া, সাময়িক অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও ভবিষ্যতের জন্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করিবে। যে সংসারে অর্থব্যয়-বিষয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত ও পালিত হয়, সেই সংসারই প্রকৃত সুখময় ক্ষেত্র। এই নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, প্রতিসংসারে অর্থাগমের অনুরূপ ব্যয়ের নিমিত্ত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেট্ ( Budget )

প্রণীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যয়ের নিমিত্ত 'বাজেট্' ( ব্যয়-বরাদ্দ ) থাকিলে আয়-ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য বুঝিতে পারা যায় এবং কোন অনুচিত বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য হইলে তাহারও সংশোধন হইতে পারে; অন্যায় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা সহজ হয়।

## সাংসারিক ব্যয়ের 'বরাদ্দ' বা বাজেট্ ( Budget )

সাংসারিক বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেট্ সকলের একরূপ হইতে পারে না। শহরে ও পল্লীতে সাধারণ মধ্যবিত্ত ধনীর পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ 'ব্যয়-বরাদ্দ' গৃহীর স্বীয় আয় অনুপাতে প্রস্তুত হওয়াই প্রয়োজন; তবে, এই বাজেট্ প্রস্তুত করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা-নির্বাহ করিতে হইলে আয়ের অর্ধেক ব্যয় নিরূপণ করা উচিত, বাকী অর্ধেক আয় আকস্মিক ব্যয়াদি ও ভবিষ্যতের সংস্থানজন্য সঞ্চয় করা উচিত।

একজন মধ্যবিত্ত পল্লীবাসী গৃহস্থের পক্ষে নিয়মিত দৈনিক ব্যয় হিসাবে বার্ষিক আহার, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যয়, ঝি-চাকরের বেতনাদি এবং আকস্মিক বিপদ্, ব্যাধি-পীড়ার নিমিত্ত চিকিৎসার ব্যয়, সাময়িক জনহিতকর কর্ম বা কোনরূপ দৈব-দুর্বিপাকজনিত; যথা,—দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্ঘটনার ব্যয়াদি ধরিয়া আনুমানিক বাজেট্ প্রস্তুত করিতে হয়।

একজন শহরবাসী মধ্যবিত্ত গৃহীর পক্ষে পল্লীবাসী অপেক্ষা ব্যয় সাধারণত অতিরিক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার নিয়মিত আহার, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্রাদি, শিক্ষাবাবদ ব্যয় প্রভৃতি ব্যতীতও অপর ব্যয় হইয়া থাকে; যেমন,—আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি কার্যে ব্যয়, যানবাহনাদির ব্যয়, বাড়ী ভাড়া, জল, আলো প্রভৃতি সরবরাহের নিমিত্ত ব্যয় ইত্যাদি।

সুতরাং শহরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ব্যয়-বরাদ্দ বা বার্ষিক বাজেট্ এইরূপ—সংসারের নিয়মিত আহার ও পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যয়, বাস-গৃহের ভাড়া বা মেরামতাদির ব্যয়—পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়—সাময়িক ব্যারাম-পীড়ায় চিকিৎসার ব্যয়—জনহিতকর কার্যাদির জন্য দাতব্য হিসাবে ব্যয়—সাধারণ দৈব ও মঙ্গলকার্যে ব্যয়, যানবাহনাদির ব্যয়, জল আলো প্রভৃতি সরবরাহের ব্যয় ইত্যাদি।

**সাময়িক অপ্রত্যাশিত ব্যয়াদি**—গৃহীর বা গৃহস্থের সংসারযাত্রা-নির্বাহকল্পে বিবিধ বিষয়ের নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব বিবিধ ব্যাপারেও ব্যয় হইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই সাংসারিক স্বীয় নিয়মিত ব্যয়-বরাদ্দের সহিত আকস্মিক ব্যয়-নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকা উচিত। এই আকস্মিক ব্যয় বিবিধ কারণে হইতে পারে; যথা,—সংসারে পরিজন মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদি অচিন্তিতপূর্ব শুভাশুভ কার্যে ব্যয়; বিশিষ্ট আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতের আগমনাদি কারণে ব্যয়; ব্রত-নিয়ম, পূজাপার্বণ ও পর্বাদি-কারণে ব্যয়; ব্যাধি- পীড়ায় চিকিৎসা কার্যে ব্যয়, অগ্নিভয়, ঝড়-বাতাস প্রভৃতি কারণে ব্যয়; জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনায় ব্যয়, সাময়িক কোন জনহিতকর কার্যে ব্যয়, বিবিধ দাতব্য-কার্যে ব্যয় ও তীর্থ-পর্যটনাদি কার্যে ব্যয়।

## (গ) জীবন-বীমা

ধনীর ধন-বৃদ্ধি এবং দরিদ্রের অর্থ-সঞ্চয়ের যত পন্থা আছে, **জীবন-বীমা** তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ্ ও সহজ পন্থা। মানুষ যদি জানিতে পারে যে, তাহার পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ

নিরাপদ, তাহা হইলে সে তাহার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিসহ ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কাবিহীন ও শান্তিপূর্ণ চিত্তে কাল কাটাইতে পারে। এজন্য জীবন-বীমা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

প্রধানত দুই প্রকার জীবন-বীমা প্রচলিত আছে ; (১) মেয়াদী বীমা ও (২) আজীবন বীমা। মেয়াদী বীমার বিশেষ সুবিধা এই যে, বীমাকারী নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে বীমার দাবীর টাকা নিজেই পাইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে আরামে জীবনযাপন করিতে পারেন। যদি নির্দিষ্ট কালের পূর্বেই মৃত্যু হয়, তবে অল্প প্রিমিয়ামের টাকা দিয়াই তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বেশী টাকা পাইতে পারেন। আজীবন বীমার দাবীর টাকা বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার ওয়ারিশগণেরই প্রাপ্য।

মেয়াদী বীমার প্রিমিয়াম্ অপেক্ষা আজীবন বীমার প্রিমিয়াম্ অনেক কম ; সুতরাং, আজীবন বীমায় কম টাকা প্রিমিয়াম্ দিয়া নিজের অ-বর্তমানে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের জন্য বেশী টাকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার ইহাই একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমানে আমাদের দেশে বহু বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবাসীও জীবন-বীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনবিষয়ে ক্রমশই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন।

**বীমা সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়**—বীমা করিতে হইলে প্রথমে কোম্পানির মুদ্রিত প্রস্তাবপত্রে ( Proposal form ) আবেদন করিয়া কোম্পানির নির্বাচিত ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হয়। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফল কোম্পানির পরিচালকবর্গের ( Directors ) অনুমোদিত হইলে আবেদনকারীকে কিস্তির টাকা ( Premium ) দিতে বলা হয়। প্রথম কিস্তির টাকা পাইলেই কোম্পানি আবেদনকারীকে

বীমাপত্র ( Policy ) পাঠাইয়া দেন। প্রথম কিস্তির টাকা গ্রহণের পর হইতেই কোম্পানি ঐ বীমার টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ তারিখ হইতেই পরবর্তী প্রিমিয়াম্ দিবার তারিখ গণনা করা হয়।

**বীমাপত্রের নিঃসংশয়তা** ( Indisputability of Policies ) —একবার বীমাপত্র প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাব-পত্রে কোনওরূপ প্রবঞ্চনা প্রমাণিত না হইলে, উহার দাবীর টাকা প্রদান সম্বন্ধে কোন ওজর-আপত্তি উঠিতে পারে না।

**বয়সের প্রমাণ** ( Proof of age )।—বীমাপত্রে লিখিত টাকার দাবী উপস্থিত হইলে টাকার দাবী মিটাইবার জন্য বীমাকারীর বয়সের প্রমাণ পাওয়া কোম্পানির একান্ত প্রয়োজন। অতএব, বীমাকারীর আবেদন-পত্রের সঙ্গে বা যত সত্বর সম্ভব নিজের বয়সের প্রমাণ পাঠান কর্তব্য। এই জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি চলিতে পারে—

১। জন্মের সার্টিফিকেট।

২। কোষ্ঠী।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বা স্কুল-পরিত্যাগের সার্টিফিকেট।

**কিস্তির টাকা দিবার নিয়ম** ( Premium )।—কিস্তির টাকা বাৎসরিক হিসাবে অগ্রিম দেয়; তবে, ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক হারেও দেওয়া যায়। ইহাতে শতকরা ২॥০ টাকা সাধারণত বাদ পাওয়া যায়। আবার, মাসিক হারেও দেওয়া চলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কিছু বেশী দিতে হয়। কিস্তির টাকা দিবার জন্য বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট আছে।

**কিস্তির টাকা দিবার অতিরিক্ত সময়** ( Days of Grace )। —বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক হারে দিবার নিয়ম থাকিলে, কিস্তির টাকা দিবার নির্দিষ্ট সময় হইতে সাধারণত এক মাস অতি

সময় পাওয়া যায়। মাসিক কিস্তিক্ষেত্রে ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায়।

## বিভিন্ন প্রকার বীমাপত্র ( Policies )

পূর্বোক্ত আজীবন বীমা ও মেয়াদী বীমা আবার বয়স এবং কিস্তির টাকা দিবার বিভিন্ন সর্তে নানাবিধ আছে। যথা,—

১। সাধারণ আজীবন বীমা ( Ordinary Whole Life Assurance );

২। নির্দিষ্ট কাল যাবৎ দেয় কিস্তি সর্তে আজীবন বীমা ( লাভ সহিত ) ( Whole Life Assurance by Limited Payments with Profits );

৩। নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দেয় কিস্তি সর্তে আজীবন বীমা ( লাভ রহিত );

৪। মেয়াদী বীমা ( নির্দিষ্ট বৎসর সর্তে ) ( লাভ সহিত );

৫। ঐ ( বিনা লাভে );

৬। মেয়াদী বীমা ( নির্দিষ্ট বয়স সর্তে—লাভ সহিত );

৭। ঐ ( বিনা লাভে );

৮। দ্বিগুণ মেয়াদী বীমা ( Double Endowment—নির্দিষ্ট বৎসর সর্তে—বিনা লাভে );

৯। শিক্ষা বা বিবাহ দিবার সংস্থানজন্য শিশুদিগের জন্য বীমা ( বিনা লাভে );

১০। বিবাহের সংস্থানের জন্য শিশুদিগের মেয়াদী বীমা ( বিনা লাভে );

১১। যুক্তজীবনের মেয়াদী বীমা ( লাভ সহিত );

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বীমা আছে ; যথা,—

১। গ্যারাণ্টিযুক্ত লভ্যাংশে মেয়াদী বীমা ;

২। পরিবারের আয়-সংস্থাপনকল্পে বীমা ;

৩। অত্যল্প ব্যয়ে অধিকতম লাভদায়ক বীমা ;

৪। আকস্মিক বিপদ্-বীমা।

**চাঁদার হার** ( Premium )—বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন প্রকার চাঁদার হার নির্দিষ্ট আছে। চাঁদার হার বীমাকারীর বয়সের অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়। সাধারণত ২০ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বীমা করা হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তি নিজের নামে বা তাঁহার স্ত্রীর নামে বীমা করিলে তিনি ১৯২২ খৃঃ অব্দের গভর্নমেণ্টের ইন্‌কম্‌ট্যাক্স আইন অনুসারে, প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ নিজ আয়ের এক-ষষ্ঠাংশের অনধিক হইলে তাহার উপর আয়কর মাপ পাইবেন।

নানাবিধ 'বীমা' ( Policies ) প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে আজীবন ( Whole Life Policy ) ও মেয়াদী বীমা (Endowment Policy ) প্রধান। এই নিমিত্ত এই দুইপ্রকার বীমা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

## আজীবন বীমা

### ( Ordinary Whole Life Assurance )

### ( লাভ-সমেত বা লাভ-রহিত )

এই পদ্ধতির বীমায় বীমাকারীকে ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বা তৎপূর্বে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যু পর্যন্ত প্রিমিয়াম্ দিতে

হইবে। এই পদ্ধতির বীমায় অল্পতম হারে প্রিমিয়াম্ দিয়া বেশী টাকা পাওয়া যায়। যাঁহাদের আয় অতি অল্প অথচ তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য অল্প টাকায় যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের এই বীমা গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পদ্ধতির পলিসি লাভ-সমেত বা লাভ-ছাড়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। লাভ-সমেত পলিসি গ্রহণ করিলে, সামান্য উচ্চ হারে, অন্তত প্রথম তিন বৎসরের জন্য প্রিমিয়াম্ দিতে হইবে।

তিন বৎসর প্রিমিয়াম্ দিয়া যদি বীমাকারী আর পলিসি চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নিম্নের যে কোন প্রকার সুবিধা লাভ করিতে পারেন ঃ—

(ক) বীমা-স্বত্বত্যাগের নগদ মূল্য লইতে পারেন ;

(খ) লাভ-রহিত আংশিক বীমা গ্রহণ করিতে পারেন ;

(গ) বীমা যাহাতে বাতিল না হয় সেইজন্য কোম্পানি যে সমস্ত সুবিধা দেন, সেই সুবিধা পাইতে পারেন।

## নির্দিষ্টকাল দেয় চাঁদায় আজীবন বীমা

(Whole Life Assurance with Limited Payments)

( লাভ-সমেত বা লাভ-রহিত )

এই পদ্ধতি অনুসারে বীমা করিলে বীমার টাকা বীমাকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশ পাইয়া থাকেন। চাঁদা বা প্রিমিয়াম্ কেবলমাত্র নির্ধারিতকাল পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু, যদি এই নির্দিষ্টকাল মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর প্রিমিয়াম্ দিতে হয় না।

যাহারা মনে করেন যে ভবিষ্যতে কিছুকাল পর তাঁহাদের আয় কমিয়া যাইবে, অতএব প্রথম প্রথমই বেশি আয় থাকাকালীন বীমা করা কর্তব্য, তাঁহাদের এই পদ্ধতি অনুসারে বীমা করা সুবিধাজনক।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী লাভ-সহিত পলিসি গ্রহণ করিলে, প্রিমিয়াম্ দেওয়া শেষ হইয়া গেলেই লাভের উপর দাবী রহিত হয় না। যে পর্যন্ত না পলিসি দাবী বলিয়া গণ্য হয়, সেই পর্যন্ত বীমাকারী লাভের অংশের অধিকারী থাকিবেন।

তিন বৎসর প্রিমিয়াম্ দেওয়ার পর বীমাকারী আর প্রিমিয়াম্ চালাইতে না পারিলে, তিনি নিম্নলিখিত যে কোন সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ—

(ক) বীমা স্বত্বত্যাগের নগদ মূল্য নিতে পারেন ;

(খ) লাভ-রহিত আংশিক বীমা গ্রহণ করিতে পারেন ;

(গ) বীমা যাহাতে বাতিল না হয়, সেইজন্য কোম্পানি যে সকল সুবিধা দেন, সে সকল সুবিধা পাইতে পারেন।

( এই সম্বন্ধে কোম্পানি-বিশেষের নিয়মাবলী উক্ত বীমা কোম্পানিকে লিখিলেই জানিতে পারা যায় )।

## মেয়াদী বীমা

( Endowment Assurance )

এই পদ্ধতি অনুযায়ী বীমা করিলে, নির্ধারিত বৎসর বা নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত প্রিমিয়াম্ চালাইলে বা তৎপূর্বে যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে, বীমার টাকা প্রাপ্য হয়।

এই বীমার দিকে লোকের আগ্রহ বেশী ; কারণ এই পদ্ধতি অনুযায়ী বীমা করিলে, বীমাকারী দুই রকম সুবিধাই পাইয়া থাকেন ; যথা,—

(১) অল্পবয়সে মৃত্যু ঘটিলে, যাহারা বীমাকারীর উপর জীবিকানির্বাহের জন্য নির্ভর করে, তাহাদের জীবিকার সংস্থান এবং (২) নির্দিষ্ট বৎসর বা বয়স উত্তীর্ণ হইলে, তাহার নিজের বৃদ্ধ বয়সে জীবিকানির্বাহের সংস্থান হয়। যদি বীমাকারীর নির্ধারিত বয়স বা বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে বীমার টাকা তাঁহার ওয়ারিশ পাইবেন এবং তিনি যদি পূর্বোক্ত নির্ধারিত বয়স বা বৎসরের পরও বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই সেই টাকা পাইবেন এবং এমন সময়ে এই টাকা পাইবেন যে সময়ে এরূপ একটি এককালীন টাকার তাঁহার খুবই দরকার।

যদি তিন বৎসর প্রিমিয়াম্ দেওয়ার পর, বীমাকারী আর প্রিমিয়াম্ চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নিম্নের যে কোন একটি সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ—

(ক) বীমা স্বত্বত্যাগের নগদ মূল্য পাইতে পারেন ;

(খ) লাভ-রহিত আংশিক বীমা গ্রহণ করিতে পারেন ;

(গ) পলিসি জীবিত রাখিবার জন্য কোম্পানি যে সুবিধা দিয়াছেন সেই সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে।

## বিবাহ বা শিক্ষার হেতু শিশুদিগের জন্য বীমা
### ( লাভ-রহিত )

এই পদ্ধতিতে বীমার টাকা মেয়াদ অন্তে দেওয়া হয় এবং পিতামাতা বা অভিভাবকের মৃত্যুর পর আর বীমার কিস্তি দিতে হয় না।

এই শ্রেণীর বীমা দ্বারা পিতামাতা বা অভিভাবকগণ মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর বা সন্তানগণের শিক্ষার ব্যয়সংস্থান বা বিবাহের খরচ বাবদ সঞ্চয় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। অল্প প্রিমিয়াম্ দিয়া তাঁহারা

মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকুই সন্তানের ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন। এই শ্রেণীর বীমা করিলে নিম্নলিখিত সুবিধা দেওয়া হয়ঃ—

যাহার নামে বীমা করা হইয়াছে তাহার যদি মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু হয় তাহা হইলে—

(ক) প্রিমিয়াম্ স্বরূপ যতটাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সমস্ত ফেরৎ দেওয়া হয়; বা

(খ) অন্য কোন শিশুকে মৃত শিশুর স্থলে মনোনীত করা যাইতে পারে। এই স্থলে পূর্বের পলিসিই বলবৎ থাকিবে এবং রীতিমত বাকি প্রিমিয়াম্ দিয়া, মেয়াদ অন্তে সমস্ত টাকা গ্রহণ করিতে পারা যায়।

যদি বীমাকারীর ( পিতামাতা বা অভিভাবক ) মেয়াদপূর্ণ হইবার পূর্বে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর প্রিমিয়াম্ দিতে হয় না এবং বীমার টাকা মেয়াদ অন্তে মনোনীত শিশুকে দেওয়া হয়।

উপরের সুবিধাগুলি ছাড়াও এই পদ্ধতির বীমা করিলে, সাধারণ শ্রেণীর বীমায় যত রকম সুবিধা আছে, সেই সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায়; যথাঃ—

যদি তিন বৎসর প্রিমিয়াম্ দিয়া বীমাকারী আর পলিসি চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত যে কোন সুবিধা পাইতে পারেনঃ—

(ক) বীমা-স্বত্বত্যাগের নগদ মূল্য পাইতে পারেন,

(খ) লাভ-রহিত পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে আংশিক বীমা গ্রহণ করিতে পারেন;

(গ) বীমা স্বত্ব-সংরক্ষণজনিত যে সমস্ত সুবিধা কোম্পানি বীমা-কারীদের প্রদান করেন, সেই সমস্ত সুবিধা পাইতে পারেন।

## (ঘ) সংসারের আনুষঙ্গিক আয়ের ব্যবস্থা—গৃহশিল্পাদি

## Possibilities of Supplementing Family income—Home industries

বর্তমানে আমাদের দরিদ্র বাংলা দেশে এই অর্থ-সমস্যার দিনে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে একমাত্র স্বীয় নিয়মিত অর্থাগমের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের যাবতীয় কর্তব্য স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সম্পাদন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সাংসারিক নিয়মিত ব্যয়াদি করিয়া পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাদান, আকস্মিক বিপদাদি, চিকিৎসা ও অবশ্যকরণীয় লৌকিক ক্রিয়াদির বিবিধ ব্যয় কোনরূপ সংকুলন করিয়া পরিণত বয়সে একরূপ কপর্দকশূন্য অবস্থায় উপনীত হন। ভবিষ্যতে দুর্দিনের জন্য অর্থ-সঞ্চয়ের তাঁহার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। সুতরাং, তাঁহাকে রুগ্ন অবস্থায় কিংবা বার্ধক্যে অর্থাভাব হেতু অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। ছেলেমেয়েরা সাধারণত ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। শিক্ষালাভান্তে তাহারা যখন কোন অর্থকরী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের প্রায় অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়া বেকার জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে এই বেকার-সমস্যা বড় জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পে দেশের মনীষিগণ বহু গবেষণাও করিতেছেন। সুতরাং, এই অর্থ-সমস্যার দিনে যদি আমরা সংসারে নিয়মিত আয়ের সহিত অন্যবিধ আনুষঙ্গিক আয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারি, তবে আমাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। সংসারে গৃহিণীগণ এবং ছেলেমেয়েরা নিজ

নিজ নিয়মিত কার্যাদি সমাপন করিয়াও অনেক অবসর যাপন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেই অবসর সময় বিবিধ অর্থকরী কাযে নিয়োজিত করিয়া বিবিধ গৃহ-শিল্প দ্বারা আনুষঙ্গিক আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বর্তমানে বিদ্যালয়েও বিবিধ শিল্পকায শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জাপান, রাশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় কেবলমাত্র বিদ্যালয়েই শিক্ষা করিতে হয়; এজন্য তাহারা গৃহে অন্যবিধ কার্যের জন্য যথেষ্ট সময় পাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালয় ব্যতীত গৃহেও গৃহ-শিক্ষকের ( Private Tutor ) নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে; সুতরাং, অন্যবিধ কাযের সময় জুটে না। এ প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বলা যায়, কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই জীবিকানির্বাহের জন্য হউক বা আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদ লাভের জন্য হউক, সর্বপ্রযত্নে শিল্প-শিক্ষা ও তাহার উন্নতির বিষয়ে অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। সর্ববিধ শিল্পমধ্যে গৃহশিল্পের উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইলে গৃহস্থমাত্রেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সংসারযাত্রা-নির্বাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে; বিশেষত, মেয়েরা গৃহস্থালীর যাবতীয় নিয়মিত কার্য সমাপন করিয়াও বিবিধ-গৃহ-শিল্প দ্বারা সংসারের নিয়মিত অর্থাগমের সহিত আনুষঙ্গিক আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

**সংসারে আনুষঙ্গিক আয়ের পন্থা হিসাবে গৃহ-শিল্পাদি—**

১। সূচী-শিল্প—'সিঙ্গার', 'এ্যাড্‌লার,' 'মাণ্ডল্‌স্', 'ফিনিক্‌স্' প্রভৃতি সেলাই-এর কল গৃহে রাখিয়া জামা, ফ্রক্, শেমিজ, ব্লাউজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সূচী-শিল্পে ভালরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া

অর্থাগমের ব্যবস্থা করা যায়। শান্তিপুর, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মহিলাগণ নিয়মিত সূচী-শিল্প দ্বারা—যথা,—বস্ত্রাদিতে ফুল তুলিয়া, রেশমের নক্সা পাড় বুনিয়া, রুমাল, পশমের গেঞ্জি, মোজা, কম্ফর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া—অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গৃহে ব্যবহৃত পুরাতন বস্ত্রাদি দ্বারা কাঁথা, আসন প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য তৈয়ার করিয়া থাকেন।

২। পল্লীগ্রামে গৃহে গো-পালন করা হইলে গোময় হইতে ঘুঁঠে প্রভৃতি জ্বালানির ব্যবস্থা করা যায়। বাস-গৃহ হইতে দূরে গর্ত খুঁড়িয়া ঐ গোময় মাটি-চাপা দিয়া রাখিলে উহা পরে জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

৩। পাট, শণ প্রভৃতি হইতে শিকা, আসন, হাত-পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

৪। মাটির দ্বারা পুতুল, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করা যায়।

৫। মুগ, কলাই প্রভৃতি ডা'ল হইতে বড়ি, পাঁপর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন।

৬। নারিকেল, গুড়, তিল, চিনি, চাউলের গুঁড়া ইত্যাদি হইতে বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

চীনদেশে গৃহে রন্ধনকার্যের পরে উনুনের আগুনের ধোঁয়ার সাহায্যে মেষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর চর্ম পাকা করা হয় ( Tanning )।

গৃহে বাঁশ, নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা প্রভৃতি হইতে মাদুর, ডালা, কুলা, ঝুড়ি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এখনও মেয়েরা অবসর-সময়ে চরকা, টেকো প্রভৃতিতে রেশম, গরদ, তসর প্রভৃতির সূতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্ট, মণিপুর ও আসামের বহু স্থানে মেয়েরা গৃহে বয়নকার্য করিয়া থাকেন।

গৃহে বিবিধ ফলের মোরব্বা, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেও গৃহস্থালীর উপকার হইতে পারে। কয়লার গুঁড়া, গোময় প্রভৃতির সাহায্যে গুল, টিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়।

অবসর সময়ে কাগজের ঠোঙা, প্যাকিং কাগজের বাক্স, শিশি-বোতলের লেবেল লাগান প্রভৃতি কায করিয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করা যায়।

মেয়েরা সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিলে অবসরকালে চিত্তবিনোদনজন্য ব্যয়সাধ্য রেডিও, থিয়েটার, বায়স্কোপ, গ্রামোফোন প্রভৃতির অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারে।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সংক্রান্ত যে উপায় সমূহ অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত জীবনে নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায় ও শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে, তাহাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলে।

(১) নরদেহের গঠন ও কার্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ; (২) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ; (৩) বিশ্রাম ও ব্যায়াম ; (৪) স্নান, দাঁত, চুল ও চর্মের যত্ন ; (৫) সাবানের ব্যবহার ও তাহার কার্য ; (৬) শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ; (৭) সূতী, পট্ট, রেশমী ও পশমী-বস্ত্রাদি ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় কি স্থান অধিকার করে—এই বিষয়গুলি এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

## (ক) নরদেহের গঠন ও কার্য্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান

### নরদেহের সাধারণ ধর্ম্ম

মানবদেহ একটি প্রকাণ্ড কারখানা-বিশেষ। দেহের অভ্যন্তরে বহু বিচিত্র যন্ত্রের সমাবেশ রহিয়াছে। দেহের আকৃতি ও গঠন যেমন বিচিত্র, দেহ-মধ্যস্থ যন্ত্র এবং তাহাদের কার্যপ্রণালীও তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মাটির প্রতিমা গড়িতে যেমন বাঁশ, খড়, দড়ি দিয়া প্রথমে একটা কাঠামো করিয়া লইতে হয়, নরদেহ-গঠনেও তেমনি একটা কাঠামোর প্রয়োজন হয়। প্রতিমা গড়িতে যেমন কাঠামোর উপর মাটি, তার উপর ন্যাক্ড়ার পর্দা ও তার উপর রং দেওয়া হয়—নরদেহ-গঠনেও তেমনি কঙ্কালের কাঠামোর উপর মাংস, তার উপর পর্দা, তার উপর চামড়া থাকে ;—ইহাই হইল মোটামুটি নরদেহের গঠন।

নরদেহের কাঠামো কতকগুলি অস্থির দ্বারা গঠিত। নরদেহের সেই অস্থি-নির্মিত কাঠামোর নাম—'স্কেলিটন্' ( Skeleton ), অর্থাৎ নর-কঙ্কাল। নর-কঙ্কাল বা কাঠামোর কার্য,—মাংসগুলিকে যথাস্থানে আট্কাইয়া রাখা, নরদেহকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করা এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলিকে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করা। নরদেহের পেশীসমূহ এই কাঠামোর সহিত সংলগ্ন থাকিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে।

## নরদেহের বিভিন্ন অংশ

নরদেহ বিশ্লেষণ করিলে আমরা তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি দেখিতে পাই ; যথা—

(১) নর-কঙ্কাল বা অস্থিময় কাঠামো ( Skeleton )

(২) মাংসপেশীসমূহ বা শরীরের মাংসল অংশ ( Muscles )

(৩) স্নায়ুমণ্ডল ( Nervous System )

(৪) শরীরাভ্যন্তরস্থ রসনিঃসারক যন্ত্র ( Secretory System ) এবং মল-বহিস্কারক যন্ত্র ( Excretory System )

(৫) শ্বাস-যন্ত্র ( Respiratory Organs )

(৬) পরিপাক-যন্ত্র ( Digestive System )

(৭) রক্তসঞ্চালন যন্ত্র ( Circulatory System )

(৮) ইন্দ্রিয়াবলি ( Organs of Senses )—স্পর্শেন্দ্রিয় ( Skin ), শ্রবণেন্দ্রিয় ( Ears ), দর্শনেন্দ্রিয় ( Eyes ), ঘ্রাণেন্দ্রিয় ( Nose ) এবং আস্বাদনেন্দ্রিয় ( Tongue ) ইহার অন্তর্ভুক্ত।

## নরদেহের বিভাগ

নরদেহকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—

(১) **মস্তক** ( Head )।—মুখমণ্ডল এবং তদন্তর্গত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত প্রভৃতি এবং ত্বকের কতকাংশ এই অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। বাইশখানি হাড়ে করোটি বা মাথার খুলি ( Skull ) গঠিত। তন্মধ্যে মুখমণ্ডলের হাড় ১৪ খানি। করোটি বা মাথার খুলি একটি গোলাকৃতি বাক্স-বিশেষ। ইহার মধ্যে মস্তিষ্ক বা 'মাথার খুলি' থাকে। উহার মূলে স্নায়ু-মণ্ডলের প্রধান অংশ সংযোজিত। মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত উপরের অংশকে মস্তক বলে।

(২) **ধড়** ( Trunk )।—মেরুদণ্ডের অগ্রবিন্দু হইতে নিম্নদিকে নিতম্ব পর্যন্ত সমস্ত অংশকে ধড় বলে। এইটিই নরদেহের প্রধান অংশ। এই অংশে মেরুদণ্ড ( spine বা spinal chord ), পৃষ্ঠাস্থি (backbone), দুই পার্শ্বের পাঁজরা ( ribs ), বুকের হাড় ( breast bone ) এবং নিতম্বের হাড় ( bones of the hips ) প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। শ্বাসনালী, গলনালী, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, পাকস্থলী, মূত্রনালী প্রভৃতি এই অংশের মধ্যে পড়ে।

(৩) **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি** ( Limbs )।—দুই হাত এবং দুই পা এই অংশের অন্তর্গত। হস্তের পাঁচটি অংশ—প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, করতল ও অঙ্গুলি। হস্তের বিভাগ ও পায়ের বিভাগ একই প্রকার। অস্থির সংখ্যাও উভয়ত্র একই ; অর্থাৎ হাতেও যে কয়খানি, পায়েও সেই কয়খানি অস্থি আছে। বস্তি হইতে জানু পর্যন্ত অংশের নাম ঊরু, জানু হইতে গোড়ালী পর্যন্ত অংশ জঙ্ঘা, তারপর যথাক্রমে গোড়ালি, পায়ের পাতা ও পায়ের আঙুল।

## (১) নরকঙ্কাল বা অস্থিময় কাঠামো (Skeleton)

দুই শতাধিক ( ২০৬ খানি ) অস্থিতে নরকঙ্কাল নির্মিত। ইহার মধ্যে (১) দীর্ঘাস্থি ( Long Bones ) ৯০ খানি (চিত্রের ১২, ২৯, ২৪) ; এই অস্থির দ্বারাই প্রধানত কাঠামো নির্মিত হয়। (২) ক্ষুদ্রাস্থি ( Short Bones ) ৩০ খানি ( চিত্রের ১৮, ২৮ ) ; ইহারা পরস্পরকে আবদ্ধ রাখে। (৩) ফলকাস্থি ( Flat Bones ) ৩৮ খানি (চিত্রের ১৮, ১৮) ; মাথার খুলি, বুক ও কোমরের গর্ত বা খাঁচা ( Body Cavity ) ইহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। (৪) বিষমাস্থি ( Irregular Bones ) ৪৮ খানি ( চিত্রের ১৭, ২৫, ২৬ ) ; হস্ত-পদাদির অস্থিই প্রধানত
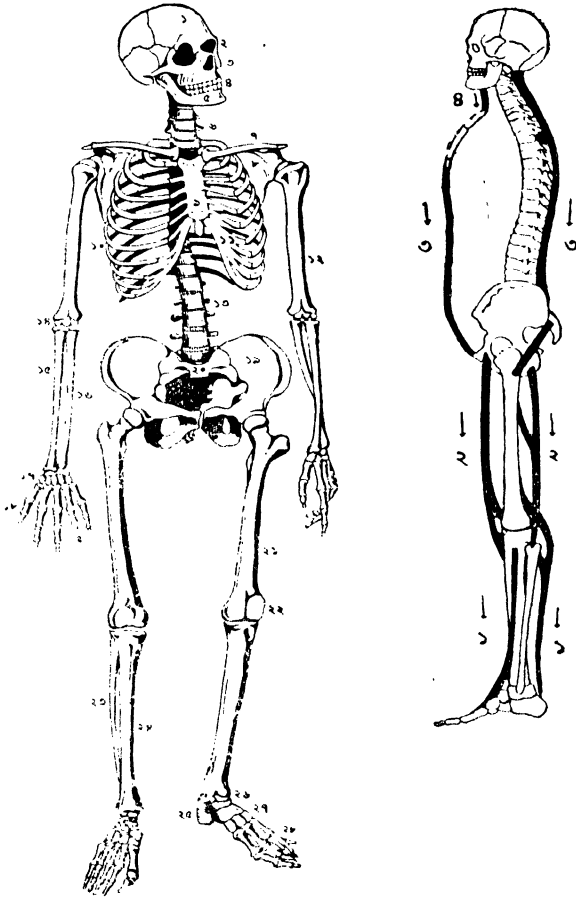
নর-কঙ্কাল—মানবদেহের অস্থি-সমাবেশ

( কোন্ অস্থির সহিত কোন্ পেশী সংযোজিত, তাহা দেখান হইয়াছে )

এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গলনালীর মধ্যস্থিত একখানি হাড় ( Hyod Bone ) এবং কর্ণপটহের মধ্যবর্তী ছয়খানি হাড় ( Auditory Ossicles ) বিষমাস্থির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

নরদেহের কোন অংশে কতকগুলি অস্থি আছে, মোটামুটি তাহার হিসাব এই :—

১। করোটি বা মাথার খুলিতে ( Skull )—২২ খানি। মুখমণ্ডল ইহার অন্তর্গত।

২। দুই পার্শ্বের দুই কর্ণে—৬ খানি। ইহাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রাস্থি।

৩। কণ্ঠনালীতে—১ খানি ( Hyod Bone )।

৪। মেরুদণ্ডে ( Vertibral Column )—২৬ খানি।

৫। দুই পাঁজরার পঞ্জরাস্থি—২৪ খানি। ইহাদের বেশীর ভাগ চেপ্টা অস্থি ( Flat Bone )।

৬। বক্ষঃ-অস্থি—১ খানি ( Breast Bone )।

৭। দুই স্কন্ধে—স্কন্ধাস্থি ৪ খানি ( Shoulder Girdle )।

৮। দুই হাতে দীর্ঘাস্থি ও ক্ষুদ্রাস্থি মিলাইয়া ৬০ খানি।

৯। শ্রোণিতে—২ খানি।

১০। দুই পায়ে দীর্ঘাস্থি ও ক্ষুদ্রাস্থি সমেত—৬০ খানি।

এই সকল অস্থিকে যথাযথভাবে সাজাইলেই একটি পূর্ণ নর-কঙ্কাল ( Skeleton ) গঠিত হয়। হাড়ের খাঁচা বা কাঠামো যদি না থাকিত, তবে আমাদের দেহের আকৃতি ঠিক থাকিত না, কিংবা আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না।

## (২) পেশী-তন্ত্র ( Muscular System )

শরীরের চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিলে, চর্বির নীচে লাল রঙের ও চ্যাপ্টা ধরণের, লম্বা আঁশযুক্ত যে মাংস-রাশি বাহির হয়, তাহারই নাম
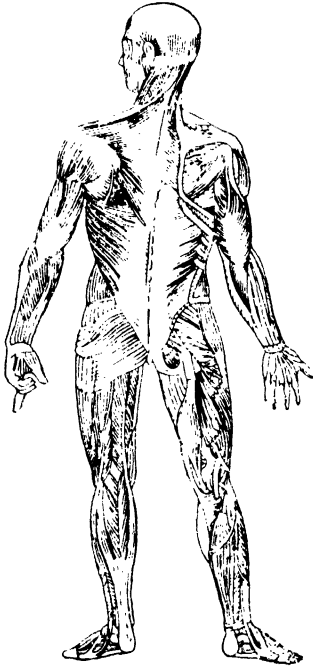
নরদেহের পশ্চাদ্ভাগস্থ পেশীসমূহ
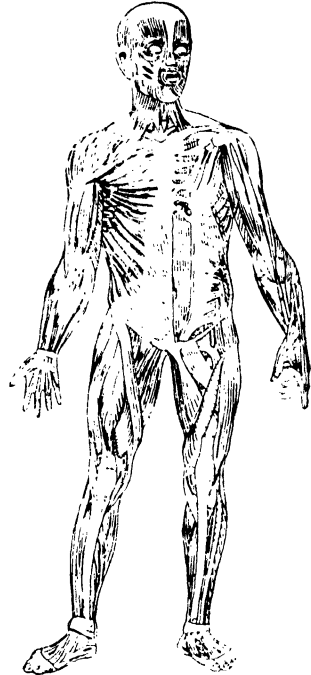
নরদেহের সম্মুখভাগস্থ পেশীসমূহ

মাংসপেশী। নরদেহের মাংসপেশীর পরিমাণ সমস্ত শরীরের ওজনের তিন ভাগেরও অধিক।

জীবের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ইচ্ছাক্রমে গমনাগমন, কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও অন্তরস্থ যন্ত্রাদির কার্যকলাপ সম্পাদন প্রভৃতি ক্রিয়া পেশী-সমূহের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্যকারিতা হিসাবে পেশীসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) ঐচ্ছিক ( Voluntary ) পেশীসূত্র,

(২) অনৈচ্ছিক ( Involuntary ) পেশীসূত্র,

(৩) হৃৎপিণ্ডের পেশীসূত্র।

কতকগুলি পেশীসূত্র একত্র মিলিয়া একটি পেশী গঠিত হয়। প্রত্যেক পেশী তিন ভাগে বিভক্ত—স্থূল-মধ্যভাগ ও সূক্ষ্ম উভয় প্রান্ত। এক প্রান্তে ইহার উৎপত্তি ( origin ) এবং অপর প্রান্তে ইহার পরিণতি ( insertion )।

উৎপত্তি স্থান হইতেই পেশীর সংকোচন আরম্ভ হয় এবং সেখানে একটি যোজনীর ( tendon ) দ্বারা অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। দ্বিতীয় প্রান্তটিও অপর একটি যোজনীর দ্বারা অপর অস্থিতে সংযুক্ত হয়। শরীরের প্রত্যেক পেশীই উত্তমরূপে শোণিত-শিরা ও স্নায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

কয়েকটি গুণের জন্য পেশীর স্থিতি স্থাপকতা প্রকটিত হইয়া থাকে :—

(১) পেশীগুলি দীর্ঘ বা সম্প্রসারিত হইতে পারে, (২) পেশীগুলি হ্রস্ব, খর্ব বা আকুঞ্চিত হইতে পারে, (৩) পেশীগুলি নিশ্চল থাকিতে পারে, (৪) উত্তেজিত হইলে সঙ্কুচিত হয় ও ফুলিয়া উঠে, (৫) মৃত্যুর পর শক্ত হইয়া যায়।

পেশীর কার্যই সংকোচন। সংকোচনকালে পেশী (ক) যে অঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সেই অঙ্গের সঞ্চালন করিতে পারে ; (খ) সঞ্চালন-কালে উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে ; এইজন্যই পরিশ্রমের পর আমাদের

শরীর উত্তপ্ত অনুভব করিতে থাকি ; (গ) পেশী ধীরে ধীরে আকারে বাড়িতে থাকে ; (ঘ) সংকোচনের ফলে পেশীর অবয়বের বিকৃতিও ( Change of Form ) ঘটিয়া থাকে।

## (৩) স্নায়ু-মণ্ডল ( Nervous System )

### বিভিন্ন বিভাগ ও তাহাদের কার্য

নরদেহের দুই দিকে, দক্ষিণ ও বাম উভয় পার্শ্বে স্নায়ুমণ্ডল বিস্তৃত রহিয়াছে। উভয় দিকের স্নায়ুমণ্ডল সমান ভাগে ও সমান ভাবে বিন্যস্ত ; অর্থাৎ, দক্ষিণ দিকে যতগুলি স্নায়ু যে ভাবে সজ্জিত আছে, বাম দিকেও ঠিক ততগুলি স্নায়ু ঠিক সেই ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। উভয় দিকের বিভিন্ন স্নায়ুর আকৃতি ও গঠন একই প্রকারের। স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি মূল অংশ আছে। একটি স্নায়ুকোষ ( Nerve Cell ), অপরটি স্নায়ুতন্তু ( Nerve Fibre )। কোষগুলি জীবন্ত—সকল শক্তির মূল। তন্তুগুলি কোষ হইতে মুক্ত শক্তির বাহক মাত্র। মস্তিষ্কে যতগুলি কোষ আছে, তাহার সকলগুলিই শরীরের সূক্ষ্মতম অংশের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি বিভাগ—প্রথম, স্নায়ুদণ্ড বা স্নায়ু-কেন্দ্র ( Nerve Centre বা Ganglion ) ; এবং দ্বিতীয়, স্নায়ুতন্তু (Nerve Fibres)। এই দুইটি দ্বারা গঠিত স্নায়ুমণ্ডলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা,—মস্তিষ্কের ও মেরুমজ্জাসংযুক্ত স্নায়ুমালা (Cerebro-spinal System ) এবং (২) সমব্যথী স্নায়ুতন্ত্র ( Sympathetic System )।

এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আবার দুই শ্রেণীর স্নায়ু আছে। এক শ্রেণীর নাম—অনুভূতি উৎপাদক স্নায়ু ( Sensory Nerves ), আর এক শ্রেণীর নাম—গতিসঞ্চারক বা কার্যকরী স্নায়ু ( Motor

Nerves )। অনুভূতি-উৎপাদক স্নায়ু শরীরের সকল স্থান হইতে সকল রকমের অনুভূতি বহন করিয়া আনিয়া স্নায়ু-কেন্দ্রে ( Nerve Centre ) পৌঁছাইয়া দেয় ; আর গতিসঞ্চারক কার্যকরী স্নায়ু স্নায়ু-কেন্দ্র হইতে কার্য-প্রেরণা বহন করিয়া কার্যস্থলে আনিয়া দেয়।

## স্নায়ু-সংস্থান

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড-রজ্জুর ( Spinal Chord ) অসংখ্য স্নায়ুকোষ ( Nerve Cells ) রহিয়াছে। ঐ কোষগুলির কতগুলি গতিসঞ্চারক স্নায়ুকোষ (Motor Nerve Cells), আর কতকগুলি অনুভূতি-উৎপাদক স্নায়ুকোষ (Sensory Nerve Cells) নামে অভিহিত হয়। স্নায়ুসূত্রগুলি ( Nerve Fibres ) এই সকল স্নায়ুকোষ হইতে বাহির হইয়াছে। কতকগুলি স্নায়ুসূত্র ( Nerve Fibres ) একসঙ্গে মিলিত হইয়া এক একটি স্নায়ু ( Nerve ) গঠন করিয়াছে।

গতিসঞ্চারক স্নায়ুসূত্রগুলি উৎপত্তিমূল মেরুদণ্ড-রজ্জু ( Spinal Chord ) মধ্যস্থিত স্নায়ুকোষ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। আবার, মেরুদণ্ড-রজ্জু হইতে স্বতন্ত্র কতকগুলি স্নায়ুসূত্র বহির্গত হইয়া পেশীসমূহের ( Muscles ) মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে পেশীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পর প্রত্যেকটি স্নায়ুসূত্র দুই তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং এক একটি শাখা এক একটি পেশীসূত্রে প্রবেশ করিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গতিকারক বা কার্যকরী স্নায়ুসূত্রগুলি পেশীর যেখানে যাইয়া শেষ হইয়াছে, সেই প্রান্ত ভাগের নাম—স্নায়ুপ্রান্ত ( End Plates )।

মেরুদণ্ড-রজ্জুর দিকে আবার এক স্নায়ু রহিয়াছে। মেরুদণ্ড-রজ্জুর ( Spinal Chord ) মধ্যে কতকগুলি মেরুদণ্ড-রজ্জু-সংপৃক্ত গণ্ড ( Spinal Ganglea ) বা গ্রন্থি আছে। অনুভূতি-উৎপাদক স্নায়ুকোষ-

সমূহ ( Sensory Nerve Cells ) এই গণ্ডগুলির মধ্যেই অবস্থিত। অনুভূতি-উৎপাদক এই সকল স্নায়ুকোষ হইতে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র বাহির হইয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং সেখান হইতে একটি শাখা ত্বকে এবং অপরটি মেরুদণ্ড-রজ্জুর ( Spinal Chord ) মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে যাইয়া পৌঁছিয়াছে এবং সেখানে অনুভূতি-উৎপাদক স্নায়ুকোষে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

## (৪) অন্তর্নিঃসরণ ও বহির্নিঃসরণ
## ( Secretory & Excretory System )

জীবদেহে রক্ত হইতে নানাপ্রকার রস উৎপন্ন হয়। সে সকল রস জীবদেহের কোন না কোন কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হইয়া থাকে। দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে শরীরের মধ্যে যে সকল রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে অন্তর্নিঃসরণ বা 'সিক্রিশন' ( Secretion ) বলে। দেহের ক্ষতিজনক যে সকল সামগ্রী দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহাকে বহির্নিঃসরণ বা 'এক্স্‌ক্রিশন' ( Excretion ) বলে।

যে প্রণালীতে শরীরে বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা নূতন রাসায়নিক জৈবগুণ ( Organic )-সম্পন্ন দ্রব্যাদি শরীরের উপকারার্থ প্রস্তুত হয়, সেই প্রণালীকে অন্তর্নিঃসরণপ্রণালী ( Secretory System ) বলা যাইতে পারে। আর, যে প্রণালীতে বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত শরীরের পক্ষে বিষতুল্য অপকারী ও অসার দ্রব্যাদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহাকে বহির্নিঃসরণ বা বহিঃস্রাব প্রণালী ( Excretory System ) বলে।

অন্তর্নিঃসরণ প্রণালী একটু জটিল, কারণ, পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র দ্বারা পৃথক্‌ভাবেই অন্তর্নিঃসৃত পদার্থ প্রস্তুত হয়। সুতরাং অন্তর্নিঃসরণকারী যন্ত্রকে তুলিয়া লইলে আদৌ নিঃসরণোপযোগী পদার্থ উৎপন্ন হয় না; যেমন, লালা-নিঃসরণকারী গ্রন্থি (Salivary Glands) উঠাইয়া লইলে লালা নিঃসৃত হয় না। কিন্তু বহির্নিঃসরণকারী যন্ত্র, যেমন মূত্রগ্রন্থি (Kidney) কার্যক্ষম না থাকিলে, তাহার কার্য অংশত ঘর্মোৎপাদন যন্ত্রের দ্বারাও হইতে পারে। সুতরাং, কোন বহির্নিঃসারক যন্ত্র রোগগ্রস্ত হইলে অথবা তাহাকে তুলিয়া লইলে, বহির্গমনশীল পদার্থসকল রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং তাহার কতকাংশ অন্যান্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

উল্লিখিত একটি প্রভেদ ব্যতীত বহির্নিঃসরণ এবং অন্তর্নিঃসরণ ক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে কার্যত এক সঙ্গে চলিয়া থাকে।

## মলনিঃসারক গ্রন্থিনিচয়

**(ক) মূত্রগ্রন্থি** (Kidney)।—ইহা দ্বারা শরীর হইতে অসার পদার্থ মূত্রের সহিত দ্রবীভূত অবস্থায় নির্গত হইয়া যায়।

**(খ) স্নেহগ্রন্থি** (Sebaceous Glands)।—এই গ্রন্থি দ্বারা শরীর হইতে তৈলময় পদার্থ বিনির্গত হয়। ইহার কার্য কেশকলাপকে মসৃণ ও কান্তিযুক্ত করা।

**(গ) ঘর্ম-নিঃসারক গ্রন্থি** (Sweet Glands)।—এই গ্রন্থি রক্ত হইতে ভুক্তাবশেষ সামগ্রীসমূহ পৃথক্ করিয়া দেহ হইতে ঘর্মরূপে বাহির করিতেছে। মূত্রগ্রন্থির কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত না হইলে, এই গ্রন্থি ঘর্ম দ্বারা শরীর হইতে অসার দ্রব্যসমূহ বাহির করিয়া দেয়।

**(ঘ) অশ্রু-নিঃসারক গ্রন্থি** ( Lacrymal Glands )।—ইহা দ্বারা অশ্রু বিনির্গত হয়।

**(ঙ) নাসিকা ও শ্বাসনালীর গ্রন্থিনিচয়**।—ইহাদের দ্বারা কফ নির্গত হয়।

**(চ) অন্ত্রস্থ মল-নিঃসারক কোষাবলী** ( Goblet Cells )।—বৃহদন্ত্রস্থ কোষাবলী মল-নিঃসরণ করিয়া থাকে।

## সারোৎপাদক গ্রন্থিনিচয়

**লালা-নিঃসারক গ্রন্থি**—সাবলিংগুয়েল ( Sublingual ) গ্রন্থি ঠিক জিহ্বার নিম্নে অবস্থিত; সাবম্যাক্সিলারি ( Submaxillary ) মাড়ির নিম্নে অবস্থিত এবং প্যারোটিড ( Parotid ) উভয় কর্ণমূলের নিম্নে অবস্থিত। এই তিন জোড়া লালা-নিঃসারক গ্রন্থি।

**অন্ত্রস্থ জীর্ণকারী রসোৎপাদক গ্রন্থিনিচয়**—পাকস্থলীর এসিনার ( Acinar ) অম্লরসোৎপাদক কোষাবলি ও তৎসংশ্লিষ্ট নলীর আকর গ্রন্থিনিচয় ( Tubular Glands ) লম্বাভাবে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে স্থাপিত আছে। এই গ্রন্থির কোনটি অবিভক্ত এবং কোনটি বা নিম্নে বিভক্ত।

**দুগ্ধ-নিঃসারক গ্রন্থি বা স্তনগ্রন্থি** ( Mammary Glands )—এই গ্রন্থি হইতে দুগ্ধ-নিঃসরণ ( Secretion ) হয়। প্রসব-কাল হইতে এই গ্রন্থি দ্বারা ক্রমাগত দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপে সাধারণত প্রায় আট নয় মাস স্তনে দুগ্ধ থাকে। লালা-নিঃসারক গ্রন্থির ন্যায় এই গ্রন্থিরও কোষাবলি ( Lobule ) ও নলী ( Duct ) আছে। দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়া সেই নল দ্বারা নিঃসৃত হয়।

**নলীহীন গ্রন্থি**—(Ductless Glands)—উল্লিখিত অন্তর্নিঃসরণ বা অন্তর্নিঃস্রব ( Secretion ) এবং বহির্নিঃসরণ বা বহিঃস্রব ( Excretion ) ব্যতীত আরও কতকগুলি গ্রন্থি আছে। সেই সকল গ্রন্থি দ্বারা নিঃসারক গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ার অনুরূপ প্রক্রিয়ার রক্ত হইতে কোন কোন পদার্থ নিষ্কাশিত এবং পরে পরিবর্তিত হয় ; যে গ্রন্থির মধ্যে ঐ সকল সামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বাহির অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়াই পুনরায় তাহা লিম্ফ ( Lymph ) বা রক্তমধ্যে নীত হয়। এই রূপান্তরিত নিঃসরণ-ক্রিয়া যে সকল গ্রন্থি মধ্যে সংসাধিত হয়, তাহাদিগকে নলীহীন গ্রন্থি ( Ductless Glands ) বলে। নিম্নলিখিত গ্রন্থিনিচয় এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ; যথা,—

প্লীহা ( Spleen ), থাইমাস গ্রন্থি ( Thymus ), থাইরয়েড গ্রন্থি ( Thyroid ), অধিবৃক্কগ্রন্থি ( Suprarenal ), যকৃৎ ( Liver ), ক্লোম ( Pancreas ), অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি ( Pituitary Glands ), অধিমস্তিষ্ক গ্রন্থি ( Pineal Glands ) পূর্বান্ত্র-ঝিল্লী ( Duodenal Mucus Membrane ) প্রভৃতি।

**প্রক্রিয়া প্রণালী**—খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে হইলে লালার প্রয়োজন। সুতরাং, মুখ-গহ্বরের মধ্যে তিন জোড়া লালাস্রাবক গ্রন্থি লালা সরবরাহ করে। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপ্‌সিন, ক্লোম হইতে ট্রিপ্‌সিন ও যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া খাদ্য পরিপাক করে। বৃক্ক হইতে প্রস্রাব নিঃসৃত হইয়া মূত্রকোষে সংগৃহীত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ জমিলে, জল ও ইউরিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয়। ঘর্মগ্রন্থি দিয়া জল, লবণাক্ত দ্রব্য ও ইউরিয়া শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। অক্ষিগোলকের ঝিল্লী সিক্ত

রাখিতে অহরহ জলের প্রয়োজন। এই জন্য অশ্রুগ্রন্থির স্রাব নির্গত হয়। এই বিশেষ বিশেষ রস ছাড়াও অন্তর্নিঃসারক গ্রন্থির রস প্রতিনিয়ত শরীরের কার্যে ব্যয়িত হইতেছে। থাইরয়েড ( Thyroid ) গলনালীর উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান আছে। থাইরয়েড হইতে থাইরোডিন রস শরীরের চিনি ভস্মীভূত করিয়া তাপ রক্ষা করিতেছে ও শরীরকে বহিঃশত্রু-রূপ জীবাণু ধ্বংস করিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া দিতেছে। থাইরয়েডের মধ্যে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত থাকে। এই গ্রন্থি শরীরের চূণের ভাগ রক্ষা করিয়া থাকে ও ইহার অভাব হইলে নানা প্রকার কম্পন ব্যাধির ( Tetany ) সৃষ্টি হইতে পারে। দুইটি বৃক্কের উপরিভাগে দুইটি ঊর্দ্ধ বৃক্কগ্রন্থি ( Suprarenal ) বিদ্যমান থাকে। ইহাদের রস শরীরে রক্তের চাপ রক্ষণ করে ও ইহাদের রসই এড্রিন্যালিন্। মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি গ্রন্থি আছে। অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি ( Hypophysis ) ও ঊর্দ্ধমস্তিষ্ক গ্রন্থি ( Pineal )। ইহাদের রসও সর্বদা শরীরের নানা কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

## বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি ( Kidneys )

বৃক্ক দুইটি দেখিতে ঠিক শিমের বীজের মত। বাংলা '৫' সংখ্যা দেখিতে যেরূপ, এক একটি বৃক্কের আকৃতিও ঠিক সেইরূপ। উদর প্রদেশের অভ্যন্তরে, দুই দিকের কুক্ষি প্রদেশে ( Lumber ), পেরিটোনিয়মের ( Peritonium ) পশ্চাদ্ভাগে, পঞ্জরাস্থির নিম্নে মেরুদণ্ডের সন্নিকটে বৃক্ক ( Kidney ) দুইটি অবস্থিত। বৃক্কের 'মেডুলার' অংশ দ্বাদশটি পিরামিড্ বৎ পদার্থে নির্মিত। পিরামিড্ গুলি গুচ্ছবদ্ধ প্রস্রাবনল ( Urine Tube ) ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এক একটি বৃক্ক হইতে এক একটি মূত্রনালী ( Ureter ) আসিয়া মূত্রাশয়ে

( Bladder ) প্রবেশ করিয়াছে। প্রস্রাব জন্মিবামাত্র তাহা এই মূত্রনালীর মধ্য দিয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। তার পর উহা মূত্রনালীর মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়।

**মূত্রাশয়**—( Bladder )।—দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্বে মূত্র, মূত্রাশয় বা ব্লাডারের মধ্যে সঞ্চিত হয়। মূত্রাশয়ের চারিটি আবরণ—(১) সিরস্, (২) পৈশিক, (৩) সাব-মিউকস্ এবং (৪) মিউকস। ব্লাডারের মুখের মাংসপেশীসমূহ একটি স্ফিংটার ( Sphincter ) গঠন করিয়াছে। এই সকল পৈশিকতন্তু '8'এর আকারে সজ্জিত। ব্লাডারের মধ্যে রক্তবহা নাড়ী, লসিকা ও স্নায়ু আছে। মূত্রাশয়ের পেশীগুলির সংকোচনের ফলে মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ের পশ্চাদ্দিকের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র আছে। ইউরেটারের মধ্য দিয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব রাতদিন ইহার মধ্যে জমে ; আবার সম্মুখের ছিদ্র দিয়া তাহা বাহির হইয়া যায়।

## (৪) শ্বাসযন্ত্র ( Respiratory System )

যে যন্ত্রের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে শ্বাস-যন্ত্র বলে। নাসা-গহ্বর ( Nasal Cavity ), গলনালী ( Pharynx ), স্বরনালী ( Larynx ), শ্বাসনালী ( Trachea ), শ্বাস-শাখানালী ( Bronchii ) এবং ফুস্‌ফুস্ ( Lungs ) লইয়া শ্বাসযন্ত্রটি গঠিত। ফুস্‌ফুস্‌টি বায়ুকোষরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। মাংসপেশী এবং স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্র শ্বাস-কার্যের সহায়তা করে।

শ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া গলনালী হইয়া স্বরনালীতে পৌছিবার পর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীটি

একটি গোলাকার নল-বিশেষ। ইংরাজি 'C' (সি) অক্ষরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ছোট ছোট অর্ধ গোলাকার উপাস্থি ( Cartilage Ring ) দ্বারা শ্বাস-নালী (Trachea) সংরক্ষিত। উপাস্থিগুলি পরস্পর অসম-ভাবে সাজান এবং উহাদের ফাঁকা অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশীর দ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ। সমস্ত শ্বাসনালীটা একটি পর্দা দিয়া ঢাকা। এই উপাস্থিগুলির সহিত দৃঢ়সম্বদ্ধ বলিয়াই শ্বাসনালীটি সর্বদা ফাঁক হইয়া থাকে।

গলনালীর ( Larynx ) দুই পার্শ্বে যে দুইটি ছোট মাংসপিণ্ড রহিয়াছে, তাহার নাম 'টন্সিল' ( Tonsil )। উহার উপরে আল্‌জিভ্ ( Uvula )। গলনালীর ঠিক নীচু হইতে শ্বাসনালী ( Trachea ) আরম্ভ
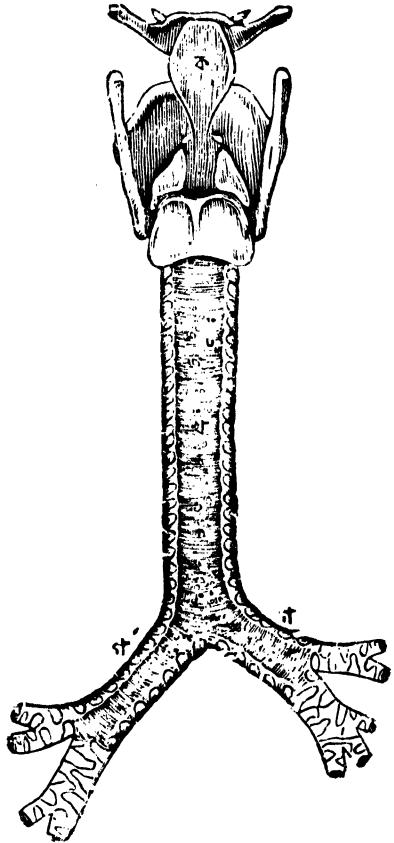
লেরিংস, ট্রেকিয়া ও ব্রংকসের সাধারণ প্রতিকৃতি—(পশ্চাদ্দিক হইতে)। ক এপিগ্লটিস্ (আলজিভ্), খ ট্রেকিয়ার পশ্চাদ্দিকের ঝিল্লীর অংশ, গ দক্ষিণ ও গ' বাম ব্রংকস্।

হইয়াছে। তাহার পর দুইটি শ্বাস শাখানালী ( Bronchii ) আছে। শ্বাস-নলের উপরকার অংশের নাম 'গ্লটিস' ( Glottis ) বা বায়ু-পথ। এই বায়ু-পথের উপরে একটা ঢাক্‌নি ( Valve ) আছে। আমরা যখন কিছু আহার করি, তখন সেই খাদ্য ঐ পর্দার কাছাকাছি
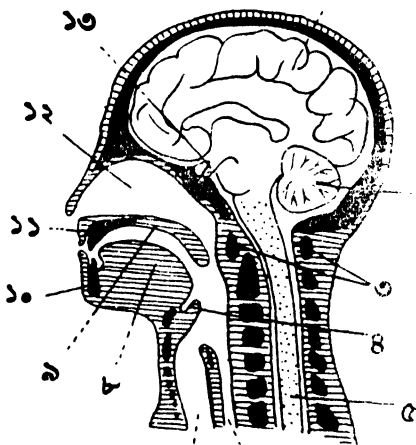
মস্তক ও গলদেশ

১মহামস্তিষ্ক, ২ পশ্চাৎ মস্তিষ্ক, ৩ মেরুদণ্ডের অস্থি, ৪ বায়ুনালীর মুখের পর্দা, ৫ মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুরজ্জু, ৬ অন্ননালী, ৭ বায়ুনালী, ৮ জিহ্বা, ৯ তালু, ১০ ও ১১ দাঁত, ১২ নাসাগহ্বর

আসিলেই পর্দাটি বায়ুপথ বন্ধ করিয়া দেয়। সেইজন্য খাদ্য-সামগ্রী বায়ুপথ দিয়া ফুস্‌ফুসে যাইতে পারে না, দ্বিতীয় নলটি, অর্থাৎ, অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া উপস্থিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিম্ন কক্ষ হইতে হৃৎপিণ্ডের শিরা দিয়া ( Pulmonary Artery ) যে শোণিত-ধারা ফুস্‌ফুসে আসে, সেখানে বাহিরের হাওয়া হইতে যে বায়ু শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে, তাহা হইতে সেই শোণিত-ধারা অম্লজান ( Oxygen ) বাষ্প লইয়া কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস্ ( Carbonic Acid Gas ) ছাড়িয়া দেয়। ফলত, এই গ্যাসের আদান-প্রদান হইতে শরীরকে অম্লজান গ্যাস্ ( Oxygen Gas ) দেওয়াই শ্বাসযন্ত্রের কার্য। আদান-প্রদান কায শেষ হইলে হৃৎপিণ্ড আবার পরিশুদ্ধ শোণিতরাশিকে ইহার বাম কক্ষে গ্রহণ করত সকল শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্ প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮ বার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

## (৬) পরিপাক-যন্ত্র ( Digestive System )

দেহের ক্ষয়পূরণ করিয়া দেহপুষ্টির ও দেহবৃদ্ধির জন্য প্রাণীমাত্রেরই নূতন নূতন সামগ্রীর আবশ্যক হয়। আমরা খাদ্য হইতে সেই সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হই। ইতস্তত গমনাগমন এবং নানা কার্য সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়; সে শক্তি খাদ্য হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। তাহা ছাড়া, শরীরের তাপ-সঞ্চার ও তাপ-সংরক্ষণ এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন তন্তুর ক্ষয়-পূরণ খাদ্যের দ্বারাই হইয়া থাকে। তবে, আহারের সময় যে খাদ্য যে অবস্থায় আমরা মুখের মধ্যে গ্রহণ করি, সেই খাদ্য-সামগ্রী তরল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরীরে শোষণোপযোগী না হইলে, তাহাতে দেহের কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহার্য সামগ্রী রক্তের সহিত মিশিবার উপযুক্ত হয়, তাহাকে পরিপাক ক্রিয়া বলে। পরিপাক-যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য পরিবর্তিত ও শোষণের উপযুক্ত হয়।
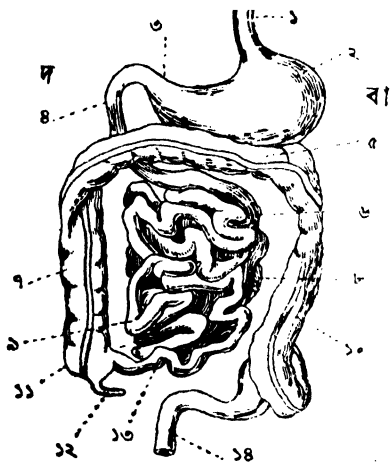
পরিপাক-যন্ত্র

১ অন্ননালী, ২ পাকস্থলী, ৩, ৪ ডিউওডেনম্, ৫, ৭, ১০, ১১ বৃহদন্ত্র ও তদন্তর্গত অংশসমূহ, ৬, ৮, ৯, ১৩, ৪ ক্ষুদ্রান্ত্র ও তাহার বিভিন্ন অংশ, ১৪ সরলান্ত্র বা রেক্টম। দ ডানদিক্, বা বামদিক্।

মুখ-বিবর হইতে আরম্ভ করিয়া মল-দ্বার পর্যন্ত সমস্ত অংশ পরিপাক-যন্ত্রের ( Digestive System ) অন্তর্ভুক্ত। পরিপাক-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ ফুট। পরিপাক-যন্ত্রের সমস্ত অংশটি একটি নালীবিশেষ। ইহাকে পরিপাক-নালী বা 'অ্যালিমেণ্টারি কেনাল' ( Alimentary Canal ) বলে।

পরিপাক-যন্ত্রের নানা বিভাগ আছে। সেই বিভাগগুলি এই,—(১) মুখ-গহ্বর এবং তদন্তর্গত দন্ত, জিহ্বা, তালু, লালা-নিঃসারক গ্রন্থি ( Salivary glands )-সমূহ; (২) গলনালী ( Pharynx ) ও তদন্তর্গত আলজিভ ( Uvula ) ও টন্সিল ( Tonsil ); (৩) অন্ননালী (Esophagus—Gullet), (৪) পাকস্থলী (Stomach), (৫) ক্ষুদ্র অন্ত্র ( Small Intestines, Gut ), (৬) যকৃৎ ( Liver ), (৭) ক্লোমযন্ত্র ( Pancreas ), (৮) পিত্তকোষ ( Gall Bladder ), (৯) বৃহদন্ত্র ( Large Intestines—Colon or Gut ), (১০) সরলান্ত্র ( Rectum ) এবং (১১) মলদ্বার ( Anus )।

খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে গৃহীত হইবামাত্র সেখানে পরিপাক-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভক্ষ্য সামগ্রী প্রথমে সম্মুখের দন্ত দ্বারা ছেদিত ও কর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার দ্বারা তাহা এদিক্ ওদিকে আলোড়িত হইতে থাকে। আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে ছেদিত ও কর্তিত খাদ্য-দ্রব্য ক্রমশ মুখ-গহ্বরের দুই পার্শ্বে চর্বণ-দন্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে সেই খাদ্য কুট্টিত ও চর্বিত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দুই পার্শ্বের তালু, জিহ্বা ও অন্যান্য স্থানের লালা-স্রাবক গ্রন্থি হইতে লালা ( Saliva ) আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়। লালারস খাদ্যদ্রব্যের পরিপাকে বিশেষ সহায়তা করে। উত্তমরূপে লালা মিশ্রিত করিতে হইলে, খাদ্য-দ্রব্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চিবাইতে হয়। পরিপাক-ক্রিয়ার ইহাই প্রথম অবস্থা।

অতঃপর লালা-সংযোগে পিচ্ছিল ও অপেক্ষাকৃত তরল চর্বিত খাদ্য, গলনালীর ( Pharynx ) মধ্য দিয়া অন্ননালী ( Trachea ) হইয়া পাকাশয়ে ( Stomach ) আসিয়া উপস্থিত হয়। গলনালী ও অন্ননালী পেশীনির্মিত নলবিশেষ। উভয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ইঞ্চি। পাকস্থলীটি পেশীগঠিত একটি থলির ( Bag ) মত। খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা থাকে। সেখানে উহার সহিত পাকাশয়িক রস ( Gastric Juice ) মিশ্রিত হয়। পরিপাক-ক্রিয়ার ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা।

প্রায় তিন চারি ঘণ্টা পাকস্থলীতে থাকিবার পর, খাদ্য-দ্রব্য ক্ষুদ্র-অন্ত্রে ( Small Intestines ) প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র-অন্ত্রটিও একটি পেশীনির্মিত নল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ফুট। এই অংশ অতিক্রম করিতে
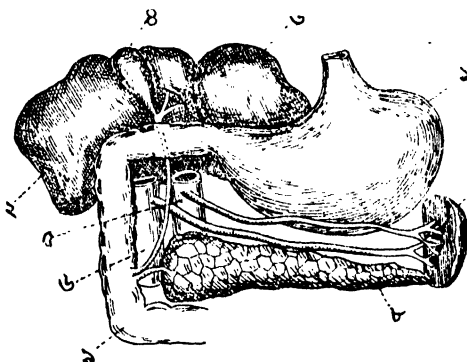
১ পাকস্থলী, ২, ৩ যকৃৎ, ৪ পিত্তকোষ ( Gall Bladder ),
৮ প্যাংক্রিয়স, ৯ ডিউওডেনম্, ৭ প্লীহা, ৫, ৬ প্লীহার শিরা ও ধমনী।

সাধারণত খাদ্য-দ্রব্যের ৩ হইতে ৪ ঘণ্টা লাগে। এখানে উহা যকৃৎ হইতে নিঃসৃত পিত্তরস ( Bile ) ও ক্লোমযন্ত্র হইতে নিঃসৃত ক্লোমরস

( Pancreatic Juice ) এবং আন্ত্রিক রস প্রভৃতির সহিত মিশিতে থাকে। পরে ক্ষুদ্র-অন্ত্র হইতে খাদ্য-দ্রব্য বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। ভুক্তদ্রব্যের যে অংশ অন্ননালী হইতে ক্ষুদ্র-অন্ত্রে প্রবেশ করা পর্যন্ত শোষিত হইতে পারে নাই, তাহা বৃহদন্ত্রে আসিয়া শোষিত হয়। বৃহদন্ত্রও একটি পেশীনির্মিত নলবিশেষ। ইহা পাঁচ হইতে ছয় ফুট লম্বা। এখানে আসিবার পর খাদ্য-দ্রব্যের যে অংশ রক্তের সহিত মিশিতে পারে না সেই অপরিপাচ্য পরিত্যাজ্য পদার্থ মলরূপে সরলান্ত্রে ( Rectum ) আসিয়া উপস্থিত হয়। সরলান্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় নয় ইঞ্চি। সরলান্ত্রে আসিবার পর পরিত্যাজ্য ও অপরিপাচ্য পদার্থ মলদ্বার ( Anus ) দিয়া বাহির হইয়া যায়। মুখের মধ্যের খাদ্য-দ্রব্য যখন চর্বিত হইতে থাকে, সেই সময় মুখমধ্যস্থ কেশবৎ সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ীসমূহ খাদ্যাংশ তরল হইবামাত্র যতটা সম্ভব রক্তোপযোগী অংশ শোষণ করিয়া লয়। এইরূপ গলনালীর মধ্য দিয়া খাদ্য-দ্রব্য যাইবার সময় গলনালী রক্তোপযোগী অল্প কতকটা অংশ চুষিয়া লইয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়। গলনালীর পর পাকস্থলী এবং পাকস্থলীর পর অন্ত্র প্রভৃতি—যাহার যতটা শক্তি, খাদ্য-দ্রব্যের ততটা অংশ সে শোষণ করিয়া লইয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়। এইরূপে, পরিপাক-ক্রিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের সারাংশ ক্রমশ রক্তের সহিত মিশিতে থাকে।

### (৭) রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র ( Circulatory System )

শরীরের মধ্যে শোণিতের বৃত্তাকারে ভ্রমণের নাম—শোণিত-সঞ্চালন ক্রিয়া। শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করত প্রতি কোষকে সার প্রদান করিয়া ও তাহাদের
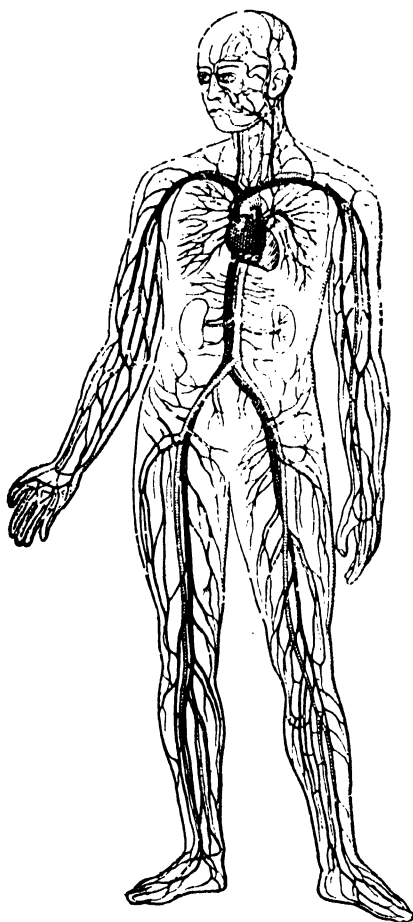
শোণিত সঞ্চালন

পরিত্যক্ত অসার দ্রব্য নিঃসরণ করিয়া, পুনরায় হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়। এই সঞ্চালন-ক্রিয়া যথাযথরূপে সম্পাদন-পক্ষে (১) একটি কেন্দ্রীয় 'পাম্পের' (pump) উপযুক্ত কার্যকারিতা ও (২) স্থিতি-স্থাপক (elastic) নলের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

কেন্দ্রীয় পাম্প বা হৃৎপিণ্ড পেশী-নির্মিত যন্ত্র। পরিণত-বয়স্ক নর-নারীর হৃৎপিণ্ডের ওজন সাত হইতে আট আউন্স পর্যন্ত হইয়া থাকে। মধ্য বয়স পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের ভার বৃদ্ধি পায়; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে হৃৎপিণ্ডের ওজন কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়।

হৃৎপিণ্ড কোণাকার পেশীনির্মিত যন্ত্র। উহার চূড়াটি নিম্নমুখ এবং

মূলদেশ উর্দ্ধমুখ। হৃৎপিণ্ড শূন্যগর্ভ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ বামে ও দক্ষিণে দুইটি করিয়া চারিটি কক্ষে বিভক্ত। বামভাগের কক্ষদ্বয় এবং দক্ষিণভাগের কক্ষদ্বয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দুই অংশের সংযোগ সূত্র-স্বরূপ কোনও পথ নাই; কিন্তু, প্রত্যেক দিকের উপরিস্থিত কক্ষের সহিত তাহার নিম্নস্থিত কক্ষের সংযোগ আছে। মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র চারিটি কক্ষে বিভক্ত :—

(১) দক্ষিণ উর্দ্ধ কক্ষ ( Right auricle )
(২) দক্ষিণ নিম্ন কক্ষ ( Right ventricle )
(৩) বাম উর্দ্ধ কক্ষ ( Left auricle )
(৪) বাম নিম্ন কক্ষ (Left ventricle )
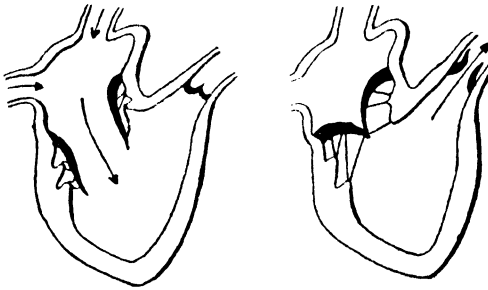
হৃৎপিণ্ডের দুইটি ভাগ। বাম ও দক্ষিণ ভাগের কক্ষদ্বয় ও তাহাদের বিভাগ

দক্ষিণ উর্দ্ধ কক্ষ ও দক্ষিণ নিম্ন কক্ষের মধ্যে একটি পথ আছে। ঐরূপ বাম উর্দ্ধ ও বাম নিম্ন কক্ষের মধ্যেও একটি সংযোগ-পথ রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ উর্দ্ধ কক্ষ ও বাম উর্দ্ধ কক্ষের মধ্যে বা বাম নিম্ন কক্ষ ও দক্ষিণ নিম্ন কক্ষের মধ্যে কোন পথ নাই।

মানুষের সমস্ত শরীরে যে রক্তরাশি সঞ্চালিত হয়, তাহা একটি বৃহৎ উর্দ্ধ শিরা ( Superior Vena Cava ) ও একটি বৃহৎ নিম্ন শিরা
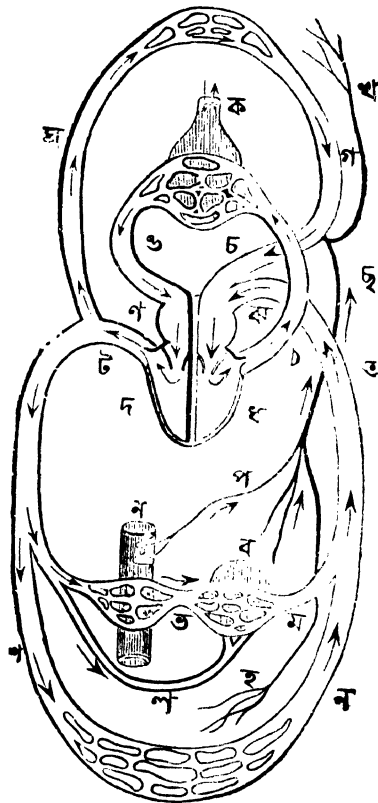
ণ বাম উর্ধ্বকক্ষ, দ বাম নিম্নকক্ষ, ট এওর্টা, খ উর্ধ্বাঙ্গের লসিকা, শ নিম্নাঙ্গের ধমনী. ল হিপাটিক ধমনী, গ উর্ধ্বাঙ্গের শিরা, ন নিম্নাঙ্গের শিরা. ভ পোর্টাল শিরা, ম হিপাটিক শিরা, ঝ ইনফিরিয়র ভেনাকেভা, চ সুপিরিয়র ভেনাকেভা ধ দক্ষিণ নিম্নকক্ষ, ঠ পাল্‌মোনারি ধমনী, ক ফুস্‌ফুস্‌, প ল্যাকটিয়াল. হ লিম্ফাটিক, ছ থোরাসিক ডাক্‌ট, ন পরিপাক নালী, ব যকৃৎ, তীরগুলি রক্ত, লিম্ফ ও কাইলের গতি-নির্দেশক

দ্বারা ( Inferior Vena Cava ) হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ঊর্ধ্ব কক্ষে ( Right Auricle ) ফিরিয়া আসে।

দক্ষিণ ঊর্ধ্ব কক্ষ হইতে শোণিতরাশি দক্ষিণ নিম্ন কক্ষে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিম্ন কক্ষটি শোণিত-পূর্ণ হইবার পর উহার পেশীময় প্রাচীর ( muscular wall ) সংকুচিত হয়। অমনি সঞ্চিত শোণিত-রাশি শ্বাসযন্ত্র-শিরার ( pulmonary artery ) মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে ; কিন্তু, প্রবাহিত শোণিতধারা আর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব কক্ষে ফিরিয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, উক্ত দক্ষিণ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন কক্ষের প্রবেশ-পথ এমনই চর্মময় কপাটযুক্ত ( Tricuspid valve ) যে, রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। বামদিকের ব্যবস্থাও ঠিক একই প্রকার।

হৃৎপিণ্ড ও তাহার সহিত সংলগ্ন ধমনী ও শিরা

পূর্ব-প্রদত্ত চিত্রে হৃৎপিণ্ডের দুইটি অংশ দেখান হইয়াছে। প্রথম চিত্রে শোণিত-প্রবাহ দক্ষিণ নিম্ন কক্ষে প্রবেশ করিতেছে এবং ত্রিচূড় কপাট-যুক্ত ( Tricuspid valve ) রহিয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রে নিম্ন কক্ষ হইতে শোণিতধারা শ্বাসযন্ত্র-শিরায় প্রবেশ করিতেছে। উহার ত্রিচূড়পেশী-চালিত কপাট বন্ধ আছে এবং শ্বাসযন্ত্র-শিরা ও নিম্নকক্ষের সংযোগ-স্থলের কপাট-দুইটি মুক্ত রহিয়াছে।

শোণিতধারা শ্বাস-যন্ত্র শিরার দ্বারা ফুস্‌ফুসে নীত হইলে সেখানে অসার কার্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া, অম্লজান ( Oxygen )

গ্যাস লইয়া বিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডের বাম ঊর্দ্ধ কক্ষে প্রবেশ লাভ করে। সেখান হইতে বাম নিম্ন কক্ষে প্রবেশ করিবার পর পেশীময় বাম কক্ষে প্রাচীরের সংকোচন হেতু শোণিতধারা নিম্ন কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মুকুটবং বা 'মাইট্রাল ভ্যাল্‌ভ' ( mitral valve )-বশত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতে না পারিয়া এওটাতে ( Aorta ) প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তথা হইতে শোণিতধারা সর্বশরীরে নীত হয়।

## বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়সমূহ

### ( Organs of Special Senses )

আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানের মূল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় হইতে আমরা সেই অনুভূতি প্রাপ্ত হই। পঞ্চেন্দ্রিয় লইয়া মানবদেহের চেতনাবাহী জ্ঞানতন্ত্র ( Sensory System ) গঠিত।

মুখের অব্যবহিত উপরেই নাক। কোন কিছু খাইতে বসিলে প্রথমেই নাকে তাহার গন্ধ যায়। নাক বলিয়া দেয়, সে দ্রব্যে কোনও দোষ আছে কিনা এবং সে দ্রব্য খাওয়া উচিত কিনা। নাকের ঠিক গোড়ায় দুই দিকে দুইটি চক্ষু। সংসারের যাবতীয় সামগ্রী দেখিয়া চক্ষু বলিয়া দেয়—কোথায় কোন্ শত্রু লুক্কায়িত আছে, কোথায় কোন্ বিপদ্ উপস্থিত, কোন সামগ্রী আমাদের পক্ষে উপকারী এবং কোন্‌টি অপকারী। চক্ষুর নির্দেশ অনুসারে আমরা মন্দটি ফেলিয়া ভালটি বাছিয়া লইতে পারি।

নাকের ও মুখের কয়েক ইঞ্চি পরেই, দক্ষিণ ও বাম দিকে, দুইটি শ্রবণেন্দ্রিয় অবস্থিত। শব্দ শুনিয়া কর্ণ আমাদিগকে বিপদ্-আপদের

কথা জানাইয়া দেয়। কোন্‌টি আমাদের আনন্দদায়ক এবং কোন্‌টি বিরক্তিকর, শব্দ শুনিয়া কর্ণ তাহা ধরিয়া ফেলে।

ত্বক্‌ স্পর্শেন্দ্রিয় এবং জিহ্বা স্বাদনেন্দ্রিয়। মুখ-গহ্বরের অভ্যন্তরস্থিত জিহ্বা স্বাদ-গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত স্বাদনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। স্বাদনেন্দ্রিয়কে স্পর্শেন্দ্রিয়ের রূপান্তর বলা যাইতে পারে। স্পর্শ ও ঘ্রাণ—এই দুইটির সহযোগ ভিন্ন জিহ্বার স্বাদ-গ্রহণ শক্তি অল্পই দেখা যায়।

স্বাদনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা চারিটি মূল রসের সন্ধান পাই—অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত ও লবণ। বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রণে এই চারিটি রস হইতে আবার বহু রসের সৃষ্টি হয়।

উপরে যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইল, তাহার প্রত্যেকটি স্ব স্ব কার্যের উপযোগী করিয়া গঠিত এবং প্রত্যেকটি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত।

## দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু ( Eye )

সম্মুখ-ললাটাস্থি, গণ্ডের অস্থিদ্বয় এবং নাসাস্থিদ্বয়—এই পাঁচখানি অস্থির দ্বারা অক্ষিকোটর ( Orbit ) রচিত। এই চক্ষুকোটর দুইটি ফাঁপা অস্থিময় গহ্বর বিশেষ। ইহারই মধ্যে অক্ষি নিহিত রহিয়াছে। ছয়খানি ক্ষুদ্র মাংসপেশীর দ্বারা চক্ষু দুইটি চক্ষুকোটরে আবদ্ধ। সেই-জন্য আমরা ইচ্ছা করিলেই চক্ষু দুইটি এদিক্‌ ওদিক ঘুরাইতে পারি। এই মাংসপেশীগুলি যথা-বিন্যস্ত না হইলেই চোখের দৃষ্টি 'টেরা' ( Squint Eyes ) হয়।

অক্ষিপুট এবং অক্ষিগ্রন্থিনিচয় ( Lachrymal Glands ) অক্ষি-পুটদ্বয় চর্মের দুইটি ভাগ মাত্র। ইহার ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ বক্রাকারে

সাজান ভ্রূ-যুগলের রোমশ্রেণী আছে। চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত করিলে ধূলাদি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। অক্ষিপুটের ভিতরের দিক ও গোলকের সম্মুখের দিক্ একখানি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত। ইহাকে Conjunctive বলে। উভয় অক্ষি-গহ্বরের বাহিরের দিকের কোণে অশ্রুগ্রন্থি আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই গ্রন্থির অল্প অল্প নিঃসরণে চক্ষুকে সরস রাখে। অশ্রুবারি উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর ভিতরের কোণে অশ্রুকোষে ( Lachrymal Sac ) জমা হয়। এই কোষটি স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ হইলে, নাসাপথ ( Nasal Duct ) দ্বারা নাসিকাতে প্রবাহিত হইয়া উক্ত গহ্বর সরস রাখে। অক্ষিপুটের চতুর্দিকস্থ মাংসপেশীর সংকোচনে অক্ষিপুটদ্বয় বন্ধ হয়। ইহাদের স্নায়ুত্রয়কে দর্শন-স্নায়ু বলে।

বাহিরের দ্রব্য আলোকিত হইয়া, তাহাদের প্রতিবিম্ব সম্মুখের প্রকোষ্ঠের ছিদ্রের ( মণির ) মধ্য দিয়া জলীয় রস, অক্ষিমুকুর ও ঘনরসের ভিতর দিয়া সোজাসুজি আসিয়া পর্দায় ( Retina ) উল্টা হইয়া পড়ে। তারপর সেখান হইতে দ্বিতীয় মস্তিষ্ক-স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়া দর্শন জ্ঞান জন্মায়।

## শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ ( The Ear )

**কর্ণের গঠন।**—শ্রবণের যন্ত্রটিকে বর্ণনার সুবিধার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে ; যথা—( ১ ) বাহ্যকর্ণ ( External Ear ), ( ২ ) মধ্য-কর্ণ ( Middle Ear ) এবং ( ৩ ) আভ্যন্তরিক কর্ণ ( Internal Ear ) এবং তৎসংলগ্ন শ্রবণ-স্নায়ু ও মস্তিষ্কের শ্রবণানুভূতির উদ্দীপনার স্থল।

( ১ ) **বাহ্যকর্ণ**।—কর্ণের যে অংশ হস্তের দ্বারা ধরিতে পারা যায়, কর্ণের সেই অংশ বাহ্যকর্ণ। বাহ্যকর্ণ উপাস্থি ও চর্মের দ্বারা গঠিত। এই অংশের অন্তর্গত রক্ত-সঞ্চালনের শিরাগুলি আলোতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যকর্ণ বহির্জগৎ হইতে বায়ুতরঙ্গের সহিত শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং স্বরের
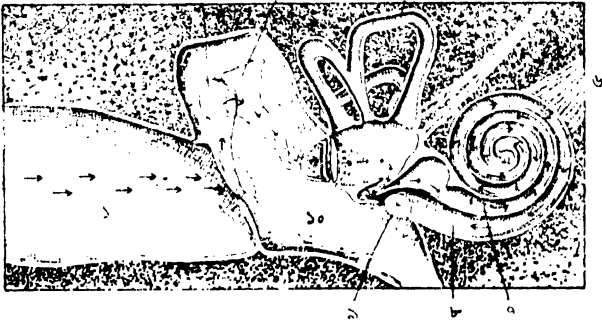
আভ্যন্তরীণ কর্ণ

তীর চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে, শব্দতরঙ্গ কি ভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

উচ্চতা বাড়াইয়া বাহ্য শ্রবণ-নলীতে ( External Auditory Meatus-এ ) প্রেরণ করে। তার পর, শব্দতরঙ্গ পটহ-ঝিল্লীতে ( Tympanic Membrane ) আঘাত করিয়া থাকে। এই নলীতে ছোট ছোট লোম ও তৈলময় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নলীটিকে মসৃণ রাখিবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। সেই তৈলময় দ্রব্য ও এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ দ্রব্য শুকাইয়া 'কানের খৈল' গঠন করে।

( ২ ) **মধ্যকর্ণ**।—পটহ-ঝিল্লীতে আঘাত প্রাপ্ত শব্দ-তরঙ্গ-সমূহ মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে। 'টেম্পোরাল' অস্থিতে একটি গহ্বর ব্যতীত মধ্যকর্ণ অন্য কিছুই নহে। মুখবিবরের সহিত উক্ত গহ্বরের উভয় দিকে একটি নলীর দ্বারা সংযোগ আছে।

পটহ হইতে আভ্যন্তরিক কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে মধ্যকর্ণ কহে। মধ্যকর্ণকে টিম্পেনিক গহ্বরও ( Tympanic Cavity ) বলা যায়। এই মধ্যকর্ণ বা টিম্পেনিক গহ্বরের মধ্যে পরস্পর-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনখানি অস্থি আছে। এই অস্থিত্রয় পটহ-ঝিল্লী হইতে শব্দতরঙ্গ আনিয়া আভ্যন্তরিক কর্ণের দ্বারদেশে পৌছাইয়া দেয়।

( ৩ ) **আভ্যন্তরিক কর্ণ**।—আভ্যন্তরিক কর্ণের মধ্যেই প্রকৃত শ্রবণ-যন্ত্র অবস্থিত আছে; আর ইহার মধ্যেই শ্রবণ-স্নায়ু—অষ্টম-স্নায়ু ( Auditory Nerve ) আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। সকল প্রকার শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ-স্নায়ুতে প্রতিঘাত করিলে পর, শ্রবণ-জ্ঞান জন্মে; কারণ, অষ্টম-স্নায়ু এই প্রতিঘাত মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়।

## ঘ্রাণেন্দ্রিয় ( Nose )

**ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান**।—নাসিকার অভ্যন্তর-ভাগে ঘ্রাণস্নায়ুর ( প্রথম মস্তিষ্ক স্নায়ু ) অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-সমূহ আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। সেইগুলিই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান।

ঘ্রাণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়-সমষ্টির প্রয়োজন ;—

(১) বিশেষ স্নায়ু ও স্নায়ু-কেন্দ্র। এই স্নায়ু ও স্নায়ু-কেন্দ্রে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে ঘ্রাণজ্ঞান জন্মে।

(২) গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণ-কণার ন্যায় অথবা বাষ্পাকারে থাকে। সেই সকল দ্রব্য নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তথাকার রসে দ্রবীভূত হইলে, ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আঘ্রাণ পাওয়ার পক্ষে নাসিকা সরস থাকা চাই। নাসিকার ঝিল্লী (Mucus Membrane) যখন শুষ্ক থাকে, তখন ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়; যেমন,—সর্দির প্রথম অবস্থায় নাসিকায় রস থাকে না, তখন কোন দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায় না।

## জিহ্বা বা স্বাদনেন্দ্রিয় ( Tongue )

স্বাদনেন্দ্রিয়ের প্রধান স্থান জিহ্বা। কিন্তু, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, মুখ-বিবরের অন্যান্য স্থানও, অর্থাৎ তালু ( Soft Palate ), আল্‌জিভ্‌ ( Uvula ), টন্সিল ( Tonsil ) ও পশ্চাদ্‌গহ্বরের উপরিভাগও ( Pharynx ) স্বাদগ্রহণক্ষম। নবম মস্তিষ্ক-স্নায়ুর শাখা ( Glossopharyngial Nerve ) এই সকল স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। দ্রব না হইলে অর্থাৎ গলিয়া না গেলে, কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না। যে দ্রব্য গলে না, তাহা স্বাদহীন হয়।

**জিহ্বার গঠন।**—জিহ্বা পেশীময় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ( Mucus Membrane ) দ্বারা আবৃত যন্ত্র। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে অসংখ্য 'প্যাপিলা' (Papilla) আছে। কাঁটাসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট প্যাপিলাগুলিই স্বাদগ্রহণক্ষম জিহ্বার আস্বাদন যন্ত্র। ইহাদের গঠনপ্রণালী ও বিন্যাস-প্রণালী তিক্ত, অম্ল, কটু ও লবণ-প্রধান। ( পরিপাকক্রিয়া-প্রসঙ্গে ইহার অন্যান্য বিবরণ দ্রষ্টব্য )।

## ত্বক্ ( Skin )

অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় স্পর্শেন্দ্রিয় ( ত্বক্ ) দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নহে। দেহের প্রায় সর্বত্র স্পর্শজ্ঞান-সম্পন্ন। মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুর

পশ্চান্মূল ( Posterior Root ) হইতে যে সকল স্নায়ু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সকল স্নায়ু ও মস্তিষ্কজাত অনুভূতি উৎপাদক স্নায়ু ( Cranial Sensory Nerves ) 'স্পর্শেন্দ্রিয় স্নায়ু'। ত্বক্ বা চর্ম স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রধান স্থান ; কিন্তু জিহ্বা এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতেও স্পর্শজ্ঞান-উৎপাদক প্যাপিলা ( Papilla ) আছে। এই প্যাপিলার মধ্যেই স্পর্শজ্ঞানোৎপাদক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। আবার, এই প্যাপিলা অনুভূতি-উৎপাদক স্নায়ু দ্বারা স্নায়ু-কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত। চর্মেই বেশী 'প্যাপিলা' আছে। চর্মেরও আবার স্থানবিশেষে প্যাপিলার তারতম্য ও প্রভেদ দেখা যায়। চর্ম স্পর্শেন্দ্রিয়ের মূল।

ত্বক্‌কে আরও বহু কার্য করিতে হয় ;—(১) ত্বক শরীরকে বর্মের ন্যায় আবৃত করিয়া আছে ; (২) মেদের সাহায্যে শরীরের নানাস্থানে উচ্চ নীচ স্থান সৃষ্টি করিয়া শরীরের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ; (৩) অসংখ্য শিরা ও ধমনীর সহায়তায় ত্বক্ শরীরের তাপের সমতা-রক্ষায় সহায়তা করে ; (৪) ত্বক্ স্পর্শবোধ জন্মায় ; (৫) ঘর্ম উৎপাদন ও বাহির করিয়া, শরীরের অভ্যন্তরস্থ মল নিঃসারণ করে। স্বেদ চর্মকে মসৃণ ও নরম রাখে।

## (খ) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া (Breathing )

জীবনধারণের জন্য প্রাণিমাত্রেরই খাদ্য, জল ও বায়ুর প্রয়োজন। খাদ্য ও জল না হইলেও কিছুদিন প্রাণ ধারণ করিতে পারা যায় ; কিন্তু বাতাস না হইলে আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। বায়ুতে অম্লজান ( Oxygen ) বাষ্প আছে ; প্রশ্বাস দ্বারা আমরা তাহা গ্রহণ করি। শরীরের রক্ত সেই অম্লজান বাষ্প শোষণ করিয়া শরীরের সর্বত্র লইয়া যায়।

পর্যায়ক্রমে বক্ষঃপ্রাচীরের প্রসারণ ও সংকোচনই শ্বাসক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসের মধ্যে গমন করে এবং পুনরায় ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইয়া আসে। বক্ষঃপ্রাচীর প্রসারণ করিয়া বাহ্য জগৎ হইতে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু লওয়াকে 'ইন্‌স্পিরেশন' ( Inspiration ) অর্থাৎ প্রশ্বাস গ্রহণ, এবং বক্ষঃপ্রাচীর সংকুচিত করিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহ্যজগতে বায়ু ত্যাগ করাকে 'এক্স্‌পিরেশন' ( Expiration ) অর্থাৎ নিঃশ্বাস ক্রিয়া বলে। প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ—এতদুভয়ের সমষ্টির নাম 'রেস্পিরেশন' ( Respiration ) অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া; অথবা, প্রশ্বাস দ্বারা অম্লজান গ্যাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস দ্বারা অঙ্গারাম্ল গ্যাস ( Carbon Dioxide ) ত্যাগ—এই দুইটি ক্রিয়ার সমষ্টিকে 'শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া' ( Respiration ) বলে।

মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণিমাত্রেই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনের নিমিত্ত ফুস্‌ফুস্ আছে; কিন্তু, ভেক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর চর্মই শ্বাসক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র। ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র কোন কারণে বিগড়াইয়া গেলেও ইহারা চর্মের মধ্য দিয়া অম্লজান গ্রহণ এবং অঙ্গারাম্লজান বাষ্প পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু মানুষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জীবের চর্মে এই ক্রিয়া এত অল্প যে তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্যে গাত্রচর্ম কোন সহায়তা করে না বলিলেও চলে।

শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য রক্তকে অম্লজান ( Oxygen ) দিয়া শোধিত করা। শরীর হইতে অঙ্গারাম্লজান গ্যাস ( Carbonic Acid Gas ) নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। সুতরাং, প্রশ্বাসক্রিয়া অর্থাৎ Inspiration দ্বারা বাহিরের বায়ু ভিতরে নীত হয় এবং এই বায়ু হইতে শরীরের পক্ষে উপযুক্ত অম্লজান ( Oxygen ) রক্তের সহিত সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে সর্বদা দহন-কার্য চলিতেছে। সেই

দহন-কার্যের ফলে অঙ্গারাম্লজানের সৃষ্টি হয় এবং তাহা প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

অন্তঃচ্ছদ বা Diaphragm-এর সংকোচন এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জরাস্থির ভিতরের পেশীর ( Intercostal Muscles ) সংকুচন হইলে, বক্ষোগহ্বরের ( Thoracic Cavity ) আয়তন বৃদ্ধি হয়। আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে বাহির হইতে বায়ু আসিয়া প্রবেশ করে এবং সেই বায়ু দ্বারা বক্ষোগহ্বর পূর্ণ হয়। সুতরাং, এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য আপনা আপনি সংসাধিত হইতেছে, ইহার প্রধান সহায় হইল বাহিরের পরিশুদ্ধ বায়ু।

প্রশ্বাসের সহিত নীত অম্লজানের দ্বারা শরীরের দহন-কার্যের ফলে অঙ্গারাম্লজানের সৃষ্টি হয়। যখন উপযুক্ত পরিমাণ শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তখন ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম কোষ্‌সমূহ অম্লজান সংগ্রহ করিতে থাকে ও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। ইত্যবসরে ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা গুণে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সংসাধিত হয়। সজোরে শ্বাস-ত্যাগে পেটের পেশীগুলি সংকুচিত হয়। এইপ্রকার সজোরে শ্বাস-ত্যাগ এবং পূর্ণ শ্বাস-গ্রহণের দ্বারা শরীরের স্বাভাবিক দহন-কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যরূপ ব্যায়াম ( Breathing Exercise ) রক্তশোধন ও কোষ্ঠ-পরিষ্কার উভয় কার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সাধারণত গড়ে আমরা প্রতি মিনিটে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করি ও পরিত্যাগ করি।

এই শ্বাসক্রিয়ার ফলে নাসারন্ধ্রের পথে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুর মধ্যে ধূলিকণা ও ভাসমান জীবাণুসমূহ নাকের মধ্যের লোম ও

নাসাপথের ঘুরাণো আঁকা-বাঁকা রাস্তায় আট্‌কাইয়া যায়। শহরে আমরা প্রতিনিয়ত নাক ঝাড়িলেই দেখিতে পাই কত ঝুলকালি কাপড়ে লাগিয়া থাকে।

মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করা একটি কু-অভ্যাস। ইহাতে নাকের পথ রুদ্ধ হয় ও নানাবিধ জীবাণু টন্‌সিলে আট্‌কাইয়া টন্‌সিল বৃদ্ধি পায় ও গলার মধ্যে এডিনয়েড ও শ্বাসনালীর পথ রুদ্ধ করে। দীর্ঘদিন এই প্রকারে মুখ দিয়া শ্বাস লওয়ার দোষে ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং অবাধে নানাপ্রকার বায়ুবাহিত ব্যাধির জীবাণু শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা, সর্দিকাশি, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সংক্রমণে সাহায্য করে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম-পালন শ্বাসক্রিয়া বিষয়ে অতি হিতকারী :—

(১) প্রত্যহ মুক্ত বায়ুতে মুখ বন্ধ করিয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করা কর্তব্য। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া শ্বাসক্রিয়ার ব্যায়াম প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই হিতকারী।

(২) দিনে ও রাত্রে সর্বদাই জানালা-দরজা উন্মুক্ত রাখিয়া প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে।

(৩) এক স্থানে বদ্ধঘরে বা জনবহুল স্থানে থাকিবে না।

(৪) শয়নকালে কোনও সময়ে নাক বন্ধ করিয়া বা আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইবে না, তাহাতে বাহিরের পরিশুদ্ধ বায়ুর অভাব ঘটে ও নিজের অপরিশুদ্ধ বায়ু নিজেকেই লইতে হয়।

(৫) কখনও আঁটিল জামা, বেল্ট, বা কসিয়া কাপড় পরা কর্তব্য নহে। ইহাতে পরিমিত শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

(৬) নাক দিয়াই সর্বদা প্রশ্বাস লইবে।

## (গ) বিশ্রাম

**বিশ্রাম** ( Rest )।—শারীরিক সমতাই স্বাস্থ্য, আর বৈষম্যই রোগ ( Health is symmetry, disease is deformity )—জনৈক বিশিষ্ট চিকিৎসকের ইহাই অভিমত। পরিশ্রমে শারীরিক বৈষম্য ঘটায়, ক্লান্তি উপস্থিত হয় ; সমতা-সাধনের জন্য তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। ক্লান্তির ( Fatigue ) কারণ—পরিশ্রমে শরীরে অম্লাত্মক বিষের ( Toxin ) আধিক্য হয়। রক্তসহযোগে সেই বিষ মস্তিষ্কে নীত হইলে, তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম-গ্রহণের ইঙ্গিত হয় ;—ইহাই ক্লান্তি। ক্লান্ত ব্যক্তির রক্তের বিষ এত তীব্র যে, সুস্থদেহে সে রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে, সুস্থ প্রাণীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। পরিশ্রমে যেমন শারীরিক উপাদান ক্ষয় পায়, তেমনি মস্তিষ্কও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। পরিশ্রমে মস্তিষ্কের কোষগুলি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হওয়ায়, সমস্ত শরীরে ক্লান্তি আসে। তাই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। শরীরের যে অংশের যতটুকু ক্ষয় হইয়াছিল, বিশ্রামে সেই সকল অংশের ক্ষয়পূরণ হইয়া শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মন পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে।

**নিদ্রা** ( Sleep )।—নিয়ত-পরিচালিত দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক বিশ্রাম—নিদ্রা। নিদ্রা আমাদিগের পরিশ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তিশালী করে। নিদ্রা-প্রভাবে পেশীসমূহ সবল হয় ও শরীরে নূতন স্ফূর্তি ও শক্তি আসে। শ্রমীর অন্তরে নিদ্রা তৃপ্তি দান করে এবং সে পুনরায় কর্মক্ষম হয়। শরীরের পুষ্টির পক্ষে নিদ্রা ও বিশ্রাম দুই-ই আবশ্যক।

নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এই সময় প্রশ্বাসযোগে শরীরে অক্সিজেন অধিক

পরিমাণে গৃহীত হয় এবং নিঃশ্বাসযোগে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস অল্প পরিমাণে বহির্গত হয়। অক্সিজেন অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হয় বলিয়া, দেহে নববলের সঞ্চারে নিদ্রাভঙ্গ ঘটে। নিদ্রায় পাকস্থলী বিশ্রাম করে; সুতরাং রাত্রিকালে অল্প পরিমাণ আহার আবশ্যক। নিদ্রা যাইবার সময় মস্তকে শৈত্য প্রয়োগ করিলে, রক্ত দূরে অপসৃত হয়; ফলে, শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা আসে। নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে চক্ষু, মুখমণ্ডল, কর্ণ ও স্কন্ধ ( ঘাড় ) প্রভৃতি শীতল জলে ধৌত করিলে সুনিদ্রা হয়।

সাধারণত বয়সের তারতম্য অনুসারে নিদ্রা কমবেশী হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিশুগণ ১৬ ঘণ্টা কিংবা তাহারও অধিক সময় নিদ্রা যাইয়া থাকে। ৪।৫ বৎসরের বালক-বালিকাগণ ১২ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। ৬ হইতে ১০ বৎসরের বালক-বালিকারা ৯ হইতে ১১ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। তাহার পর হইতে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ৭ হইতে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া কর্তব্য। তাহার পর ৬ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়াই প্রশস্ত। বৃদ্ধ লোকের আবার ১০ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিছানায় থাকা উচিত। দিবাভাগে অধিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মাতিশয্যে শরীরে অবসাদ আসিয়া নিদ্রালু করে। সে অবস্থায় অল্পনিদ্রা মন্দ নহে। যাহারা প্রাতঃকালে অধিক পরিশ্রম করে, দিবাভাগে স্বল্পনিদ্রা তাহাদের পক্ষে হিতকর।

## (ঘ) ব্যায়াম ( Exercise )

দেহের ও মনের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তিলাভের জন্য সংযতভাবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনার নাম ব্যায়াম। জীবন-সংগ্রামে বিজয়লাভের নিমিত্ত আহার্য সংগ্রহ হইতে আত্মরক্ষা পর্যন্ত যাবতীয় কার্যে বাহুবলের

বা শক্তির প্রয়োজন হয়। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা স্নায়বিক ও পৈশিক উন্নতিতে আমরা সে শক্তি লাভ করি। পেশীর ও স্নায়ুর পুষ্টি ছাড়াও ব্যায়াম দ্বারা দেহ-কোষের এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিসমূহের অশেষ উন্নতি হয়।

প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, প্রত্যহ কোনও না কোন প্রকার ব্যায়াম করা অবশ্য কর্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা যে অঙ্গের যত অধিক চালনা হয়, সে অঙ্গ তত অধিক পুষ্টিলাভ করে এবং তত অধিক কার্যক্ষম হয়। অঙ্গচালনা না করিলে, মাংসপেশী হীনবল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশ শুকাইয়া যায়। ব্যায়ামের ফলে, দেহ ও মন সংযত হয়; অঙ্গভঙ্গি সুষ্ঠু হয়; মাংসপেশীসমূহ দৃঢ়, পুষ্ট ও সবল হইয়া উঠে; ব্যায়ামকালে বেশী রক্তচলাচলের ফলে শরীরে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন আমদানি হয়; ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বাড়ে; স্নায়ুমণ্ডলী সুপুষ্ট হওয়ায় সুনিদ্রা হয় এবং দেহে ও মনে স্ফূর্তি আসে; শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয় এবং দম বাড়ে; হৃৎপিণ্ড দৃঢ় ও শ্রমসহিষ্ণু হয়; এবং ঘর্ম, মূত্র ও মল নিয়মিত নিষ্কাশিত হওয়ায়, মানুষ নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়।

**ব্যায়াম কি ?**—শরীরস্থ মাংসপেশীসমূহের চালনার নাম ব্যায়াম। অঙ্গ-চালনার সময় কতকগুলি পেশী আকুঞ্চিত ও কতকগুলি পেশী প্রসারিত হয়। বাহু আকুঞ্চিত করিলে সম্মুখস্থ 'বাইসেপ' নামক মাংসপেশী সংকুচিত হয় এবং পশ্চাদ্দিকে 'ট্রাইসেপ' নামক পেশী প্রসারিত হইয়া পড়ে। মাংসপেশীসমূহের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ কালে তাহাদের কতকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনের ফল যে মাংসপেশীসমূহেই লক্ষিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির উপরও ব্যায়ামের ফলাফল লক্ষিত হইয়া থাকে।

**মাংসপেশীসমূহের উপর ব্যায়ামের ক্রিয়া**।—মানুষের শরীরে দুই প্রকার মাংসপেশী দেখা যায়। এক প্রকার মাংসপেশী আমাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন। হস্তপদাদির পেশীসমূহ আমরা ইচ্ছা করিলেই চালনা করিতে পারি। এই সকল পেশী আমাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু, আর এক প্রকার পেশী আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অন্ত্রস্থিত পেশীসমূহ এই পর্যায়ের অন্তর্গত। এই সকল পেশী আমরা ইচ্ছা করিলেই চালনা করিতে পারি না।

কর্ণের ও মস্তকের পেশী যদিও ইচ্ছাধীন, তথাপি আমাদের মধ্যে অনেকেই ইহাদিগকে ইচ্ছানুসারে চালিত করিতে পারেন না, অতি অল্পসংখ্যক লোকই কান নাড়িতে পারেন। ব্যায়ামকালে কেবলমাত্র ইচ্ছাধীন পেশীসমূহ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। যে সকল পেশী আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদের কার্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়।

ব্যায়ামের উদ্দেশ্য—শরীরের সর্বাংশ সুগঠিত করা, উহাকে স্বাভাবিক নিয়মে কার্যতৎপর রাখা, অকাল-বার্ধক্য হইতে রক্ষা পাওয়া এবং ব্যাধি-প্রতিষেধক শক্তি বলবতী করা।

**অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল**।—অতিরিক্ত ব্যায়ামে মাংসপেশী-সমূহ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং শরীরে পুষ্টির অভাব হয়। খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ শরীরে সম্যক্‌রূপে গৃহীত না হওয়ায় পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর রোগপ্রবণ হয় এবং সহজেই সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই কারণে সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে, কোন প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্য করা উচিত নহে।

**ব্যায়ামের সময়**।—প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণে ব্যায়াম প্রশস্ত। সময়াভাবে রাত্রিকালও ব্যায়ামের পক্ষে অনুপযুক্ত নহে। ব্যায়ামকালে উদর পূর্ণ থাকা বা খালি থাকা ভাল নহে।

**ব্যায়ামের স্থান**।—উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করা কর্তব্য। গৃহাভ্যন্তরে ব্যায়াম করিতে হইলে, ঘরের দরজা, জানালা, প্রভৃতি খুলিয়া রাখা উচিত। শীতকালে উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করিতে হইলে শরীর উপযুক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ব্যায়াম করা কর্তব্য; কারণ, ঘর্মোদ্গম হইবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইবার সম্ভাবনা আছে।

ব্যায়াম সকলেরই করা উচিত। পাঁচ বৎসরের বালক হইতে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত ব্যায়াম দ্বারা শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন।

**ব্যায়ামের প্রকারভেদ**।—খেলার ভিতর দিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিলে যেমন আমোদ পাওয়া যায়, সেইরূপ শরীরেরও কাজ করা হয়। স্বদেশী ও বিদেশী খেলা ছেলেদের ব্যায়ামে প্রচলিত করা উচিত; তবে দেখা প্রয়োজন, আবশ্যকের বেশী পরিশ্রম না হয়। আমাদের দেশে কপাটি, হাড়ু-ডু, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতি খেলায় বেশ অঙ্গ-চালনা হয়। বিদেশী খেলায়, অর্থাৎ ফুটবল, টেনিস, হকি, গল্‌ফ, ব্যাট্‌বল, ব্যাড্‌মিণ্টন্ প্রভৃতি খেলায় অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ ব্যায়াম হয়। ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাহিয়া যাওয়া, পদব্রজে বা সাইকেলে ভ্রমণ ও সন্তরণ প্রভৃতিও উত্তম ব্যায়াম। এদেশে অধুনা যে-সকল ব্যায়াম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ডন-ফেলা, মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি Indoor Games, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে করিবার উপযুক্ত ব্যায়াম; আর অন্যান্য সকল Outdoor Games। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কর্তৃক নব-প্রবর্তিত 'ব্রতচারী নৃত্য'কে আউট্‌ডোর গেম বলা যায়।

গৃহের অভ্যন্তরে অথবা ছাদের উপর 'ডন'-ফেলা ও মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি বেশ উত্তম ব্যায়াম। জাপানী বালক-বালিকাগণ 'যুযুৎসু' ( Jujutsu ) নামক এক প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকে। উহা বিজ্ঞান-

সম্মত অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। উহাতে পায়ে খুব বল হয়। স্যাণ্ডো সাহেবের ডাম্বেল ( Dumb bells ) ক্রীড়াও বেশ ব্যায়াম।

ব্যায়াম-কালে বালক ও বালিকারা যে চীৎকার করে, উহা সম্ভবমত হইলে ভাল হয়; কারণ, ঐ প্রকার চীৎকারে স্বরযন্ত্রের ও ফসফুসের যথেষ্ট চালনা হইয়া থাকে।

## (৬) স্নান, দাঁত ও চুল প্রভৃতির যত্ন

**স্নান**।—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্নানের গৌণ উদ্দেশ্য—শরীরকে স্নিগ্ধ ও চর্মকে উত্তেজিত করিয়া আরাম অনুভব করা। স্নানের পূর্বে অন্তত দশ পনর মিনিট ধরিয়া সমস্ত দেহে উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দন করা উচিত এবং স্নানের সময় পরিষ্কার গামছা দিয়া ঐ তৈল ঘষিয়া উঠান কর্তব্য। তারপর সমস্ত দেহ শুষ্ক করিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত।

সাধারণত শীতল জলে অবগাহন করিয়া পরক্ষণেই উঠিয়া আসিলে স্নানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঘর্মাক্ত কলেবরে স্নানে অপকার হয়। গরমের সময় স্নান তৃপ্তিকর হইলেও বহুক্ষণ জলে থাকা উচিত নহে। স্নানের পরক্ষণেই যদি ত্বক স্বাভাবিক উজ্জ্বল-বর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে শীতল জলে স্নান করিলে কোন ক্ষতি হয় না। যদি স্নান করিলে গায়ে কাঁটা দেয়, অথবা শরীর শীতে কাঁপিতে থাকে, আঙুলের অগ্রভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও নীলাভ হয় ( চুপ্‌সিয়া যায় ), তাহা হইলে সেরূপ স্নান অনিষ্টকর। ছোট শিশু বা অতি বৃদ্ধ, দুর্বল বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শীতল জলে স্নান করা কখন উচিত নহে।

উষ্ণ জলে স্নান করিবার পরক্ষণেই ত্বকের তাপ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বররোগে গায়ের তাপ হ্রাস করিবার জন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে উষ্ণ

জলে স্নান করাইবার অথবা উষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছাইবার ( sponging ) যে বিধান আছে, তাহারও এই উদ্দেশ্য। উষ্ণ জল গায়ে লাগিলে ত্বকের দিকে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হয়। তখন রক্তের উত্তাপ বহির্বায়ু-সংস্পর্শে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাপ কমিয়া যায়। রক্তহীন ক্ষীণাঙ্গ ব্যক্তি উষ্ণ জলে স্নান করিয়া, কখন কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, উক্ত ব্যক্তির শরীরে যে সামান্য পরিমাণ রক্ত থাকে, তাহা ভিতর হইতে বাহিরে ত্বকের দিকে বেগে ধাবমান হয় এবং তাহার ফলে মস্তিষ্ক প্রায় রক্তশূন্য হইয়া পড়ে। শীত বোধ হইলে উষ্ণ জলে স্নান সুখকর ও স্বাস্থ্যকর হয়। স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি নিদ্রা যাইবার পূর্বে গরম জলে স্নান করিয়া লইতে পারেন; কারণ, গরম জলে স্নান করিলে প্রগাঢ় নিদ্রা আসে। উপবাসের সময় অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহারের পর কিংবা কঠিন পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই স্নান করা উচিত নহে। সকাল বেলাই স্নান করিবার প্রশস্ত সময়। কেহ কেহ অতি প্রত্যূষে, কেহ বা বেলা ৯টা কিংবা ৯॥ টায় স্নান করিয়া থাকেন।

**দাঁত**।—দাঁত পরিষ্কৃত না রাখিলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। তাহাতে দাঁতে ময়লা জমিয়া পূঁয হইতে পারে এবং দাঁতের উপরকার পালিশ নষ্ট হইলে, দাঁত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অকালে দাঁত পড়িয়া যায়। টোম্‌স্ সাহেব ( Mr. Tomes ) এই উপদেশ দিয়াছেন যে, শক্ত ব্রুশ্ দিয়া দিনে অন্তত দুই বার দাঁত ভাল করিয়া মাজিবে। দাঁত যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ( caries ) বা তাহাদের ভিতর ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে রেশমের আঁশ তাহার মধ্যে সতর্কভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, দাঁতের উপরিভাগ সম্যক্ প্রকারে পরিষ্কার করিবে। দাঁতের মধ্যে যেখানে খাদ্যের টুক্‌রা আট্‌কাইয়া থাকে, এবং সেখান হইতে যদি

অবিলম্বে উহাকে অপসৃত করা না হয়, তাহা হইলে সে স্থান, আজ হউক আর কাল হউক, ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেই, এবং পাথুরী ( Tartar ) জমিয়া যাইবে।

দন্তরক্ষার সবশ্রেষ্ঠ ঔষধই হইতেছে—বিশেষভাবে দন্ত পরিষ্কার রাখা। যে দাঁত নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে তুলিয়া ফেলাই উচিত। দন্তরোগের চিকিৎসকের ( Dentist ) দ্বারা মধ্যে মধ্যে দাঁত পরীক্ষা করান উচিত। একটি একটি করিয়া দাঁতগুলি লম্বালম্বি মার্জনা করিতে হয়। পাশাপাশি সকলগুলি দাঁত একত্রে ঘসিলে দাঁতের গোড়া নষ্ট হইয়া যায়।

**চুল** ( Hair )।—চুল পরিষ্কৃত রাখিতে হইলে প্রত্যহ স্নান করা ও চিরুণীর দ্বারা চুল আঁচড়ান আবশ্যক। সাবান ও গরম জল, অণ্ডের কুসুম ( Yellow of the egg ), সোডা অথবা রিঠা দ্বারা মস্তকের চুল পরিষ্কার করা প্রশস্ত। তবে, অতিরিক্ত কিছু, যথা প্রত্যহ সাবান মাখা, বিধেয় নহে। সাবান চর্ম-নিঃসৃত রস হরণ করিয়া চুলকে শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ ( dry and brittle ) করে। সুতরাং, চুলের জন্য নরম সাবান ব্যবহার করা উচিত। দাড়ি নিজে নিজে কামান কর্তব্য। নাপিতের ক্ষুর কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে।

**ত্বক্‌** ( Skin )।—আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সেইজন্য এদেশে ঘর্ম একটু বেশী হয়। ঘর্মের উপাদানে জলীয় ভাগ বেশী হইলেও উহাতে লবণ ও রসজাতীয় পদার্থ ( oily substance ) আছে। সাধারণত সুস্থ শরীরের ঘর্ম অম্লরসযুক্ত ও ক্ষার-রসযুক্ত বলিয়া, উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। আমাদের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন পোয়া কিংবা তদধিক পরিমাণ ঘর্ম নির্গত হয়। গ্রীষ্মকালে এই ঘর্মের পরিমাণ আরও বেশী হয়। আমাদের ত্বক যদি সর্বদা পরিষ্কৃত রাখা

না হয়, তাহা হইলে ঘর্ম-নির্গমনের ছিদ্রসকল বন্ধ হইয়া যায় এবং ঘর্ম-নির্গমনে ব্যাঘাত জন্মে। চর্ম তাহার কাজ রীতিমত না করিলে মূত্রাশয় ও ফুস্‌ফুস্‌কে অনেক কাজ করিতে হয় ; আর তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

রসজাতীয় পদার্থ শরীর হইতে বাহির না হইলেই মুখে ব্রণ প্রভৃতি উঠে। শরীরে ময়লা জমিলে বা তাহা পরিষ্কার না করিলে, নানাবিধ চর্মরোগ জন্মিয়া থাকে। যাহারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের অধিক ঘর্ম-নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের ময়লা কাটিয়া যায়। যাহাদের বসিয়া কাজ করা অভ্যাস ( sedentary habits ), তাহাদের শরীরের ত্বক্ পরিষ্কৃত রাখা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ত্বক্ পরিষ্কার রাখিবার জন্য তিনটি দ্রব্যের প্রয়োজন ; যথা—প্রচুর জল, একখানি সুন্দর সাবান ও রীতিমত শরীরমর্দন। যে-কোন প্রকারের সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে। যে সাবান ব্যবহারে ত্বক্ রুক্ষ হয় এবং গা চড়্ চড়্ করে ( Irritating ), সে সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে। আমাদের দেশে স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে তৈল মাখার রীতি আছে। সরিষার তৈল সর্বশরীরে সজোরে মর্দন করা উচিত। উহাতে শরীরের ত্বক্ মসৃণ হয়, রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয়, মাংসপেশীসমূহের ব্যায়াম হয় ও সর্বশরীরে আরামদায়ক ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

**সাবানের ব্যবহার ও তাহার কার্য।**—আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য সাবান ব্যবহার করি। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার অধ্যায়ে ক্ষার-পদার্থের ব্যবহারের বিষয় বলা হইয়াছে। সাবান ক্ষার জাতীয় পদার্থ ও তৈলের যৌগিক সংমিশ্রণ। তৈল ও ক্ষার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে একটি যৌগিক দৃঢ় পদার্থে পরিণত হইয়া সাবান হয় ও

গ্লিসারিন নিষ্কাশন করিয়া দেয়। যে সকল সাবানে ক্ষার আলগাভাবে থাকে, অর্থাৎ, রাসায়নিক সংমিশ্রণে গ্লিসারিন ভাগ নিষ্কাশণ করিয়াও অধিক পরিমাণে ক্ষার থাকে তাহাই খারাপ সাবান। সেগুলি অত্যন্ত শক্ত ও তাহার ব্যবহারে চামড়ার কোমলত্ব নষ্ট হয়। এইরূপ বেশী ক্ষারযুক্ত সাবানে কাপড় কাচিলেও কাপড়ের আঁশ বা fibre ( তন্তু ) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয় ও সময়ে সময়ে গলিয়া বা জীর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য যে সাবান শক্ত ও খারাপ তাহা গায়-তো মাখিবেই না, এই প্রকার খারাপ সাবানে কাপড় কাচিলেও কাপড়ের অপচয় হয়। যে সাবান মসৃণ ও যাহার উপর হাত দিলে তেলাভাব বুঝায় ও সহজে ফেনা হয়, তাহাই ভাল সাবান। অবশ্য কাপড় কাচাই হউক আর গায় মাখাই হউক, "কোমল জল" ( soft water ) সর্বদাই ব্যবহার করা কর্তব্য। জলের অধ্যায়ে 'খর জল' ব্যবহারে সাবানের কত অপচয় হয় তাহাও বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

## (চ) শরীরের পরিচ্ছন্নতা ও তাহার রক্ষার জন্য কার্পাস-জাত, রেশমী ও পশমী দ্রব্যের ব্যবহার

আমাদের সমস্ত শরীর চর্মে আবৃত। হাত, পা, মাথা, মুখ প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই শরীর গঠিত। ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন করার নামই শরীরের যত্ন। ঠিকমত শরীরের যত্ন করিতে পারিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। শরীর সুস্থ রাখার আর এক নাম স্বাস্থ্য-রক্ষা। যে সমস্ত সুনিয়ম পালন ও অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, তাহাদের মধ্যে শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই প্রধান।

শরীর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে সর্বদা মনে একপ্রকার পবিত্র-ভাব জাগে, স্ফূর্তি-বোধ হয় এবং বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। পরিচ্ছন্ন

ছেলেমেয়েদিগকে সকলেই ভালবাসে ও আদর করে ; কিন্তু অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়েদিগকে অনেকেই ঘৃণা করে।

আমাদের চারিদিকে ধূলা বালি প্রভৃতি ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ভিতরে নানা রোগের জীবাণু থাকে, সর্বদা শরীর পরিচ্ছন্ন থাকিলে সহসা উহা আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন লোকেরা সহজে অসুস্থ হয় না।

**সূতি, পট্ট, রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদির ব্যবহারের সহিত স্বাস্থ্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধ।**।—সৌন্দর্যবর্ধন, লজ্জানিবারণ, শীত ও তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করা, দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষা করা এবং বাহিরের ময়লা ও কীটাদির দংশন হইতে দেহকে রক্ষা করার নিমিত্তই আমরা নানাপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি। প্রধানত শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক রাখিবার জন্যই বস্ত্রাদি পরিধানের প্রয়োজন। কেবল যে ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বস্ত্রাদির ব্যবহার কর্তব্য, তাহা নহে ; উত্তাপ-রক্ষার নিমিত্ত উহা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির উপর আমাদের স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহার 'কার্বন' এবং 'হাইড্রোজেন'-এর সহিত 'অক্সিজেন' মিলিত হওয়ায় দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ দেহ হইতে বিকীর্ণ না হইলে, ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আমাদের মৃত্যু ঘটে। আমাদের গাত্র-চর্ম-বাহিত ঘর্ম, ফুস্‌ফুসের নিঃশ্বসিত বায়ু এবং মল, মূত্র প্রভৃতি দ্বারা দেহের উত্তাপ কতকটা নষ্ট হয় ; উত্তাপের উৎপত্তি এবং ব্যয় সমভাবে হইলে, শরীরের উত্তাপের সমতা রক্ষিত হয়। প্রধানত চর্মদ্বারা দেহ হইতে উত্তাপ নির্গত হয়। সুতরাং, আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি এমন হওয়া

উচিত যাহাতে এই কার্য নিয়মিতভাবে হয়। আমরা আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পশুলোম, পশুচর্ম, রেশম কীট, কার্পাস-সূত্র, শণ প্রভৃতি হইতে পাই।

**পশুলোম হইতে**—এঙ্গোরা, মেরিনো, ফ্লানেল, কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, আলপাকা ইত্যাদি।

**রেশম কীট হইতে**—রেশম, মখমল, শাটিন, ক্রেপ, তাফতা, এণ্ডি, মটকা, গরদ, তসর, বেনারসি, চেলি ইত্যাদি।

**উদ্ভিজ্জ হইতে**—কার্পাস-তূলা, শণ এবং রবার।

তূলা ও শণের বস্ত্রাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্যবহৃত হয়; কারণ, উহা ঘর্ম শোষণ করিয়া লয় ও উত্তাপ বিকীর্ণ করে। রেশম পশম ( fur ) এবং চর্ম প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত হয়; কারণ, উহা উত্তাপ ও আর্দ্রতা পরিচালনা করে না এবং দেহ উষ্ণ রাখে।

আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের ফলে সারা দেহে তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। খাদ্য এই তাপ-সমষ্টির মূল কারণ। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে বেশী পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয় না। আবার, দীর্ঘ সময় খাদ্য গ্রহণ না করিলে, সেই উপবাসী লোকের যথেষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহারেও দেহের শীত ভাঙ্গে না। ঋতুবিশেষে কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য নিঃশ্বাসকার্য দ্বারা ও ঘর্মরূপে আমাদের দেহ হইতে তাপ নির্গত হইয়া থাকে। অতএব, তাপ-সৃষ্টি ও তাপ-বিকিরণ এই উভয় কার্যের মধ্যে আমাদের পরিধেয় পরিচ্ছদাদিই দৈহিক তাপের সমতা রক্ষা করে। পরিচ্ছদ আমাদের গাত্র-চর্ম হইতে তাপ-সঞ্চালন নিয়মিত রাখে বলিয়াই দেহ গরম থাকে।

পরিচ্ছদ-বস্ত্রের উপকরণ হিসাবে উহার তাপ-পরিচালন গুণের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

পশম, রেশম, কার্পাস-তূলা ও শণ প্রভৃতি ক্রমশ কম তাপ পরিচালক; কারণ, এই সকল বিভিন্ন পরিচ্ছদবস্তুর সূত্রের বুননের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবহুলতার উপর উহাদের তাপ-সংরক্ষণ-গুণ যথেষ্ট নির্ভর করে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে বস্ত্রের বুননের মধ্যে যত বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র, তথায় তত বেশী বায়ুকণা আটকাইয়া থাকে বলিয়া উহা দেহের উত্তাপকে আবদ্ধ রাখে। এই হিসাবে ফ্লানেল দেহের উত্তাপ-সংরক্ষণ বিষয়ে প্রথম স্থান লয়। ফ্লানেল অপেক্ষা পশম কম গরম। আবার রেশম, তূলা, শণ প্রভৃতি ক্রমশ কম গরম।

**সূতি, পট্ট, রেশম ও পশম-বস্ত্রাদির সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ।**—আমরা সূতি, পট্ট ও রেশমী-বস্ত্র পরিধান করি ও জামা গায়ে দেই; আবার জামার নীচে গেঞ্জি, ফতুয়া, ব্লাউজ, শেমিজ এবং মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা শীতকালে পশমের তৈয়ারী গরম জামা, শাল, আলোয়ান, কম্ফর্টার ইত্যাদি এবং গ্রীষ্মকালে সূতা কিংবা রেশমের তৈয়ারি পাতলা জামা ব্যবহার করি।

সৌন্দর্যবর্ধন, লজ্জানিবারণ এবং শীত ও তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই আমরা নানাপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি।

পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ে দেহ আবৃত থাকায় সহসা বাহিরের ময়লা গায়ে লাগিতে পারে না। অতএব, আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরও আমাদের স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

## (ছ) জামা-কাপড়ের ন্যায় শয্যা-সম্বন্ধেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন

বিছানার চাদর, বালিশ, লেপ ও তোষকাদির ওয়াড়, মশারি প্রভৃতি গায়ের ঘামে এবং বাহিরের ময়লায় অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্রব্যও ধোপাবাড়ী দিয়া কাচাইয়া লইবে কিংবা বাড়ীতেই সাজিমাটি বা সাবানের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে। লেপ, তোষক, বালিশ, মাদুর,
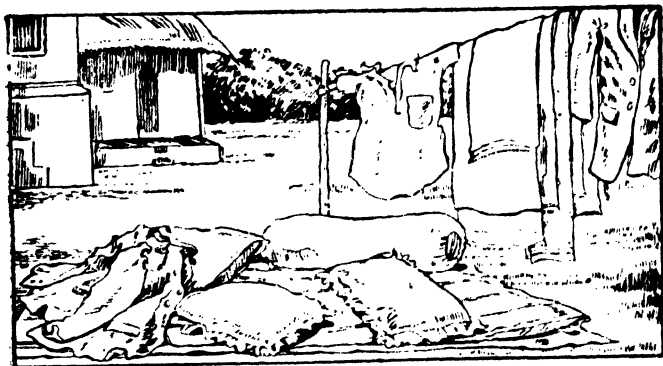
সতরঞ্চ, কম্বল প্রভৃতি দুই এক দিন অন্তরই প্রখর রৌদ্রে ও বাতাসে দিয়া শুকাইয়া লইবে। সূর্যকিরণ ও নির্মল বায়ুতে বহু রোগের জীবাণু নষ্ট হয়। রৌদ্রে বিছানা শুকাইয়া লইলে শুইতেও বেশ আরাম বোধ হয় এবং ছারপোকার উপদ্রব কমিয়া যায়।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# রোগ-সংক্রমণ ও পরিশোধন

## রোগ-সংক্রমণ

কোন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ হইতে রোগ-জীবাণু অপর কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়া তথায় ব্যাধির সৃষ্টি করে; ইহাকে রোগ-সংক্রমণ বলে। সুতরাং, যে সকল রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অপর কোন ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহাদিগকে সংক্রামক রোগ বলা হয়। সকল রোগেরই প্রায় অল্পবিস্তর সংক্রমণশীলতা আছে; কিন্তু কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি যে সকল রোগ অতি অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হয়, সাধারণত তাহাদিগকেই সংক্রামক রোগ বলে।

শরীরের চর্মের সংস্পর্শ দ্বারা, দূষিত বায়ুর সহিত চালিত ধূলিকণার দ্বারা এবং দূষিত জল, দূষিত দুগ্ধ ও খাদ্যের সহিত আমাদের শরীরে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে। সুতরাং, দেহে রোগ প্রবেশের তিনটিই প্রধান পথ—শরীরের চর্ম বা চামড়া, নাক ও মুখ। এখন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়,—খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি রোগের জীবাণু সাধারণত রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা চর্মের ভিতর দিয়া সংক্রামিত হয়; সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু প্রধানত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে; এবং কলেরা, টাইফয়েড্, আন্ত্রিক জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের বীজাণু পানীয় কিংবা খাদ্য-দ্রব্যের

সহিত দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি, সাধারণত নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে রোগের বীজাণু এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় :—

**(১) রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা ;**

**(২) ধূলিকণা দ্বারা ;**

**(৩) জলের দ্বারা ;**

**(৪) মাছির দ্বারা ;**

**(৫) নর্দমা, আঁস্তাকুড় প্রভৃতির দূষিত তরল পদার্থ দ্বারা।**

অনেক সময় দেখা যায়, খোস-পাঁচড়া লইয়া একটি ছাত্রী ক্লাসে আসিলে তাহার সংস্পর্শে ক্লাসের অন্য ছাত্রীরও খোস-পাঁচড়া বা চুলকানি হয়। দুষ্টক্ষত বা ঘা প্রভৃতিও এই ভাবেই মানব-সমাজে বিস্তার লাভ করে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোক যদি সমাজে চলাফেরা করে, ইতস্তত ভিক্ষা করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়, জনসমাজে অবাধে মেলামেশা করে, তবে কুষ্ঠব্যাধির সংক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা সুকঠিন হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের চর্ম বা ত্বক রোগ-সংক্রমণের একটি ভয়াবহ পথ।

চর্মরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত অবাধ মেলামেশা, এক গৃহে বাস, একত্র পান-ভোজন, তাহার ব্যবহৃত জামা, কাপড়, গামছা প্রভৃতির ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার ব্যবহৃত বিছানা, থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি তৈজসাদি উপযুক্তভাবে শোধন করিয়া লওয়া উচিত ; বাসন-পত্র কার্বলিক লোশনে পরিশোধন করা যায় ( এক ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড ও ৪ ভাগ জল )। বিছানা, মাদুর প্রভৃতি উপযুক্তভাবে পরিশোধনের উপায় না থাকিলে পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। পরন্তু, কুষ্ঠগ্রস্ত ও দুষ্টক্ষত-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কোন স্কুল-কলেজ, যাত্রা-থিয়েটার ও সভা-সমিতি, বা

হাট-বাজার, মেলা প্রভৃতি জনবহুল স্থানে গমনাগমন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা কর্তব্য। তাহাদের অনতিবিলম্বে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত ও চিকিৎসিত হওয়া উচিত।

নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসকালে নানারোগের জীবাণু দূষিত বায়ুর সহিত শ্বাস-যন্ত্রে প্রবেশ করে। সাধারণ সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঘুংড়ি-কাশি বা হুপিং-কাশি, ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ—সবই জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এই সকল ব্যাধির জীবাণু দূষিত বায়ুতেই থাকে; কাশি, গয়েরের সহিত বাহির হইয়া বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। কাশি, গয়ের যেখানে-সেখানে ফেলিলে শুকাইয়া তাহা হইতে জীবাণু ধূলিকণার আশ্রয়ে ও বদ্ধ হাওয়ায় বহুদিন জীবিত থাকে। সামান্য বায়ু-সঞ্চালনে নাক দিয়া তাহারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে; এইরূপে ব্যাধি সংক্রামিত হয়। আঁস্তাকুড়, চামড়ার গুদাম, পায়খানা, কসাইখানা, নর্দমা প্রভৃতি স্থানের বায়ু সর্বদা দূষিত থাকে। সাধারণের চলাচলের স্থান, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট অনেক সময়েই ব্যাধির জীবাণুপূর্ণ ধূলিকণায় সমাকীর্ণ থাকে। এই সকল স্থানে অনিবার্য কারণে উপস্থিতিও রোগ-সংক্রমণের সহায়তা করে। কথা বলিবার সময় মুখ দিয়াও আমরা শ্বাস গ্রহণ করি; সুতরাং খুব সতর্কতার সহিত রুমাল বা পরিষ্কৃত কাপড়ে নাক মুখ ঢাকিয়া এই সকল দূষিত বায়ুপূর্ণ স্থানে যাইতে হয়। অনেক সভ্যদেশে দূষিত বায়ুপূর্ণ স্থানে মুখোস ব্যবহারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

মুখ দিয়া ব্যাধির জীবাণু নানাপ্রকারে শরীরে প্রবেশ লাভ করে। দূষিত জল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণ করিলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময়, টাইফয়েড্ ও নানাবিধ আন্ত্রিক জ্বর এবং নানারকমের কৃমিরোগ দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই।

জল না হইলে আমাদের চলে না। আমরা জল পান করি, জলে স্নান করি, জল দিয়াই আমাদের বাড়ী-ঘর, বাসন-পত্র ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি।

ময়লা ও দূষিত জল পান করিলে উপকার ত হয়ই না, বরং তাহার সঙ্গে মিশানো নানাপ্রকার রোগের জীবাণু ও ময়লা পেটে যাইয়া কৃমি, অজীর্ণ, কলেরা প্রভৃতি রোগ জন্মায়। দূষিত জলে স্নান করিলে, মুখ ধুইলে কিংবা কাপড়-চোপড় কাচিলে শরীরে ও মুখে এবং কাপড়-চোপড়ে ময়লা ও নানা দূষিত পদার্থ লাগিতে পারে। ময়লা জলের সংস্পর্শে খোস-পাঁচড়া, দাদ, চুলকানি প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে।

যে কোন প্রকার জলই হউক না কেন, সংক্রামক ব্যাধির সময়ে অন্তত উহা দশ মিনিট কাল ফুটাইয়া পান করা কর্তব্য।

দূষিত জল মিশ্রিত দুগ্ধ দূষিত জলেরই মত অপকারী এবং রোগ-বীজাণু-বাহক। জলের মত দুধও অন্তত দশ মিনিট ফুটাইয়া পান করা উচিত। ক্ষয়রোগগ্রস্ত গাভীর দুধ ব্যবহারে যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হইতে পারে। সুতরাং, দুধ ব্যবহারের পূর্বে বিশেষ সাবধান হইতে হয়, যাহাতে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গাভীর দুধ ক্রয় করা না হয়।

দোকানে খাবার প্রায়ই খোলা পড়িয়া থাকে। ধূলিকণা ত' তাহাতে অহরহ পড়িতেছেই, অধিকন্তু তাহার উপর সর্বদা মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে।

মাছি কলেরা, টাইফয়েড্, আমাশয় প্রভৃতি রোগগ্রস্ত লোকের মল-মূত্র দেখিতে পাইলেই তাহার উপরে বসে ও তাহা খায়। মাছি শুঁড়, পা, ডানা প্রভৃতির সাহায্যে সেই মল-মূত্র হইতে রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের অন্ন-ব্যঞ্জনে বসে। অতএব, সেই সকল

রোগের জীবাণু আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। আমরা সেই বিষ অজ্ঞাতসারে খাইয়া ফেলি। তাহার ফলে, আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সমস্ত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাই। এইরূপে মাছি লক্ষ লক্ষ লোক মারিয়া ফেলিতেছে।

শরীরের কোন স্থানে ঘা হইলে মাছি তাহাতে বসিয়া পুঁয ও রক্ত শুষিয়া খায়; বসন্ত-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে বসিয়া দূষিত পুঁযাদি খাইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগী কোন স্থানে থুথু ও গয়ের ফেলিলে, মাছি তাহাও খাইয়া ফেলে। কলেরা-রোগীর বমিতে মাছি বসিয়া থাকে। এইরূপে মাছি সর্বদাই বহু মারাত্মক ব্যারামের জীবাণু বহন করিয়া অন্য লোকের দেহে সংক্রামিত করে।

যে সকল কারণে মাছির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করা উচিত। গোয়াল-ঘরের গোবরাদি, আঁস্তাকুড়ের নানারকম দূষিত পদার্থ, পায়খানার মল-মূত্র এবং সর্বপ্রকার পচনশীল জিনিস বাসস্থান হইতে যথারীতি ও যথাসময়ে দূরীভূত করিলে মাছি জন্মিতে পারে না। গৃহাদি সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিলে মাছি তথায় থাকিতে পারে না। রোগীর মলমূত্র, কোনরূপ দূষিত জিনিস, নর্দমার অপরিষ্কৃত জল, আবর্জনা প্রভৃতি পচিতে না পাইলে সহসা মাছি জন্মিতে পারে না। রান্না-ঘর পরিষ্কৃত রাখিলে এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি যথোচিতভাবে জালযুক্ত আলমারিতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলে, তথায় মাছির উৎপাত কম হয়।

এক চামচে 'ফরমালিন' নামক ঔষধের সহিত কিছু দুধ কিংবা চিনি মিশাইয়া কাচের বা এনামেলের পাত্রে রাখিয়া দিলে, মাছি উহা খাইতে বসিয়া মরিয়া যায়। বাজারে 'ফ্লাই পেপার' বা 'মাছি-মারা কাগজ' নামে মিষ্ট-আঠাযুক্ত একপ্রকার কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়; উহাতে মাছি

বসিলে আট্‌কাইয়া মরিয়া যায়। 'ফ্লাইট্র্যাপ্' বা মাছি-ধরা কলও কিনিতে পাওয়া যায়। তাহার ভিতরে মাছি ঢুকিলে আর বাহির হইতে পারে না।

দূষিত জল, দূষিত, পচা ও ভেজাল খাদ্য, দূষিত জল-মিশ্রিত ভেজাল দুগ্ধ ও মাছি দ্বারা দূষিত খাদ্য ব্যবহারে কি প্রকারে ব্যাধি সংক্রামিত হয়, তাহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই।

আমাদের নানারূপ ব্যবহৃত জল, বাসন-মাজা জল, কাপড়-কাচা জল, ভাতের ফেন, মাছ-ধোয়া জল, স্নানের জল, আস্তাবল ধোয়া জল, নর্দমা ও আঁস্তাকুড় প্রভৃতির দূষিত তরল পদার্থ মাটিতে চোয়াইয়া ও মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়া নিকটবর্তী কূপ, পুষ্করিণী ও অপরাপর জলাশয়ের জল দূষিত করে। ঐ দূষিত জল দ্বারাও আমাদের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রামিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এতদিন স্বাস্থ্যবিধি-শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা না থাকায় সংক্রামক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার এবং উহার প্রতিরোধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। এখনও স্বাস্থ্যবিধি পালন বিষয়ে সুশিক্ষা যথেষ্ট বিস্তারলাভ না করায় সময়ে সময়ে সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করে। এইরূপে প্রতি-বৎসর কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু নিবার্য ব্যাধিতেও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যাইতেছে। সুতরাং সংক্রামক রোগ প্রথম দেখা দিলে, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির 'হেল্‌থ অফিসার' মহাশয়কে অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ করা কর্তব্য।

ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রামক মহামারী-প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও প্রত্যেক নগরে

ও জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিভিন্ন সেবা-সমিতি হইতে সেবকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সংক্রামক মহামারীর সময়ে পল্লীবাসীর সেবা করিয়া থাকেন।

রোগীর মল-মূত্র প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধির নিয়মানুযায়ী পরিষ্কার করা, কাপড়, বিছানা প্রভৃতির বিশোধন, রোগীর সংস্পর্শে যাহারা থাকে, তাহাদের প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেক্শন প্রদানের ব্যবস্থা এবং যাহা-দিগকে চিকিৎসা বা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন তাহাদিগকে হাসপাতালে বা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

## ব্যাধির বাহক হিসাবে কীট-পতঙ্গাদি ( Insects )

রোগ-জীবাণু-বহনে এবং রোগ-জীবাণু-সংক্রমণে কীট-পতঙ্গাদি বিশেষ সহায়তা করে। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি কীট-পতঙ্গাদির দ্বারা সংবাহিত ও সংক্রামিত হয়। মানুষের সহিত কীট-পতঙ্গাদির অতি নিকট সম্বন্ধ। গৃহপালিত জীবজন্তুর ন্যায়ই তাহারা মানুষের নিত্যসহচর।

সংক্রামক রোগের জীবাণুবাহক কোন্ কীট-পতঙ্গের দ্বারা কোন্ ব্যাধি সংক্রামিত হয়, তাহার বিবরণ এই :—

**(১) গৃহমক্ষিকা ( House Flies )**।—ইহারা কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্ জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণু বহন করে ও ছড়াইয়া দেয়। সাধারণ মাছির দ্বারা কুষ্ঠ-রোগ ও নানাপ্রকার চর্মরোগের জীবাণুও সংক্রামিত হইয়া থাকে। দংশক মক্ষিকা ( Biting Flies ) এ দেশে দুর্লভ। এতদ্বারা 'ট্রাইপেনোসোমিয়াসিস্' ( Trypanosomiasis ) নামক একপ্রকার উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

**(২) মশক (Mosquitoes)** ।—ইহারা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর এবং ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন করে। মশকের মধ্যে আবার তিনটি শ্রেণী আছে ;—(ক) এনোফেলিস ( Anopheles ) বা স্ত্রী-জাতীয় মশক ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে, (খ) কিউলেক্স ( Culex )-জাতীয় মশক গোদের ( ফাইলেরিয়া—Filaria ) এবং ডেঙ্গু ( Dengu ) জ্বরের জীবাণু বহন করে ; এবং (গ) 'স্টেগোমায়া' বা 'টাইগার' ( Stegomyia বা Tiger )-জাতীয় মশক পীতজ্বরের জীবাণু বাহক।

**(৩) র‍্যাট ফ্লী ( Rat Flea )** ।—ইহারা প্লেগের জীবাণু বহন করে। শিশুদিগের দেহে কালাজ্বর ও ইহাদের দ্বারা সংক্রামিত হয়।

**(৪) উকুন ( Lice )** ।—টাইফস ( Typhus ) জ্বর, রিল্যাপসিং জ্বর ( Relapsing Fever ) এবং ট্রেঞ্চ ফিভার ( Trench Fever ) ইহাদের দ্বারা সংক্রামিত হয়।

**(৫) ছারপোকা (Bed Bugs)** এবং **'স্যাণ্ড ফ্লাই' ( Sandfly )** ।—কালাজ্বরের জীবাণু বহন করে।

**(৬) এঁটেলু ও ডাঁশের** দ্বারা প্লেগ ও রক্তদুষ্টিজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি সংক্রামিত হয়।

**(৭) পিপীলিকা (Ants)** ।—খাদ্য ও রোগীর মল-মূত্রাদি হইতে যে সকল ব্যাধি বিস্তৃতিলাভ করে, ইহারা সেই সকল ব্যাধির জীবাণু বহন করে। কলেরা, টাইফয়েড্, রক্তামাশয় প্রভৃতি ইহাদের দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে।

## পরিশোধন ও সংক্রমণ নিবারণের উপায়

যথাযোগ্য চিকিৎসা এবং রোগীর মল-মূত্রাদিতে পরিশোধক ঔষধ দেওয়া—রোগ-সংক্রমণ নিবারণের উপায়। মল ও মূত্র পরিশোধন

করিতে কার্বলিক অ্যাসিড সলিউসন্ ( 1 in 20 ) এবং পারক্লোরাইড অভ্ মার্কারি সলিউসন্ ( 1 in 1000 ) বিশেষ উপযোগী। ইহাদের যে কোনটি মূত্র-পরিমাণের ১/১০ ভাগ দিলেই যথেষ্ট।

(১) রোগীর মল পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। মল পোড়াইবার সুবিধা না হইলে পরিশোধন অন্তে বাড়ীর পুষ্করিণী বা কূপ হইতে দূরে অন্তত দুই তিন ফুট মাটির নীচে, উহা প্রোথিত করিতে হইবে। (২) রোগীর গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। (৩) রোগীর পরিহিত বস্ত্রাদি ও শয্যার আস্তরণ প্রভৃতি অন্তত দুই ঘণ্টাকাল কার্বলিক অ্যাসিড সলিউসনে ( 1 in 20 ) ডুবাইয়া রাখিয়া পরে অন্তত আধ ঘণ্টাকাল ফুটাইয়া লইবে। (৪) বাড়ীর অপর লোকের রোগ-সংক্রমণ নিবারণের জন্য তাহাদিগকে কতকটা পৃথক্‌ভাবে থাকিতে হইবে। রোগীর গৃহের দরজা-জানালায় পাতলা পর্দা ঝুলাইয়া রাখা উচিত; নচেৎ, মক্ষিকাদি ঘরে প্রবেশ করিয়া রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করিতে পারে। (৫) জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। (৬) দুধ খুব ভালরূপে ফুটাইয়া ব্যবহার করা কর্তব্য। (৭) টাইফয়েডের টিকা লওয়া প্রয়োজন। দশ দিন অন্তর এই টিকা দিবার নিয়ম। টিকা লওয়ার পর দুই বৎসর পর্যন্ত টিকাগ্রহণকারীর রোগ-প্রতিরোধক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। যাহাদের রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ শুশ্রূষাকারী সেবক-সেবিকা প্রভৃতি, তাহাদের টিকা লওয়া কর্তব্য।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

# গৃহ-শুশ্রূষাবিধি বা গৃহে রোগ-পরিচর্যা

**রোগীর ঘর ও তাহার যত্ন।**—গৃহস্থের বাটীতে শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, বাহিরের ঘর প্রভৃতি কয়েকখানি করিয়া ঘর সাধারণত থাকে। বাটীর সর্বোৎকৃষ্ট শয়ন-ঘরখানিই রোগীর থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট থাকিলে ভাল হয়। রোগীর ঘরখানি যথেষ্ট আলো-বাতাসযুক্ত, আর্দ্রতাশূন্য, কোলাহলবর্জিত ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। রোগীর ঘরে ভালরূপ আলো-বাতাস খেলিবার জন্য উপযুক্ত দরজা-জানালার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। বহুদিন ধরিয়া অব্যবহৃত কোন ঘর রোগীর থাকিবার পক্ষে আদৌ ভাল নয়। যাহাতে প্রখর আলোক প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দরজা-জানালায় ফিকা নীল রংএর বা সবুজ রংএর পর্দা ব্যবহার করিতে হয়। রোগীর ঘরের মধ্যভাগ যাহাতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা না হয় এরূপ যত্ন লওয়া উচিত।

কোনরূপ সংক্রামক রোগ হইলে, রোগীকে বাটীর অপর সকলের বাসের ঘরগুলি হইতে যথাসম্ভব দূরবর্তী কোন ঘরে রাখাই উচিত। প্রয়োজন বোধ করিলে নিকটবর্তী কোন সাধারণ হাসপাতালেও তাহাকে পাঠান যাইতে পারে।

**রোগীর ঘরে ব্যবহারার্থ আসবাব ও তৈজসাদি।**— রোগীর ঘরে, তাহার অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া অতিরিক্ত আসবাব বা তৈজসাদি রাখা একেবারেই উচিত নয়। অতিরিক্ত আসবাবপত্র থাকিলে বায়ু-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে।

রোগীর ঘর

**রোগীর প্রয়োজনীয় আসবাবাদি।**—রোগীর বিছানা বা শয্যাধার জন্য খাট—সাধারণ খাট বা স্প্রিংএর খাট ( Spring Bedstead )—ব্যবহারার্থ জিনিসপত্র রাখিবার জন্য রোগীর বিছানার পার্শ্বে একখানি টেবিল, খাদ্য-দ্রব্য ও পথ্যাদি রাখিবার জন্য জালযুক্ত ছোট আলমারি, ঔষধ, থার্মোমিটার এবং অন্যবিধ উপকরণ রাখিবার জন্য একখানি টেবিল, বসিবার জন্য চেয়ার দুইখানি—একখানি শুশ্রূষাকারিণীর জন্য, একখানি চিকিৎসকের জন্য—একখানি ঈজি চেয়ার ( Easy chair ) রোগীর নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা উচিত। খাওয়ার ঔষধ ছাড়া মালিশ, প্রলেপ প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধগুলি উচ্চে আলমারিতে বন্ধ অবস্থায় রাখা একান্ত কর্তব্য। এগুলির পাত্রের গায়ে যেন "বিষ" ( Poison ) এই লেবেল ( Label ) লাগান থাকে।

সাধারণ অবস্থার লোকের রোগীর ব্যবহারের জন্য একখানি তক্তাপোষ ও চেয়ার বা চৌকি ভিন্ন টেবিল, আলমারি প্রভৃতি মূল্যবান্ আসবাবাদির ব্যবস্থা থাকে না। সেখানে দেওয়ালের তাকে ( shelf ) বা কুলুঙ্গিতে রোগীর ঔষধাদি যত্নপূর্বক রক্ষা করা যাইতে পারে। খাওয়ার ঔষধ হইতে মালিশাদি কাযের অন্যবিধ ঔষধ দূরে সাবধানতার সঙ্গে রাখিতে হয়।

**রোগীর আবশ্যক শয্যাভরণাদি।**—রোগীর খাট বা তক্তাপোষ বার্নিশ করা হওয়া ভাল। খাট বা তক্তাপোষ বেশী চওড়া হইলে অসুবিধাজনক হয়; ইহা সাধারণত ৩।৪ ফিট চওড়া হইলেই চলে। স্প্রিংএর খাট না হইলে কাঠের খাট বা তক্তাপোষের উপর পুরু তোষকাদি দিয়া নরম বিছানার ব্যবস্থা করিতে হয়। তোষকের উপর বিছানার চাদর দিয়া তোষক মুড়িয়া দিতে হয়। রোগীর মাথায় দিবার দুইটি বালিশ এবং পার্শ্বেও একটি বালিশ দিবে। আরও ২।১টি ছোট

ছোট বালিশ থাকিলে ভাল হয়, কেন না, হাঁটু, কোমর প্রভৃতির বেদনা হইলে সেই সেই স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে রোগী নিতান্ত শয্যাশায়ী তাহার পক্ষে বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না ; এক্ষেত্রে তাহার শুইবার স্থানের উপরে কোমরের নিম্নভাগ হইতে হাঁটু পর্যন্ত অংশে একখানি অয়েল ক্লথ ( Oil Cloth ), রবার ক্লথ ( Makintosh ) বা প্রশস্ত পুরু অমসৃণ কাগজ পাতিয়া দিতে হয়। বিছানার চাদর ২।৩টি রাখিতে হয় এবং মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিতে হয়। শয্যাশায়ী রোগীর মল-মূত্র ত্যাগের জন্য বেড-প্যান ( Bed-pan ) ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রস্রাব করিবার জন্য ইউরিন্যাল ( Urinal ) বা ভাঁড়, বোতল ইত্যাদি রাখা উচিত। বমনাদি করিবার জন্য ঢাকনাযুক্ত পিকদানি বা সরা ইত্যাদি রাখিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত টার্কিশ তোয়ালে ( Turkish Towel ) এবং মাথায় বরফ দিবার জন্য 'Ice bag' রাখিতে হয়। শীত নিবারণ জন্য বালাপোষ, আলোয়ান বা পাতলা লেপ রাখিলে ভাল হয় ; কারণ, রোগীর পক্ষে ভারী শীতবস্ত্র ব্যবহার করা কঠিন।

**রোগীর যত্ন।**—সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ময়লা দূর করিবার জন্য যেরূপ নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন, রোগীর পক্ষেও সেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা দূর করা প্রয়োজন। এজন্য তাহার গাত্রে বেশী জল না দিয়া সাধারণত ঈষদুষ্ণ জলে একখানি বস্ত্রখণ্ড ডুবাইয়া তুলিয়া নিংড়াইয়া লইবে ও তাহার দ্বারা সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে ক্রমশ মস্তক, মুখ, বক্ষোদেশ প্রভৃতি অঙ্গ মুছাইয়া দিবে। দেহের উপরিভাগ মুছান হইলে রোগীকে সাবধানে কাৎ করিয়া পৃষ্ঠদেশ মুছাইয়া দিবে। জল মাঝে মাঝে বদলাইয়া লইবে। নাক, কান, কোমর প্রভৃতি স্থানেই

বেশী ময়লা জমে। এই স্থানগুলি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। শুষ্ক বস্ত্রে গা মুছিয়া দিবে, চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। দাঁত, মুখ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বিবিধ দন্ত-ধাবন দ্রব্যদ্বারা রোগীর দাঁত পরিষ্কার করা যাইতে পারে। সাধারণত খড়িমাটির গুঁড়া, কার্বলিক টুথ পাউডার প্রভৃতি দাঁত মাজিবার পক্ষে প্রশস্ত।

রোগী যাহাতে খুব আরামের সহিত থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। রোগীর কক্ষে শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অযথা অতিরিক্ত লোকের গমনাগমন ভাল নয়। নিকটে কোনপ্রকার সোরগোল, কোলাহল যেন না হয়। গৃহের সুস্থ ছেলে-মেয়েরাই পালাক্রমে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিবে। শুশ্রূষা করিবার সময় বিশেষ যত্নসহকারে রোগীর অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিবে; কোন অসুবিধা, অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে দেখিলে সাধ্যমত তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবে; কোনরূপ বাড়াবাড়ি দেখিলে অবিলম্বে চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিবে।

রোগীর দেহের তাপ ( Temperature ), নাড়ির গতি ( Pulse ) এবং শ্বাসক্রিয়ার গতি ( Respiration ) প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে থাকা উচিত।

**শারীরিক তাপ** ( Temperature )।—শরীরের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিক তাপ ( Normal Temperature ) ৯৮·৬ ডিগ্রী বলা যাইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়ও অর্ধ ডিগ্রী কম বা বেশী হইতে পারে। অনেক সময় সন্ধ্যায় তাপের পরিমাণ এক ডিগ্রী বাড়িতে দেখা যায়। আবার বিভিন্ন অবস্থায় তাপের পরিবর্তন ঘটে। কোনরূপ উত্তেজক আহার ও ব্যায়ামাদি

পরিশ্রমের পর তাপ বাড়িতে পারে এবং নিদ্রাকালে, স্নানের পর, পরিপাক কার্য চলিবার সময় বা ঘর্ম হইলে অথবা উপবাস, অনাহার প্রভৃতিতে তাপ কমিয়া থাকে। বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুদের শরীরের তাপ সাধারণত এক কিম্বা দেড় ডিগ্রী অধিক দেখা যায়।

থার্মোমিটার-যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের তাপ নির্ণয় করা হয়। সাধারণত কুক্ষিদেশে বা বগলে, মুখ-গহ্বরে বা মুখে থার্মোমিটার দিয়া তাপ লওয়া হয়।

প্রথমে কুক্ষিদেশ ( বগল ) কাপড় দিয়া উত্তমরূপে মুছিয়া লইবে এবং থার্মোমিটারের বাল্‌বটি তথায় প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং বাহুটি বক্ষোদেশের উপর স্থাপন করিবে। আজকাল থার্মোমিটার যন্ত্রের ব্যবহার সকলেই জানে।

যখন-তখন রোগীর উত্তাপ না লইয়া, সকালে ও বৈকালে অথবা চিকিৎসকের উপদেশমত প্রতি চার ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা অন্তর উত্তাপ লওয়া যাইতে পারে। অনিয়মিতভাবে উত্তাপ লইলে এই কার্যের সার্থকতা থাকে না। প্রতিবার তাপ লইবার পর লিখিয়া রাখিতে হয়।

রোগীর বগলে তাপ লইবার সময় দেখিবে, বাল্‌বটি যেন বগলের মধ্যে ভালরূপে বসে ও দেহের সহিত ভালভাবে লাগিয়া থাকে। ব্যবহারের পর থার্মোমিটারটি জলে ডুবাইয়া মুছিয়া রাখিবে; আর সংক্রামক রোগের বেলায় কোন বিষ-নাশক বা পরিশোধক-যুক্ত ঔষধে ডুবাইয়া মুছিয়া লইলে ভাল হয়।

মুখ-গহ্বরে উত্তাপ লইতে হইলে, জিহ্বার নীচে এক পার্শ্বে কিছুক্ষণ পর্যন্ত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ধরিবে। বগলে যে তাপ

দেখা যায় তদপেক্ষা মুখ-গহ্বরের তাপ প্রায় ·২ বা ·৪ ডিগ্রী অধিক দেখায়।

**নাড়ী দেখা** ( Pulse-beats )।—স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী দেখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে কতবার হইতেছে—ইহাই গণনা করা হয়। নবজাত শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধের নাড়ীর স্পন্দন যথাক্রমে মিনিটে ১৩০।১৪০ বার হইতে ৭৫।৮৫ বার, বা কিছু কম-বেশী বার হইতে পারে। মধ্যবয়সের রোগীর নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১২০ বারের বেশী কিংবা ৬৫ বারের কম হইলে চিন্তার কারণ হয়। তখন এই বিষয় চিকিৎসককে জানান উচিত। সাধারণত আমরা প্রতি মিনিটে ৭২ বার নাড়ীর স্পন্দন ধরিয়া থাকি।

**শ্বাস-ক্রিয়া গণনা কার্য** ( Respiration )।—সাধারণত মানুষের নাড়ীর স্পন্দন এক মিনিটে যতবার হয়, শ্বাস-ক্রিয়া ঐ সময় প্রায় তাহার চতুর্থাংশ বা চারিভাগের এক ভাগ হয় অর্থাৎ মিনিটে ১৮ বারই শ্বাস-ক্রিয়া ধরা হইয়া থাকে। রোগের জটিলতায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। শ্বাস নির্গত হইবার নাম নিঃশ্বাস ও শ্বাস প্রবেশের নাম প্রশ্বাস। শ্বাস-ক্রিয়া গণনা করিতে হইলে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস দুই অংশ ধরিয়াই একবারের শ্বাস-ক্রিয়া বুঝিতে হয়। রোগীর পেটের উপর হাত রাখিয়া দিলে, উহা যেমন এক একবার ফুলিয়া উঠিবে অমনি এক, দুই, তিন গণিয়া ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার উপর নজর রাখিয়া এক মিনিটের সংখ্যা গণিবে।

**শুশ্রূষা ও পরিচর্যা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়**।—শুশ্রূষার সময় সর্বদা রোগীর দিকে লক্ষ্য রাখিবে; রোগের

গুরুতর ( বাড়াবাড়ির ) অবস্থায় তাহাকে কখনও বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না। তাহার পথ্যাদি-গ্রহণ, মল-মূত্রত্যাগ প্রভৃতি কার্য বিছানায় শুইয়াই করিতে দিবে। মল-মূত্রত্যাগ কার্যের জন্য বেড-প্যান ( Bed-pan )-নামক পাত্র—অভাবে মাটির সরা বা পুরু কাগজ, বোতল, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। পাত্রের মুখ সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে ও স্থানান্তরিত করিবে। বিবিধ কঠিন পীড়ায় দীর্ঘ দিন ভুগিয়া আরোগ্যাবস্থায়ও অনেকের হৃৎপিণ্ড এত দুর্বল থাকে যে, তাহার পক্ষে শৌচাদি কার্যে দূরে যাওয়া এমন কি বিছানায় উঠিয়া বসা বা বিছানা হইতে নামা বড়ই অন্যায়; কারণ, এজন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত, রোগীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ঔষধ বা পথ্য দেওয়া অনুচিত।

**রোগীর পরিচর্যা বিষয়ে সাধারণ নিয়ম**।—গৃহে রোগীকে সুস্থ পরিজনবর্গ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হয়। রোগ যাহাতে বিস্তার লাভ করিতে না পারে এজন্য তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, আসবাবপত্র প্রভৃতি গৃহের অপর কেহ কদাচ ব্যবহার করিবে না।

এবিষয়ে অসাবধানতার জন্য অনেক সময় বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। রোগীর থাকিবার ঘরের পার্শ্বে কোন ঘর থাকিলে সেই ঘরে রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি রাখিবে। অতঃপর ঐগুলি উপযুক্তরূপ বিশোধন করিয়া গৃহের বাহিরে খোলা জায়গায় রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইবে। গামলা, বেড-প্যান্ প্রভৃতি আসবাব ও সরঞ্জাম প্রভৃতিও এই ঘরেই রাখা চলিতে পারে।

রোগীর গৃহ পরিশোধক দ্রব্যের দ্রবে ( Disinfectant Lotion ) বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া দিবে।

রোগীর মল, মূত্র, কাশ, কফ্, থুথু, গয়ের, পুঁয এবং অন্যান্য নিঃস্রাব কোন উগ্র পরিশোধক দ্রব্য দ্বারা পরিশোধন করিবে। পরিশোধন না করিয়া উহা রোগীর গৃহের বাহিরে লইবে না। সম্ভবপর হইলে ওগুলি পোড়াইয়া ফেলিবে।

রোগীর গৃহের অন্যবিধ দ্রব্য যথা,—খেলনা, পুস্তক, কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি কিছু সময় ধরিয়া কার্বলিক ( Carbolic ১-২০ ) বা অপর তীব্র পরিশোধক দ্রব্যে ( Disinfectant lotion ) ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ধোপাকে দিয়া ধৌত করাইয়া লইবে। শুশ্রূষা অন্তে প্রতিবার এরূপ লোশনে—যথা,—লাইসল ( Lysol ১—১৬০ শক্তি )—শুশ্রূষাকারিণী নিজের হাত ধুইয়া ফেলিবে। রোগীর পথ্যাদি যাহা তাহার ঘরে লওয়া হয়, তাহাও দূষিত হইয়া উঠে। অতএব রোগীর আহারান্তে রোগীর খাদ্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়।

শুশ্রূষা অন্তে পরিচর্যাকারিণী নিজের হাত পরিশোধক দ্রব্যে ধৌত না করিয়া রোগীর গৃহ ত্যাগ করিবে না এবং নিজের পরিহিত বস্ত্রাদি পরিবর্তন না করিয়া অপর লোকের সহিত মিশিবে না।

রোগী নিরাময় হইলে রোগীর গৃহের সকল ছিদ্র, দরজা, জানালা ইত্যাদি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে গন্ধক ( Sulphur ) অথবা ফরমালিন ( Formalin ) পোড়াইবে। ঐ স্থানের আসবাবপত্র পরিশোধক দ্রব্যে ধৌত করিয়া লইবে।

## রোগীর পথ্য-প্রস্তুত প্রকরণ (Sick Room Cookery)

রোগ-মুক্তির জন্য রোগীর পক্ষে সুনির্বাচিত ঔষধ এবং সুনির্বাহিত শুশ্রূষা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সুপথ্যের ব্যবস্থাও তদনুরূপ এবং তুল্যরূপে

প্রয়োজনীয়। রোগীর পথ্য প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং সাবধানতার একান্ত প্রয়োজন। রোগীর পরিপাক-শক্তি স্বভাবতই হ্রাস পায়; সুতরাং লঘু, সহজ-পরিপাচ্য অথচ পুষ্টিকর পথ্যই নির্বাচিত হওয়া উচিত। একই খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার প্রণালীভেদে সুপাচ্য ও দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, চাউল, আটা, ময়দা, সুজি, ডাল প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী কেবলমাত্র প্রস্তুতকরণ প্রণালী-ভেদে আমাদের সুস্থ অবস্থায় খাদ্য এবং রোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের গৃহে সাধারণত মেয়েদের দ্বারা কিংবা স্থল-বিশেষে তাঁহাদের উপদেশমত পাচক-পাচিকার দ্বারা রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং, মেয়েদের পথ্য-প্রস্তুতকরণ প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক গৃহেই রোগীকে তাহার রোগের অবস্থা অনুযায়ী আহার প্রদান করা হয়। রোগীর আহার্যকেই পথ্য বলা হয়। রোগ তরুণ কি পুরাতন, জটিল কি সহজ ইত্যাদি লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে পথ্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণত তিন প্রকার পথ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে—সাধারণ পূর্ণ পথ্য ( Full Diet ), লঘু পথ্য ( Light Diet ) এবং তরল পথ্য ( Liquid Diet )।

**পূর্ণ পথ্য** ( Full Diet )। যে রোগী সাধারণ আহার্য-সামগ্রী ভোজন করিতে পারে এমন অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীকে পূর্ণ পথ্য দেওয়া হয়।

**লঘু পথ্য** ( Light Diet )।—খিঁচুড়ি, ডাল-ভাত, ডিম, দুধ, মাছ, মুরগী, পুডিং, জেলি প্রভৃতি যে সমস্ত আহার্য রোগী সহজে পরিপাক করিতে পারে, তাহাকে লঘু পথ্য বলে।

**তরল বা জলীয় পথ্য** ( Liquid Diet )।—সাধারণত দুধকে এবং ঘোল, ছানার জল, বালির জল, ডালের ঝোল, স্থলবিশেষে মাংসের ঝোল ( soup ) ইত্যাদিকে তরল পথ্য বলে। রোগের তরুণ অবস্থায় এই পথ্য দেওয়া হয়।

রোগীকে সবল রাখিবার জন্যই পথ্য দেওয়া হয়। সহজপাচ্য ও সুপাচ্য পথ্যই নির্বাচন করা উচিত; কারণ, তরুণ রোগে রোগীর পরিপাক-যন্ত্র দুর্বল থাকে। অসুখের সময় পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায় এবং প্রায়ই অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়। এই সকল কারণে সর্ব অবস্থাতেই রোগীর পথ্য লঘু অথচ পুষ্টিকর হওয়া উচিত। সুনির্বাচিত পথ্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয়; কারণ, প্রস্তুতপ্রণালীর উপরই উহার ভালমন্দ যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভর করে। পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় রন্ধন-পাত্রাদি ও ব্যবহার্য অপরাপর জিনিসগুলি যেন উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

## তরল পথ্য (Liquid or Fluid Diet)

জ্বর প্রভৃতি রোগের তরুণ অবস্থায় রোগীর পরিপাক-শক্তি হ্রাস পায়। এজন্য তখন তাহাকে তরল পথ্য দেওয়া উচিত।

প্রয়োজনমত দুধ, বার্লি বা সাগুর সহিত মিশ্রিত দুধ, এরোরুট, বার্লি, সাগু ( Arrowroot, Barley, Sago ), জমান দুধ ( Malted milk ), ছানার জল ( Whey ), মৃদু চা ( Weak Tea ), মাংসের ঝোল ( Meat soup or meat broth ), ডালের ঝোল ( Thin pea or Dal soup ), শাক-সব্জির ঝোল (Vegetable soup ), কমলালেবু, আনারস, আঙুর, টমেটো, আপেল, ( Oranges, Pineapples, Grapes, Tomatoes, Apples ) ইত্যাদি বিবিধ

ফলের রস ( juice ), আকের বা ইক্ষুর রস ( sugarcane ) দেওয়া যাইতে পারে।

**দুধ।**—সমপরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল মিশাইয়া পরিষ্কৃত পাত্রে জাল দিবে ; জাল দিবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পথ্যের পক্ষে এক বলকের দুধই প্রশস্ত। ঘন দুধ উপযুক্ত নহে।

**ছানার জল।**—সাধারণত পাতিলেবুর রস দ্বারা ছানার জল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক পাইণ্ট ফুটন্ত দুগ্ধে দুই চামচ লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। ছানা নীচে জমিয়া না যাওয়া পযন্ত নাড়িতে নাই। পরে জমিলে পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া ছানার জল বাহির করিয়া লইবে।

**জল-বার্লি ( Barley water )।**—এক আউন্স পার্ল বার্লি ( Pearl Barley ) লইয়া কিছুক্ষণ অল্পপরিমাণ জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিবার পর ফুটাইয়া লইবে এবং ছাঁকিয়া লইয়া জলটা ফেলিয়া দিবে। পরে এক পাইণ্ট শীতল জলে মৃদুজ্বালে ফুটাইয়া ½ পাইণ্টে পরিণত কর। এখন ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইতে দিবে। প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে প্রস্তুত করিবে।

সাধারণ ভাল বার্লি বড় এক চামচ লইবে। শীতল জলের সহিত বার্লি উত্তমরূপে মিশাইবে এবং গরম জল ধীরে ধীরে ঢাকিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। পরে অর্ধঘণ্টা-কাল ফুটাইতে থাকিবে। এখন দুধ বা লেবু বা লবণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

দুধ-বার্লি পথ্য দিতে হইলে, প্রস্তুত জল-বার্লির সহিত পরিমাণ-মত উষ্ণ দুধ মিশাইয়া লইবে।

আজকাল বাজারে অনেক রকম দেশী বার্লি ( গুঁড়া ) পাওয়া যায়। ভেজাল না হইলে ঐ বার্লিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

**সাগু ( Sago )**।—সাগুদানা ভালরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। উহা হইতে ২ চামচ ( চায়ের চামচ ) সাগুদানা অল্পপরিমাণ শীতল জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। পরে আধ সের শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর ঐ ভিজান সাগুদানা পাক-পাত্রে চড়াইয়া মৃদুজ্বালে ফুটাইতে থাকিবে। তলায় না ধরিয়া যায় এজন্য হাতা বা চামচ দিয়া অনবরত নাড়িয়া দিবে। দানাগুলি গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে যখন জলের অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে, তখন উহার সহিত দুই চামচ চিনি বা মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া নামাইয়া লইবে।

**এরোরুট ( Arrowroot )**।—ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে চা-চামচের ৩ চামচ এরোরুট অল্পপরিমাণ শীতল জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইবে। পরে উহাতে অল্পে অল্পে ঢালিয়া আধসের ফুটন্ত জল মিশাইতে থাকিবে। চামচ দিয়া নাড়িতে থাকিবে, নতুবা ডেলা বাঁধিয়া যাইতে পারে। তারপর যখন দেখিবে, উহার সাদা রং চলিয়া গিয়াছে, তখন উহার সহিত কিছু চিনি বা মিছরি যোগ করিয়া কয়েক মিনিট কাল মৃদু তাপে ফুটাইয়া লইবে। পরে উহার সহিত লেবুর রস বা উষ্ণ দুধ মিশাইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

**সব্জির ঝোল ( Vegetable soup )**।—খোসা সহিত আলু, পটল, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা প্রভৃতি তরি-তরকারী পাতলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইবে। ঐ চাকাগুলি শীতল জলপূর্ণ পাক-পাত্রে চড়াইয়া ২০ মিনিট ধরিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে; নতুবা, উহার 'খাদ্যপ্রাণ' নষ্ট হইয়া যাইবে। পরে ঐ সিদ্ধ তরকারির সহিত মসলা, লবণাদি প্রয়োজনমত মিশাইয়া লইবে। তারপর ঐগুলি চটকাইয়া উহার ক্কাথ পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে।

**পেপ্টোনাইজ্‌ড্‌ মিল্ক** ( Peptonised milk )।—রোগী দুধ পরিপাক করিতে না পারিলে ফেয়ারচাইল্ডের পেপ্টোনাইজিং পাউডার ( Fairchild's Peptonising Powder ) ব্যবহার করিয়া "পেপ্টোনাইজ্‌ড্‌ মিল্ক" তৈয়ার করিতে হয়।

একটি টিউবে ( নলে ) যতটুকু 'পাউডার' থাকে তাহা এক চামচ শীতল জলে গুলিয়া একটি মোটা বোতলের মধ্যে আড়াই পোয়া কাঁচা দুধের সঙ্গে মিশাইবে ও বোতলটি ২০ মিনিট কাল গরম জলপূর্ণ পাত্রে বসাইয়া রাখিবে ও মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে; পরে ব্যবহারের সময় পরিমাণমত মিছরি বা চিনি যোগে পূর্ণবয়স্ক রোগীকে খাইতে দিবে।

শিশুর জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে, একটি তিন পোয়া মাপের বোতলে ১ পোয়া শীতল জল রাখিয়া তাহাতে ১ টিউব ( নল ) 'পাউডার' দিবে ও ভালরূপে নাড়িয়া লইবে। পরে উহাতে ১ পোয়া কাঁচা দুধ যোগ করিয়া আবার নাড়িতে থাকিবে। হাতে সহ্য হয় এমন গরমজল-পূর্ণ একটি প্রশস্ত পাত্রে বোতলটি ২০ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিলেই উত্তম 'দুধ' প্রস্তুত হইবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে চিনি বা মিছরি মিশাইয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

এই 'প্রস্তুত মিল্ক' বরফে বসাইয়া রাখিলে অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

**ঔষধ-প্রয়োগবিধি**।—ঔষধ-প্রয়োগ করিবার সময় সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। চিকিৎসকের উপদেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া তদনুসারে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়।

সাধারণত ঔষধ রোগীর মুখ দ্বারা গ্রহণ করান হইয়া থাকে। খাইবার ঔষধ সাধারণত পিল বা বটিকা ( Tabloids ), গুঁড়া ( Powder ) ও তরল মিশ্র (Mixture) রূপে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধগুলি গলাধঃকরণ করিলে পাকস্থলীর ( Stomach ) মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র

অন্ত্রে ( Small Intestine ) পৌঁছিবার পর তথা হইতে শোষিত হইয়া রক্তের সহিত চালিত হইয়া শরীরের সর্বত্র ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ঔষধের ক্রিয়া অন্ত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলে পিল ( Tabloid ) রূপে দেওয়া হয়। পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হইবার ভয়ে ঔষধ খাইতে না দিয়া অনেক সময় উহার দ্বিগুণ মাত্রায় বা প্রয়োজন মত রেকটাম দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকে।

কতকগুলি ঔষধের ধোঁয়া শ্বাস-ক্রিয়ার সাহায্যে রোগীকে গ্রহণ করাইতে হয়। আঘ্রাণ করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন কোন ঔষধ ফুটন্ত জলে দিয়া উহা বাষ্পরূপে দেওয়া হইয়া থাকে।

শরীরের স্থান বিশেষে বা সর্বত্র ক্রিয়া-প্রকাশের জন্য চর্মের উপর বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এক্ষেত্রে তরল ( Lotions ), মলম ( Ointments ) বা প্রলেপ পলস্তা ( Blisters ) ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলীয় তরল পদার্থ শরীরের নিঃস্রাবের ( Secretion ) সহিত ভালরূপে মিশ্রিত হয় না বলিয়া সহজে শোষিত হয় না; এজন্য তৈল ও চর্বি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, বিবিধ ঔষধের দ্রুত ক্রিয়ার জন্য উহা বিশিষ্ট পিচ্‌কারীর সূঁচ দিয়া (Hypodermically) চর্মের মধ্যে বা শিরার মধ্যে ( Intravenously ) প্রয়োগ করা হয়।

**ঔষধের মাত্রা।**—ঔষধের মাত্রা-নিরূপণ চিকিৎসকের কার্য হইলেও শুশ্রূষাকারিণীর এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; কেননা, কোন কোন রোগীর শরীরে ঔষধের ক্রিয়া অস্বাভাবিক তীব্রভাবে প্রকাশ পাইতে পারে, এমন কি সামান্য মাত্রাতেও ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আবার, এমন রোগী আছে, যাহাকে সাধারণ মাত্রায় ঔষধ দিলে কোন ফল হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থাদি চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিতে

হয়। এমন কতকগুলি ঔষধ আছে, যাহা শরীর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হয়। এরূপ ঔষধ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমাগত ব্যবহার করিলে বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং, এরূপ ঔষধ কিছুদিন ব্যবহারের পর বন্ধ রাখা উচিত; তাহা হইলে উহার অতিরিক্ত অংশ শরীর হইতে বাহির হইতে সুবিধা পায়।

**চিকিৎসকের অবগতির জন্য রোগীর রোগবিবৃতি-সংরক্ষণ।**—চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্ত রোগীর অবস্থা সম্যক অবগত হওয়া চিকিৎসকের একান্ত প্রয়োজন। রোগীর অবস্থা-সম্বন্ধে বিবৃতি ( Report ) চিকিৎসককে দেওয়া শুশ্রূষাকারিণীর কার্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এই বিষয় যাহাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সর্বদা রোগীর সম্যক্ অবস্থা অতি যত্নের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। সামান্য বিষয়েও অবহেলা করিতে নাই; তাহা হইলে চিকিৎসকের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারে। সমস্ত দিবারাত্র কোন রোগীকে শুশ্রূষা করা একজনের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে। এ-নিমিত্ত দিবাভাগে ও রাত্রিতে পালাক্রমে শুশ্রূষা করিবার জন্য শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। নিজ নিজ সময়ে রোগীর সম্যক্ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অবস্থাদির সত্য ও সঠিক বর্ণনা রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রোগী কত ঘণ্টা এবং কোন সময় হইতে কোন সময় পর্যন্ত ঘুমাইয়াছেন, নিদ্রাভঙ্গের পর রোগীর অবস্থা, সুনিদ্রা কিংবা ব্যাঘাত-জনক নিদ্রা, অথবা কোন প্রকার উপসর্গাদি লক্ষিত হইয়াছে—তাহা লিখিয়া রাখিবেন। রাত্রিকালীন আহার্য সামগ্রীর পরিমাণ, মল-মূত্রাদির প্রকৃতি এবং পরিমাণ, কোনরূপ বেদনা বা যন্ত্রণা ছিল কিনা তাহা বর্ণনা-পত্রে লিখিবেন। রোগীর পেট-ফাঁপা ছিল কিনা, গাত্রে

কোনরূপ ব্রণ, স্ফোটকাদি ( Rashes ) দেখা যায় কিনা, দেহের কোন স্থানে বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ করিয়াছেন কিনা ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবেন।

প্রাথমিক-চিকিৎসা
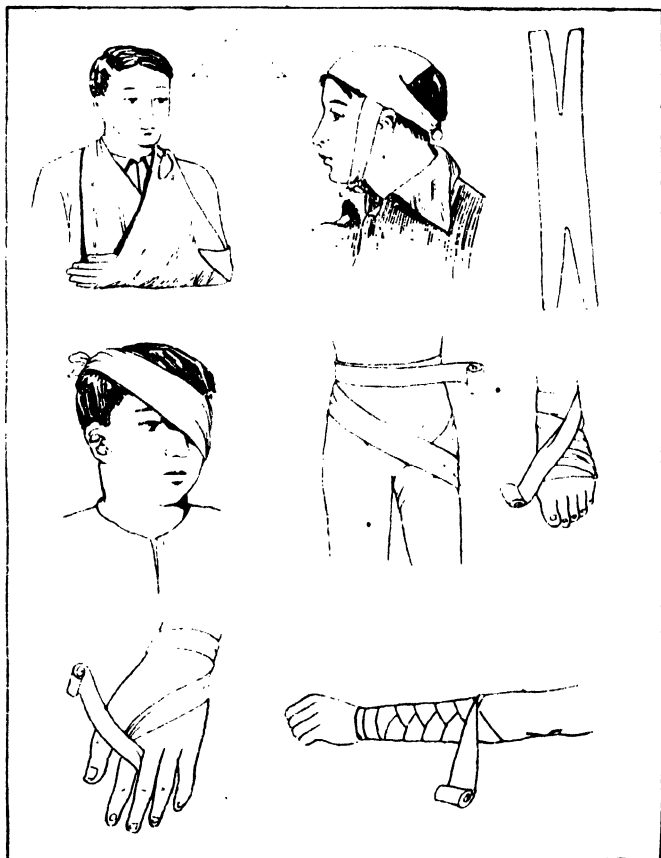
কোন্ সময় কিরূপ ঔষধ ও কতবার খাওয়ান হইয়াছে তাহার হিসাব রাখিবেন। কোনরূপ শ্বাস-যন্ত্রের পীড়াদিতে ; যথা,—নিউমোনিয়া ( Pneumonia ) অথবা শ্বাস-যন্ত্রের অন্যান্য রোগে কাশি ( Cough ) ও শ্লেষ্মা ( Sputum ) প্রভৃতির বর্ণনা রাখিতে হয়।

রোগী তরুণ ( Acute ) ও পুরাতন ( Chronic ) ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর শারীরিক তাপ ( Temperature ), নাড়ীর গতি ( Pulse-beats ) ও শ্বাস-ক্রিয়ার গতি ( Respiration ) প্রভৃতি সম্বন্ধে অবস্থা বর্ণনা করিতে হয়। তরুণ রোগীর পক্ষে প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর ; যথা,—দিবাভাগে ৬টা, ১০টা, ২টা, অপরাহ্ণ ৬টায় এবং রাত্রিতে ১০টা, ২টায় হিসাব রাখিতে হয়। পুরাতন রোগে সকালে ও সন্ধ্যায় তাপ লইলেই চলিতে পারে।

আকস্মিক ঘটনা প্রতি পরিবারেই ঘটিয়া থাকে। কোথাও আঘাত লাগিলে, কাটিয়া গেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হয় এবং অনতিবিলম্বে চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইতে হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক-চিকিৎসার সাহায্যের জন্য কয়েকটি ব্যাণ্ডেজের চিত্র দেওয়া গেল।

---